মানসী

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

পঞ্চম বর্ষ শারদ সংখ্যা
২০২৫

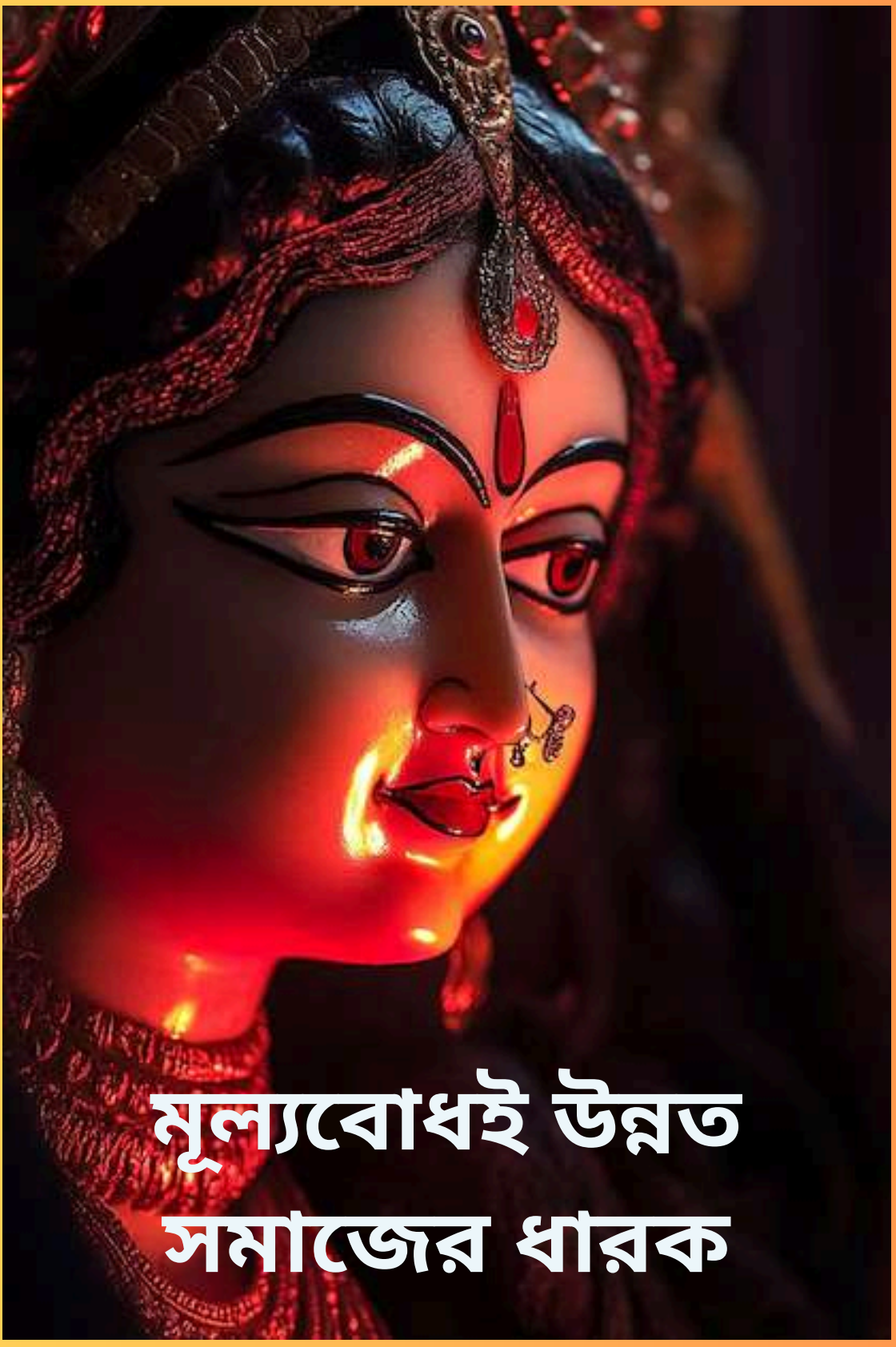

মূল্যবোধই উন্নত সমাজের ধারক

সম্পাদক

মানস কুমার ঠাকুর

MATIX
FERTILISERS

At the heart of progress:
nurturing growth from soil to society

To know more,
visit www.matixgroup.com

Registered Office
Panagargh Industrial Park,
West Bengal 713148

Principal Marketing Office
Carnoustie, 6th Floor, Sector 16A
Noida, Uttar Pradesh 400018

Corporate Office
Poonam Chambers,
Worli, Mumbai 400018

উৎসবের আলোয় এক নতুন ভোর আসুক

প্রহর গোনা শেষ। ঠিক একটি বছর পর মেয়ে আবার বাপেরবাড়ি আসছে। সঙ্গে তাঁর দস্যি, দামাল ছানারাও আছে। চারিদিকে তাই তারই আয়োজন চলছে। চলছে জোর প্রস্তুতি। রাতের শেষ প্রহর থেকে শিউলি তার সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। ছাতিম ফুলের মাদকতায় মন বলছে আর বেশি দেরি নেই। ভোরের আলো বয়ে নিয়ে আসছে এক আলাদা মেজাজ। শরতের ঝকঝকে আকাশ বলে দিচ্ছে উমার আসার সময় হয়েছে। তাই আর দেরি নয়। কাশফুলও মাথা নুইয়ে তার সম্মতি জানাচ্ছে। সমস্ত উপাচার সাজিয়ে উমার আবাহন করতে প্রস্তুত আপামর বাঙালি। কারণ তাঁর আগমনেই যে সারা বছরের জীর্ণতা, দৈন্যতা, ক্ষোভ, দুঃখ, মান - অভিমান সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। উৎসবের আলোয়, আনন্দে এক অপার ভালোলাগায় চারদিকের অন্ধকার কেটে এক নতুন ভোর আসে।

উমার বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা মানেই আমাদের আরেকটি কর্তব্য পালন করা। প্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া ‘রূপকথা’ পুজোবার্ষিকী। এবারের পঞ্চম বর্ষে রূপকথা পুজোবার্ষিকী সেজে উঠেছে নানা আঙ্গিকে। ধর্ম, কর্ম, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, খেলাধুলা, বিশেষ রচনা, বিনোদন, নানান স্বাদের গল্প, কবিতা, চেনা অচেনা নানা মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতায় জমজমাট রূপকথা পুজোবার্ষিকী। পাঠকদের পছন্দ অপছন্দের কথা মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে সবটুকু। আশা রাখছি এবছরও আমরা নিরাশ করবো না আমাদের প্রিয় পাঠকদের।

সবাইকে শারদীয়ার অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। পুজো সবার ভালো কাটুক এই কামনা করি।

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

সূচিপত্র

পঞ্চম বর্ষ ● শারদ সংখ্যা ● ২০২৫

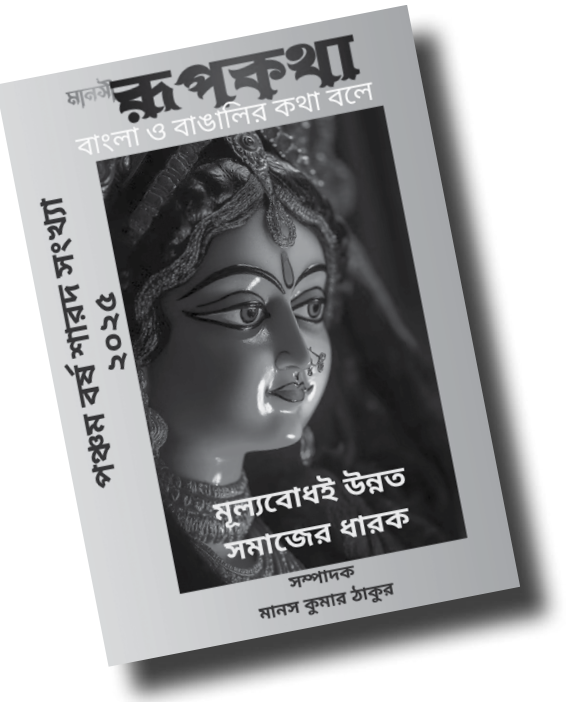

● মানসী দাস :৪
● অমৃত কথা : ৬
● নেতাজীর পৈতৃক বাড়ির দুর্গাপুজো : ১১

শতবর্ষ স্মরণে

● জন্মশতবর্ষে গুরু দত্ত ১২
● শতবর্ষে গণকবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫

বিশেষ রচনা

● কলকাতায় ৬ হেরিটেজ ১৭ - ২০

নস্টালজিয়া

● ইন্টারভ্যালের বই ২১

সাক্ষাৎকার

● দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

● বরুণদা ছিলেন ঘরোয়া মালিক সম্পাদক ২৬
● কলকাতা দূরদর্শনের ৫০ ২৮

বিশেষ ফিচার

● বইয়ের বিকল্প কি ই বুক ৩২
● টিভিতে নাচের রিয়েলিটি শো ৩৪

রম্য রচনা

● মুদ্রা রাক্ষস ৩৬

গল্প ৩৮ -৫৬

কবিতা ৫৭ -৬৪

প্রাতিষ্ঠানিক

● দেশের সনাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে কাজ করে সংস্কার ভারতী ৬৫

ব্যক্তিত্ব

● অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড শিল্পে রবীন্দ্রনাথ ৬৭

বিশেষ সাক্ষাৎকার

● সমরেশকে সংসারের ব্যাপারে মাথা গলাতে দিইনি ৬৮

● এখনো রূপান্তরকামীদের সঙ্গে হিজড়েদের এক করে ফেলা হয় ৭০ -৭১

খানাপিনা

● বুঁচকিবাবুর হাত ধরে ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে ঘরোয়া এক মিষ্টান্ন ৭২

রসে বশে

● রসিক নেতাজীর খাওয়ার অভ্যাস ৭৭

সংস্কৃতি

● শুধু আবৃত্তি নয়, নিজের গলাকেও নানা মাধ্যমে কাজে লাগানো যায় ৭৯
● নির্বাক অভিনয় কিন্তু মাইম নয় ৮২

পুরনো সেই দিনের কথা

সুনয়নী ছবির শুটিং হয় আমার বরের ফ্ল্যাটে ৯০

সিনে কথা

নবজন্ম ছবিতে মহানায়ক সাতটি গান গেয়েছিলেন ৯২
উত্তমকুমার ছাড়াও সরবেন্দ্রকে মনে মনে স্বামী হিসাবে মেনে নেন সাবিত্রী ৯৩

ঘোরাফেরা

পাহাড়ের সাথে ক'দিন ৯৫

সাক্ষাৎকার

নতুন প্রজন্মকে চেনাতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন ভাবে ফেরাতে চাই : অনুপম সরকার ৯৮

বিজ্ঞান

লুই পাস্তুর ১০০

পরামর্শ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী চাকরিতে থাবা বসাবে ১০২
ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ১০৪

জানা ও অজানা কথা

কলকাতার অজানা ইতিহাস ১০৯

ফ্যাশন

পুজোর অন্যতম চমক ডিজিটাল প্রিন্ট ১১১

নিবন্ধ

*মূল্যায়নে হিন্দু কলেজ ১১২
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স ১১৪
হারিয়ে যাওয়া টানা রিক্সা ১১৬
ভারতে ট্রামের ইতিহাস ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ১১৮
কর্পোরেট চোখে পুজো ১১৯

সামাজিক উদ্যোগ

পিছিয়ে পড়াদের পাশে দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন ১২২

বিশেষ রচনা

চেনা মানুষ অচেনা কথা ১২৩
মনীষীদের রঙ্গরসিকতা ১২৫

খেলার দুনিয়া

রেসলিংকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাই ১২৭

রূপকথা

প্রধান সম্পাদক
মানস কুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক
সৈকত হালদার

সহ সম্পাদক
ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী
মধুমিতা দাস

অক্ষরবিন্যাস ও ডিজাইন
কুন্তল সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদের ছবি
মধুমিতা

পরিচালনা
মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

মানস কুমার ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুপ ক্রিয়েশন ৪ নং রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত

দাম : ১৫০ টাকা

www.manasiresearch.org

মানসী দাস : এক অনন্ত প্রেরণা

মানসী দাস ছিলেন এক পরিশ্রমী, সহানুভূতিশীল, সহযোগিতাপূর্ণ এবং শিল্পমনস্ক কন্যা। শৈশব থেকেই তিনি শিক্ষা ও সৃজনশীলতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। সেই লক্ষ্যেই তিনি কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি (CMA) ফাইনাল স্তরে অধ্যয়নরত ছিলেন।

কিন্তু নির্মম ভাগ্য তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। আকস্মিক ক্যান্সারের আঘাতে মাত্র এক মাসের দীর্ঘ হাসপাতালে সংগ্রামের পর তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে পরিবার, সহপাঠী ও শিক্ষক সমাজ গভীরভাবে শোকাহত হয়।

মানসীর চিন্তাভাবনা ও জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি ছিল—

কঠোর পরিশ্রম,
মানবিকতা ও সহমর্মিতা,
সমাজের জন্য সৃজনশীল অবদান।

তাঁর স্বপ্ন ছিল শিক্ষা ও গবেষণাকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে কাজে লাগানো।

মানসীর এই অপূর্ণ স্বপ্ন ও মহান আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে তাঁর বোন ও বোনের স্বামী উদ্যোগ নেন। তাঁদের অনুপ্রেরণা ও নিষ্ঠার ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় **"মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন"।**

এই ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য—

- শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
- সমাজে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ গড়ে তোলা।

- শিল্প-সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আজ মানসী আমাদের মাঝে শারীরিকভাবে নেই, কিন্তু তাঁর চিন্তা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর অমলিন ভালোবাসা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। "মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন"-এর প্রতিটি কর্মকাণ্ড তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে।

মানসী দাস আজ এক নাম নয়, এক প্রেরণা—যা নতুন প্রজন্মকে শিখিয়ে দিচ্ছে, পরিশ্রম, মানবিকতা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করা যায়।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)

Why Jute

- 100% BIODEGRADABLE NATURAL FIBRE
- RENEWABLE RESOURCE
- IDEAL FOR FOOD PACKAGING
- PRODUCTS CAN BE USED MULTIPLE TIMES (UNLIKE SYNTHETIC)
- JUTE CULTIVATION CONSUMES 15MT CO_2 & RELEASES 11 MT O_2 PER HECTARE PER ANNUM
- LOW COST IN COMPARISON TO OTHER NATURAL FIBRES
- ABUNDANTLY AVAILABLE

JCI is into

1) Procurement of Raw Jute from farmers at minimum support price
2) Assist farmers in scientific agronomic practices in Jute Cultivation
3) Distribution of Certified Jute seeds
4) Implementation of GOI Projects like - Jute I-CARE Project
5) Promoting and Marketing of Jute Diversified Products (JDPs) including different types of bags, footwear, lifestyle produtcs, office stationeries, upholstery and technical textiles (Geo - textiles and Agro - textiles).
6) E-Commerce of Jute and Jute finished Products
6) Providing livelihood to Rural Artisans

Patsan Bhavan, 3rd and 4th Floor, Block-CF, Action Area – 1, New Town, Kolkata - 700156

E-mail: jci@jcimail.in; Website: www.jutecorp.in ; Ecommerce portal: www.jciecommerce.in

Ph no. (033) 2252 - 1100 / 6720

গুণীজনদের চোখে স্বামীজীর উদ্ভাসিত রূপ

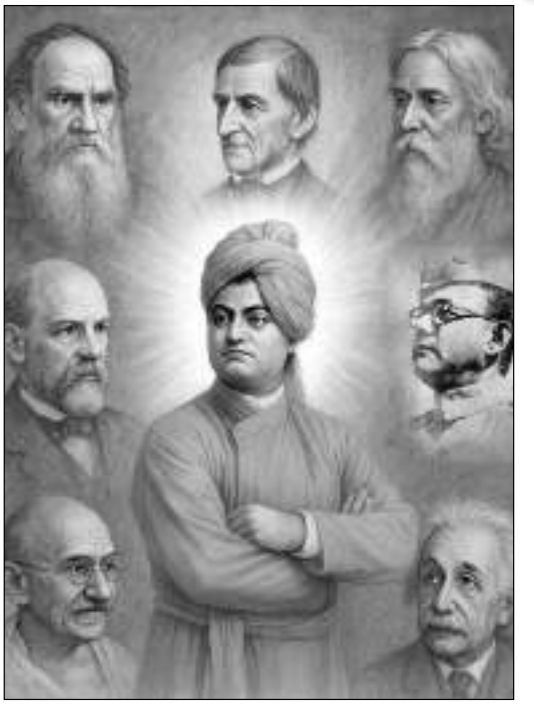

সুদর্শন নন্দী

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র কর্মযোগী সন্ন্যাসী তথা স্বদেশ ও মানবপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দ কে ছিলেন তা এক কথায় প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। সম্পূর্ণরূপে তাঁকে না জানলে অন্ধের হস্তীবর্ণন হয়ে যাবে। স্বামীজীকে জানতে হলে প্রয়োজন তাঁর জীবন নিয়ে সম্পূর্ণ অধ্যয়ন তথা ভাবাদর্শের যথার্থ আত্মীকরণ। স্বদেশি বিদেশি বিভিন্ন গুণীজনরা তাঁকে জেনেছেন এবং নিজেদের ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন।

তিনি কি শুধু মহাপুরুষ ছিলেন? নাকি শুধু একজন সন্ন্যাসী ছিলেন বা পরিব্রাজক বা ধর্মপ্রচারক? কর্মযোগী এই সন্ন্যাসী ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু, অসাধারণ অধ্যাত্মিকশক্তি সম্পন্ন এক মহাপুরুষ যাঁর পাণ্ডিত্যের সীমা শুধু অসীম আকাশের সঙ্গে তুলনা করে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তিনি কে ছিলেন নিজে গুরুভাইদের তা বলেছেন- আরেকটি বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত। তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান ও প্রথম আগ্রহের বিষয় ছিল ধর্ম। ধর্মকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করতেন। এই ধর্ম মানুষে মানুষে ভেদাভেদের নোংরামি নয়, তা হল মানুষের অভেদত্ব নির্মাণের ভাষা। মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব তাঁর প্রকাশ ও ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলন ছিল এই স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিকের মূল মন্ত্র। এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই স্বদেশ ও মানবপ্রেমিক কর্মযোগী সন্ন্যাসী অন্যান্য মনীষীদের দৃষ্টিতে কেমন ছিলেন, তাঁদের চোখে স্বামীজীর উদ্ভাসিত রূপটি কেমন ছিল তা নিয়ে কিছু ভাষ্য।

প্রথমে আসি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়। রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর থেকে দু'বছরের বড় ছিলেন। তিনি স্বামীজীর ভাবাদর্শ ও কাজে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি এক কথায় তা প্রকাশ করে বললেন- যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, বিবেকানন্দকে জানো। বললেন, তাঁর মধ্যে সব কিছুই ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নেই। স্বামীজী যে মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন তা কোনো আচারগত নয়। কবিগুরু বলছেন, স্বামীজী সকলকে ডেকে বলেছিলেন যে তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে।

এছাড়া কবিগুরু আর যা বলেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটি হল- "বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যাবসায়ের পরিচয় পাই তাঁর মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙ্গুলকে নয়"।

কবিগুরুর পর আসি ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনায়। স্বামীজী দরিদ্র নারায়ণ সেবায় খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভাষাচার্য কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন- স্বামীজী এই কথাটির মাধ্যমে একটি কর্তব্য বোধ জাগ্রত করেছেন। এতে কেউ যদি ভগবানের সেবা করতে চায় তাহলে তাকে দরিদ্রের সেবা করতে হবে।সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় স্বামীজী প্রসঙ্গে বলেন - সমাজে যারা অবিচারের বলি স্বামীজী তাদের সবাইকে ভালবাসতেন। তাদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর যে সময় আমাদের দেশে বিরাজ করছে পরাধীনতা, ভুগছে আধ্যাত্মিক শুন্যতায়, তখন বিবেকানন্দ নামক শক্তির আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ..... বিবেকানন্দ একজন অবতার, দৈব অনুপ্রাণিত ও ঈশ্বর নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শক – শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, বর্তমান যুগের সমগ্র মানবজাতির জন্য।

Registered under
Jharkhand Tourism & Goa Tourism

OUR FLEET

IRCTC Approved / LTC Agent

OUR SERVICES

FLIGHTS
HOTELS
TAXI
HOLIDAYS
VISA
CRUISE
INSURANCE
FOREX

BOOK NOW !
www.ghoomkedekho.com

CONTACT US :-
GHOOMKDEKHO TRIPS PLANNER PVT. LTD.
Kolkata | Goa | Ranchi | Mumbai
Call Us : 6202549767, 8208869865, 0651-3140789
E-mail us : info@ghoomkedekho.com | Website : www.ghoomkedekho.com

GHOOM KE DEKHO™
Explore | Experience | Inspire
www.ghoomkedekho.com

Don't just plan a trip,
live an experience

Agra, Kerala, Dubai, Bali, Jharkhand, Rajasthan, Dudhsagar Goa, Manali, Kanyakumari, Cruise, Andaman

Our accreditations :-

PATA | TOAI | ATOAI | TAAJ | TAAB

Jharkhand

RANCHI, NETARHAT, BETLA
3 NIGHTS 4 DAYS
₹ 5199/- onwards

Day 1 - Arrival At Ranchi, Local Sightseeings.
Day 2 - Netarhat Local Sightseeings.
Day 3 - Betla Local Sightseeings.
Day 4 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast

Himachal

Shimla & Manali
5 Nights 6 Days
₹ 8599/- Onwards

Day 1 - Arrival At Shimla On The Way Sightseeings
Day 2 - Shimla Local Sightseeings
Day 3 - Manali On The Way Sightseeings
Day 4 - Manali Local Sightseeings
Day 5 - Manali Solang Valley
Day 6 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Goa

North Goa & South Goa
3 Nights 4 Days
₹ 7999/- Onwards

Day 1 - Arrival At Goa, Dinner Cruise
Day 2 - North Goa Local Sightseeings
Day 3 - South Goa Local Sightseeings
Day 4 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Kerala

Munnar, Thekaddy & Alleppey
4 Nights 5 Days
₹ 10999/- Onwards

Day 1 - Arrival At Munnar On The Way Sightseeings
Day 2 - Munnar Local Sightseeings
Day 3 - Thekaddy Local Sightseeings
Day 4 - Alleppey Local Sightseeings
Day 5 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Andaman

Portblair & Havelock
4 Nights 5 Days
₹ 21999/- Onwards

Day 1 - Arrival At Portblair, Local Sightseeings
Day 2 - Havelock Local Sightseeings
Day 3 - Havelock Local Sightseeings
Day 4 - Portblair Local Sightseeings
Day 5 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner
Light & sound show tickets, Ferry Tickets & permit, Elephant beach boating & Rose Island boating, GST included

* Terms & Conditions Applied

Tamilnadu

Kanyakumari, Rameshwaram & Madurai
5 Nights 6 Days
₹ 17899/- Onwards

Day 1 - Arrival At Kanyakumari, Local Sightseeings
Day 2 - Kanyakumari Local Sightseeings
Day 3 - Rameshwaram Local Sightseeings
Day 4 - Rameshwaram Local Sightseeings
Day 5 - Madurai Local Sightseeings
Day 6 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Rajasthan

Jaipur, Jodhpur, Sam, Jaisalmer
6 Nights 7 Days
₹ 18499/- Onwards

Day 1 - Arrival At Jaipur, Local Sightseeings
Day 2 - Jaipur Local Sightseeings
Day 3 - Jodhpur Local Sightseeings
Day 4 - Sam Local Sightseeings
Day 5 - Jaisalmer Local Sightseeings
Day 6 - Jodhpur Transfer
Day 7 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Dubai

Dubai
5 Nights 6 Days - FD
₹62899/-

Day 1 - Arrival At Dubai
Day 2 - Half Day Dubai City Tour + Burj Khalifa
Day 3 - Miracle Garden + Global Village + Dhow Dinner Cruise
Day 4 - Desert Safari + Yatch Ride
Day 5 - Abudhabi City Tour, Baps Mandir
Day 6 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner
VISA, ID, OTB, GST & TCS included

Thailand

Phuket & Krabi
4 Nights 5 Days
₹ 23999/- Onwards

Day 1 - Arrival At Phuket, Transfer To Krabi
Day 2 - Krabi 4 Island Tour With Lunch
Day 3 - Transfers To Phuket
Day 4 - Phi Phi Island Tour With Lunch
Day 5 - Phuket City Tour Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Bali

Bali & Gili Island
7 Nights 8 Days
₹48999/- Onwards

Day 1 - Arrival At Bali.
Day 2 - Ubud & Kintamani Sightseeings.
Day 3 - Mount Batur Sunrise Trekking Atv Bike Adventure
Day 4 - Nusa Penida Island Day Trip
Day 5 - Uluwatu Temple & Gwk Visit.
Day 6 - Gili Island Trip
Day 7 - Transfer To Bali
Day 8 - Departure
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Bhutan

Thimphu, Paro & Phuentsholing
5 Nights 6 Days - FD
₹ 22999/-

Day 1 - Arrival & Stay at Phuentsholing
Day 2 - Stay at Thimphu (After Completing ILP Formalities)
Day 3 - Excursion to Punakha & Back Thimphu
Day 4 - Thimphu Local Tour & Transfer to Paro
Day 5 - Paro Local Tour
Day 6 - End of Tour (Phuentsholing / Jaigaon Drop)
* accommodation in 3★ Hotel with breakfast & Dinner

Vietnam

Ho Chi Minh City, Da Nang, Hanoi, Halong Bay
6 Nights 7 days - FD
₹ 56499/-

- 6 Nights Stay At 4-star Hotel And 1 Night In Halong Bay Cruise
- 6 Breakfasts, 5 Lunches, 2 Dinners
- Vietnam Single Entry Visa
- All Sightseeing And Transfers As Per The Itinerary On An Sic Basis
- Halong Bay Premium Cruise (overnight Stay)
- Kayaking & Cave Exploration In Halong Bay]
- Walking Tour In Ho Chi Minh City
- Mekong Delta Tour
- Visit Ti Ba Na Hills & Golden Hands Bridge
- Cable Car Ride

Australia

Melbourne, Canberra, Sydney
7 Night 8 Days - FD
₹ 122999/-

- Small Group Tour
- 4 Star Hotels
- Breakfast Daily
- Lunch & Dinner At Restaurants
- Halal Certified Food Throughout
- Famous Great Ocean Road
- Melbourne City Tour With Eureka Towers & Phillip Island
- Currumbin Forest Tour
- Sea World Tickets And Transfer
- Sydney City Tour With 2 Attraction Passes
- Blue Mountain Tour With Featherdale Wildlife Park

Europe

Paris, Amsterdam, Frankfurt, Zurich
8 Nights 9 days - FD
₹ 239999/-

- To And Fro Economy Class Flights
- Stay In Good 3 Star Hotels In Europe
- Daily Continental Breakfast
- Covers The Best Sightseeing In Switzerland, Netherland And Paris
- 8 Indian Jain/vegetarian/non-vegetarian Dinners
- All Transfers And Tours By Luxury Ac Coach
- Services Of A English/hindi Experienced Tour Manager
- All Tour Manager And Driver Tips Included

ভাষাতত্ত্ববিদের পর আসব ঐতিহাসিকের কথায়। দেখব ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টিতে স্বামীজীকে।

তাঁর মতে, স্বামীজীর মধ্যে একজন মহান সন্ন্যাসী ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকের সমন্বয় ঘটেছিল। ভারতের আধ্যাত্মিকতা লোপ পেয়ে যায়নি, সুপ্ত অবস্থায় ছিল। স্বামীজীর মনে প্রধান চিন্তা ছিল সাধারণের মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক সজীবতা ফিরিয়ে এনে দেশকে অতীত গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সমস্ত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন যে তারা যেন সবরকমের ভয় ঝেড়ে ফেলে শক্তিতে ভর করে মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

এবার আমাদের আরেক মহান স্বদেশপ্রেমী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায় আসব। আমরা জানি স্বামীজীর ভাবাদর্শে কীভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এই দেশপ্রেমিকের মুখে শুনব তাঁর জীবনের পথপ্রদর্শক স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর কথা। নেতাজী গভীরভাবে স্বামীজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নেতাজী তখন কটকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যেতেন। সেখানে গিয়ে আত্মীয়ের বইয়ের আলমারিতে স্বামীজীর কিছু বই নেতাজীর নজরে আসে। কয়েকটি পাতা উলটে তিনি তা বাড়িতে নিয়ে যান এবং গোগ্রাসে তা পড়েন। এরপর সেই অমূল্য ভাণ্ডারের কথা বলতে গিয়ে নেতাজী বলছেন –"প্রধান শিক্ষকমশাই আমার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, নৈতিকবোধ জাগিয়ে দিয়েছিলেন- জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন- কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন তাঁর বই পড়ে তন্ময় হয়ে গেলাম"।বিবেকানন্দের প্রতি যখন নেতাজী আকর্ষিত হলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। বিবেকানন্দের প্রভাব যে তাঁর জীবন আমূল বদলে দিয়েছিল তা বারে বারে উল্লেখ করেছেন নেতাজী। তিনি বলেছেন যে তিনি তাঁর অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন স্বামীজীর মধ্যে। তাই তিনি তাঁর পথই বেছে নিয়েছিলেন। এতই অনুপ্রাণিত তিনি হয়েছিলেন যে তিনি বলছেন- "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার ব্যাখ্যা করা বড় কঠিন। আমাদের সময়ের ছাত্র সমাজ স্বামীজীর রচনা ও বক্তৃতা দ্বারা যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কাহারো দ্বারা হয় নাই। তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশা ও আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন'।

তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে নেতাজীর একটি কথাই শেষ কথা। সেই হৃদয়স্পর্শী বাক্যটি হল-- "চরিত্র গঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করতে পারি না"।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে আপ্লুত হয়েছিলেন। তিনি বলেন-"তাঁর রচনাবলী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করেছি। সেগুলি পাঠ করার পর আমার মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। হে যুবকবৃন্দ! যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বাস করেছেন এবং শরীর ত্যাগ করেছেন সেই পুণ্যভূমির কিছু মাহাত্ম্য আত্মস্থ না করে শুন্য হাতে ফিরে যেও না- তোমাদের কাছে এই আমাদের আবেদন"।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছেন-অনন্য সাধারণ পুরুষ। সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব। সর্বদা মানসিক সমতা রক্ষা করতে সক্ষম।মর্যাদাসম্পন্ন। নিজের জীবনব্রত সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়। সক্রিয় জ্বলন্ত শক্তিতে ভরপুর। তিনি ছিলেন প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের মধ্যে মিলনসেতু।

নেহরু অন্যপ্রসঙ্গে গিয়ে স্বামীজীকে মূল্যায়ন করলেন এভাবে-- "সাধারণ অর্থে তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন স্রষ্টা। জাতীয় আন্দোলনে যারা কমবেশী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকে স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রজ্ঞা, তেজ এবং শক্তির যে প্রবাহ স্বামীজীর মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে, আমি মনে

করি, আজকের তরুণ তরুণীরা তাঁর সদ্ব্যবহার করতে ভুলবে না"।

প্রথম জীবনে বিপ্লব আন্দোলনের নেতা এবং পরবর্তীকালে আধ্যাত্ম সাধনায় রত ঋষি অরবিন্দ স্বামীজীর জীবনদর্শন আর বিশাল কর্মকাণ্ড অধ্যয়ন ও আত্মীকরণ করে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করলেন-- "ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাই বারিসিঞ্চনে বর্ধিত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত্নে গঠিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারাই ভারতের এবং সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে"।

এরকম আরো অসংখ্য স্বদেশীয় মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এবং এই দেশ ও দেশবাসীর কাছে স্বামীজী কত প্রয়োজনীয় ছিলেন, আছেন ও থাকবেন তা ব্যক্ত করেছেন।

শুধু কি দেশের গুণীজন? বিদেশি গুণীজনদের কাছেও তিনি সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন। ধরা যাক রাশিয়ার ভাষাতত্ত্ববিদ ই পি চেলিশভের কথা। কী অপূর্ব তাঁর বর্ণনা স্বামীজী সম্বন্ধে। তিনি লিখেছেন- বিবেকানন্দকে যদি তথাকথিত একজন ধর্মীয় প্রচারক হিসাবে দেখা হয় তাহলে তা হবে বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায় বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়। অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান প্রফেট। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী।

চেলিশেভ এও জানিয়েছেন, রাশিয়ায় বিবেকানন্দ একটি জনপ্রিয় নাম। সে দেশের মানুষের কাছে স্বামীজীকে জানার আগ্রহ দিনদিন বেড়েই চলেছে।

রাশিয়ার পর আসব সমাজতন্ত্রী চিনে। চিনের বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক তথা ইনস্টিটিউট অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের ডেপুটি ডিরেক্টর হুয়াং জিন চুয়ান বলেছেন -- চিনে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা ধর্মীয় নেতা বলে মনে করি না। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম সমাজতন্ত্রের কথা বলেন। বহু বিপ্লবীর কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। বর্তমান চিনে স্বামীজী ভারতবর্ষের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সমাজসেবীরূপে পরিচিত। তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এবং দেশপ্রেম কেবল ভারতের জাতীয়বাদকেই উদ্বুদ্ধ করেনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এভাবে আমেরিকার দার্শনিক, বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ, লেখক উইল ডুরান্ট, বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ অস্ট্রেলিয়ার (জন্ম ইংল্যান্ডে) এ এল ব্যাসম, বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয় প্রমুখের লেখা ও উক্তি পড়ে দেখতে পাই প্রত্যেকেরই স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ প্রশংসা ও গভীর শ্রদ্ধা।

আর পরিশেষে উল্লেখ করব বহু আলোচিত ফরাসি সাহিত্যিক ও মনীষী রোমাঁ রোলাঁর ভাবনা। রোলাঁ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিও টলস্টয়, রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীজী প্রমুখের জীবনী লিখেছেন। তিনি বললেন- স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মূর্তিমান শক্তি। কর্মই ছিল মানুষের কাছে তাঁর বাণী। বিবেকানন্দকে দ্বিতীয় স্থানে কল্পনা করা অসম্ভব। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি প্রথম স্থানে আসীন। তাঁকে দেখামাত্রই প্রত্যেকে বুঝতে পারত ইনি একজন নেতা, একজন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ। এমন এক চিহ্নিত ব্যক্তি যাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট প্রকাশিত অপরকে পরিচালিত করার শক্তি। নিষ্ফলা চিন্তার ভিত্তিহীন চোরাবালিতে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দী ধরে ডুবে ছিল। একজন সন্ন্যাসীই তা থেকে ভারতবর্ষকে টেনে তুললেন। সত্যি বলতে কী স্বামীজীর ওপর এমন মূল্যায়ন রোমাঁ রোলাঁর দ্বারাই সম্ভব।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, স্বামীজীর প্রতি বিভিন্ন মনীষীদের গভীর চিন্তা, তাঁর ওপর নিবিড় অধ্যয়ন, তাঁর কর্মধারার পরিণত বিশ্লেষণে ও মূল্যায়নে আমরা একজন কর্মযোগী সন্ন্যাসী, আধ্যাত্মিক নবজাগরণের পথপ্রদর্শক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, স্বদেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমীকে দেখতে পাই আমাদের প্রাতঃপ্রণম্য বিবেকানন্দের মধ্যে।

তথ্যঋণঃ চিত্তানায়ক বিবেকানন্দঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক।

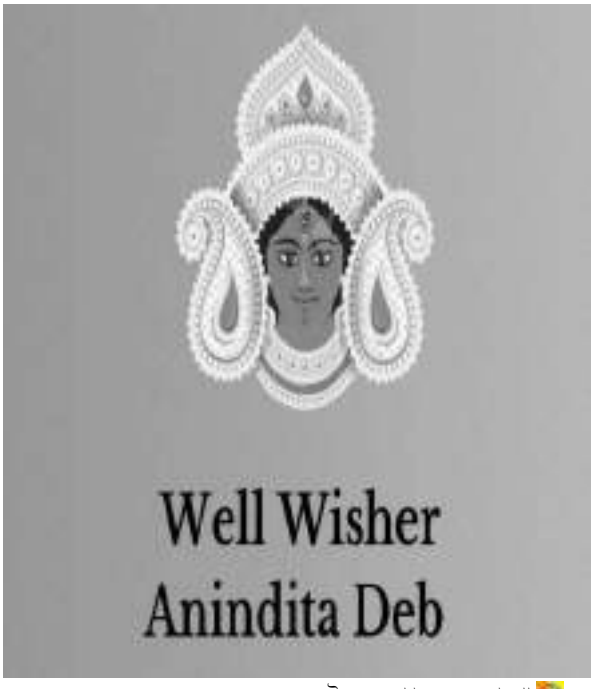

অমৃত কথা

নরেনের সঙ্গে পরমহংসদেবের প্রথম দেখা

ঈশ্বর দর্শনে নরেন্দ্রনাথ যখন দিশেহারা হয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনই রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র তাঁকে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

১৮৮১ সালের নভেম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দেখেন নরেন্দ্রনাথ। উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রিটে নরেনের বাড়ির সামনে থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিশ্র। সেখানে ঠাকুরের আসা উপলক্ষে গান গাওয়ার জন্য নরেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত ছিলেন। ১৮ বছরের নরেন তখন এফ এ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। প্রথম দর্শনেই তিনি রামকৃষ্ণদেবের চোখে পড়ে যান। ঠাকুর নরেনকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসতে অনুরোধ করেন। নরেন্দ্রনাথ আগেই রামকৃষ্ণের নাম শুনেছিলেন। জেনারেল অ্যাসেম্বলি (এখন নাম স্কটিশ চার্চ কলেজ) ইনস্টিটিউশন কলেজের প্রিন্সিপাল হেস্টি সাহেব একদিন ইংরিজি ক্লাসে পড়াতে এসে কথার ছলে রামকৃষ্ণদেবের নাম করেন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে তিনি নিজের মধ্যে না থেকে কেমন যেন হারিয়ে যেতেন। এটা বোঝাতেই হেস্টি সাহেব ছাত্রদের বলেন, "মনের পবিত্রতা আর বিষয়ের একাগ্রতা থেকে এই সমাধি হয়ে থাকে। একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ দেবের আজকাল এমনটা হতে দেখেছি"। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেনের প্রথম দেখার পর আরও একটা ঘটনা ঘটল। এফএ পরীক্ষা হয়ে গেলে বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছেলে নরেনের বিয়ের জন্য পাত্রী ঠিক করলেন। কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর নরেন বেঁকে বসেন। তাঁর আত্মীয় রামচন্দ্র দত্তর অনেকদিন আগে থেকে রামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত ছিল। তিনি বুঝলেন, ধর্মলাভের জন্য নরেন বিয়েতে রাজি নন। তখন রামচন্দ্র নরেনকে বলেন, "যদি ধর্ম লাভ তোমার বাসনা হয়ে থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে চলো"। এরইমধ্যে নরেনের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। সঙ্গে ছিলেন নরেন। ঠাকুর নরেনকে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। অসীম স্নেহ, আদর করে ভালোমন্দ খাইয়ে কত শত কথা বলেও যেন পুরোদস্তুর তৃপ্ত হতে পারছিলেন না। এর কারণ ছিল। উপযুক্ত শিষ্যকে দেখে গুরুর আনন্দ হওয়াটা স্বাভাবিক। রামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন, নরেনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার এক মহাগুণ বর্তমান। ঠাকুর নরেনকে গান গাইতে বললে, নরেন গেয়ে শোনান, "মন চল নিজ নিকেতনে"। গান শেষ হওয়ার পর ঠাকুর নরেনকে নিয়ে ঘরের পাশে চারদিকে ঘেরা একটা বারান্দায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। নরেন ভাবলেন বোধহয় নির্জনে কিছু উপদেশ দেবেন বলেই এমনটা করছেন। কিন্তু ঠাকুর যা করলেন, একেবারেই কল্পনাতীত। নরেনের ভাষায়, "সহসা আমার হাত ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। যা আনন্দাশ্রু। আর পূর্ব পরিচিতের মতো পরমস্নেহে আমাকে বলেন, এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কীভাবে অপেক্ষা করে আছি। একবার চিন্তা করবে না? ইত্যাদি কত কথা যে বললেন আর কাঁদতে লাগলেন। পরক্ষণেই আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে দেবতার মতো আমার প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, জানি প্রভু, তুমি সেই প্রাচীন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবনের দুর্গতি নিবারণ করতে আবার শরীর ধারণ করেছ"।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পৈতৃক দুর্গাপুজোয় ইতিহাস ঐতিহ্য মিলেমিশে একাকার

সুরথ চক্রবর্তী

চার শত বছর পার করে আজও অমলিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মভিটে সুভাষগ্রামের (কোদালিয়ার) শারদোৎসব। এই পুজোয় রয়েছে ইতিহাসের গন্ধ আর বিপ্লবীদের বীরগাঁথা। তাই এই শারদোৎসবে শামিল হতে আসেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। এই পুজোকেই সোনারপুর কোদালিয়ার প্রাচীন পুজো বলে ধরা হয়।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, মাহিনগর ছেড়ে ১৭০৭ সালে বসু পরিবার কোদালিয়ায় বসবাস শুরু করে। ১৮২০ সালে প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয় বসুবাড়িতে। গৃহকর্তা যাদবচন্দ্র বসুর স্বামীহারা বোনের অনুরোধেই পারিবারিক এই পুজোর সূত্রপাত। বংশানুক্রমে সেই পুজোর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন উত্তরসূরী জানকীনাথ বসু।

সাবেকি একচালা মাতৃমূর্তির কাঠের মাচার বয়স দু'শো বছর। প্রথা মেনে ওই কাঠামোতেই তৈরি হয় প্রতিবছরের প্রতিমা। প্রথম দিকে পাঁঠা বলি দেওয়া হলেও, অনেক বছর হল তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জানকীনাথের বাবা হরনাথ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই পশুবলির জায়গায়

শসা, আখ ও ছাঁচিকুমড়ো বলি হয়।

১৮২০ সালে যখন এই বসু বাড়িতে প্রথম দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল তখন এই তল্লাটে আর কোন বারোয়ারি পুজো ছিল না। অষ্টমীর দিন সুভাষচন্দ্র বসু নিজে আসতেন বাড়ির পুজোতে। সারাদিন পুজোয় অংশগ্রহণের পর রাত্রিবেলায় এলাকায় বিপ্লবীদের নিয়ে গোপন মিটিং করতেন। এই বাড়ির দুর্গাপুজোয় রয়েছে পরতে পরতে নস্টালজিয়ার ছোঁয়া।

বসু পরিবারের শরিকরা বেশিরভাগ হয় কলকাতায় কিংবা বিদেশে থাকেন। তবে আজও সবাই চেষ্টা করেন অষ্টমীর দিন কোদালিয়ায় নেতাজীর পৈতৃক ভবনে একত্রিত হয়ে সন্ধিপুজোয় অংশগ্রহণ করার। ঠাকুরদালানেও নেতাজী তাঁর জীবনের বেশ কিছুটা মূল্যবান সময় কাটিয়েছেন বলে জানা যায়।

রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উদ্যোগে পৈতৃক বাসভবনের সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। আরও বেশকিছু পরিকল্পনা রয়েছে। এখানে একটি নিবাসও তৈরি হয়েছে। পর্যটকরা এখানে থেকেই পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

শিয়ালদহ সাউথ সেকশনের যেকোনো ট্রেনে সুভাষগ্রাম নামে অটো করে নেতাজীর পৈতৃক বাড়িতে পৌঁছানো যায়।

নেতাজীর পৈতৃক বাড়ি

জন্মশতবর্ষে গুরু দত্ত

১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাস। অনেক আগে সকাল হয়েছে। পুরোনো কাজের লোক রতন অনেক ডেকেও সাড়া পাচ্ছে না। বম্বের (এখন মুম্বাই) পেডার রোডের আর্ক রয়্যাল ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে আকুল ফোন গেল পালিহিলের বাংলোয়। গীতা দত্তের নির্দেশে ঘরের দরজা ভেঙে রতন দেখল খাটে শুয়ে আছেন তিনি। মুখটা অল্প ফাঁক হয়ে আছে, চোখ দুটো আধবোজা। হাতটা তখনও তোলা। বলার বাকি ছিল অনেক কিছু।১০ অক্টোবর যখন তিনি শেষ বিদায় নিলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হতে আরো ৯ মাস বাকি। হ্যাঁ, এই মানুষটি আর কেউ নন প্রখ্যাত অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক গুরু দত্ত।

মৃত্যুর পর ছয়টি দশক কেটে গেলেও তাঁকে নিয়ে উৎসাহের ঘাটতি নেই। চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাছে এক অত্যাশ্চার্য উদাহরণ। যাঁর জীবন ও সিনেমা মিলেমিশে এক মিথে পরিণত হয়েছে। এই বছর গুরু দত্তর জন্মশতবার্ষিকী চলছে।

গোড়ার কথা

বসন্তকুমার শিবশংকর পাড়ুকোনের জন্ম ১৯২৫ সালের ৯ জুলাই কর্ণাটকের এক চিত্রপুর সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে। বাবা শিবশংকর স্কুলে পড়াতেন। কিছুদিন ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। পেশার জগতে ভদ্রলোক অসফল ছিলেন। মা বাসন্তীদেবীকে সংসারের হাল ধরতে হয়। সুলেখিকা, অনুবাদক বাসন্তী শিক্ষকতা করতেন পরিবার প্রতিপালনে। এক দুর্ঘটনার পর বসন্তকুমারের নাম বদলে করা হয় গুরু দত্ত। পাড়ুকোন পরিবার ১৯৩০ সালে কলকাতা চলে আসে। গুরু দত্ত ভর্তি হন কলকাতার হেয়ার স্কুলে। ভবানীপুর অঞ্চলে বসবাস আর কলকাতার স্কুলের জগৎ গুরু দত্তের মনে বাংলা সংস্কৃতির এক স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছিল। কলকাতাতেই থাকতেন তাঁর এক সম্পর্কিত মামা বি.বি.বেনেগাল। কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, চিত্রকর বেনেগালের ধর্মতলা স্ট্রিটের (লেনিনসরণী) বাড়িতে প্রায় গুরু দত্ত চলে আসতেন তাঁদের পদ্মপুকুর রোডের বাড়ি থেকে। পেশার সুযোগে ভাগ্নেকে সিনেমা দেখার পাস জোগাড় করে দিতেন বেনেগাল। সিনেমার প্রতি আকর্ষণ তাঁর কৈশোর থেকেই। বেনেগালের আঁকা একটা তৈলচিত্র ছিল তাঁর বাড়িতে। গলায় সাপ জড়িয়ে নৃত্যরত নটরাজ। একবার কলকাতার কন্নড় সারস্বত সমাজের অনুষ্ঠানে সেই ভাবনায় নৃত্য পরিবেশন করে খুব বাহবা পেলেন গুরু। পরে যখন উদয়শঙ্করের আলমোড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করলেন, তখন স্বয়ং উদয়শংকর তাঁর অডিশন নেন। সেখানেও ওই নাচেই মুগ্ধ

করলেন নৃত্যগুরুকে। আলমোড়ায় শিক্ষার্থী হওয়ার আর্থিক দায়ভার বাসন্তী-শিবশঙ্করের পরিবার বহন করতে পারতো না। উদয়শঙ্করের উদ্যোগেই জুটে যায় স্কলারশিপ। ১৯৪২ সাল থেকে দুই বছর আলমোড়ায় থাকার সময় তাঁর শিল্পভাবনা বিশেষভাবে পরিশীলিত হল। উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠানে শুধু নাচ শেখানো হত না। প্রতি সন্ধ্যায় শিল্প ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরা নানা বিষয়ে ক্লাস নিতেন। যা ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক নান্দনিক বিকাশের সহায়ক ছিল।

কাজের খোঁজে

আলমোড়া থেকে কলকাতায় ফিরে তখনই কর্মসংস্থান ভীষণ জরুরি হয়ে পড়ে। কলকাতার লিভার ব্রাদার্স-এ টেলিফোন অপারেটরের চাকরি করেন কিছুদিন। এরপর শিবশঙ্কর-বাসন্তী বোম্বেতে গিয়ে সংসার পাতেন। গুরু দত্ত পরিবারের সঙ্গে যান। একদিন কাজের সন্ধানে পুনার (পুনে)প্রভাত স্টুডিওতে হাজির হন। এখানেই পরিচয় দেব আনন্দ এবং রহমানের সঙ্গে। এই ত্রয়ীর বন্ধুত্ব আমৃত্যু বজায় ছিল। প্রভাত স্টুডিওয় পরিচালক বাবুরাম পাই-এর কাছেও নিয়ে গিয়েছিলেন মামা বি বি বেনেগাল। তাঁকে প্রভাত স্টুডিও নিয়োগ করেছিল কোরিওগ্রাফার হিসেবে। পাশাপাশি সহকারী পরিচালকের কাজও করতে হত। এখানে অভিনয়ও করতে হল গুরু দত্তকে। প্রথমদিকের অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে ডি ডি কাশ্যপ পরিচালিত 'চাঁদ' (১৯৪৪), বিশ্রাম বেদকারের 'লাখরানি' (১৯৪৫) ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হল। দু'বছর প্রভাতে কাটিয়ে বোম্বে চলে এলেন। আদিনাথ ব্যানার্জির 'মোহন' (১৯৪৭)-এ সহকারী পরিচালকের কাজ পেলেন। আবার কিছুদিন বেকার। ভাই আত্মারামের সঙ্গে যৌথভাবে বইয়ের ব্যবসাও করলেন। এই সময়ই 'পেয়াসা'র গল্প লেখা শুরু। যদিও প্রথম অবস্থায় এর নামকরণ করেছিলেন 'কশমাকাশ'। ১৯৪৯ সালে 'গার্লস স্কুল' ছবিতে অমিয় চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে বম্বেতে তাঁর অবস্থান পোক্ত হল। ১৯৫০ সালে এলেন বম্বে টকিজে। সুযোগ হল জ্ঞান মুখার্জির অধীনে কাজ করার। গুরু দত্ত 'সংগ্রাম' (১৯৫০) ছবির সহকারী পরিচালক হলেন। এই ছবিতে জ্ঞান মুখার্জি ভারতীয় পর্দায় প্রথম অ্যান্টি হিরোর ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, যা গুরু দত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। কার্যত জ্ঞান মুখার্জিকে গুরু মানতেন গুরু দত্ত। গুরু দত্ত তাঁর 'পেয়াসা' (১৯৫৭) জ্ঞান মুখার্জির স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। অনেক সমালোচক মনে করেন জ্ঞান মুখার্জির জীবনের ছায়া 'কাগজ কে ফুল' (১৯৪৯) ছবির আখ্যানকে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য এই ছবিতে হলিউড ব্লকব্লাস্টার 'এ স্টার ইস বর্ন' (১৯৫৪)-এর প্রভাবও আছে।

বন্ধুত্বের গল্প ও সিনেমা

প্রভাত স্টুডিওর শিক্ষানবিশের দিনগুলিতে দুই বন্ধু দেব আনন্দ ও গুরু দত্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যদি দেব কখনও ছবি প্রযোজনা করেন তবে গুরু দত্ত হবেন তাঁর পরিচালক। আর যদি গুরু পরিচালক হন, তবে নায়ক হবেন দেব আনন্দ। দুই বন্ধু তাঁদের কথা রাখতে পেরেছিল। দেব সাহেবের পারিবারিক সংস্থা নব কেতন ফিল্মস যখন 'বাজি' (১৯৫১) করবে ঠিক করল, তখন প্রথমবারের জন্য চলচ্চিত্র পরিচালনার সুযোগ পেলেন গুরু দত্ত আর নায়ক রূপে তিনি বেছে নিলেন দেবসাহেবকে। চিরাচরিত ভারতীয় ছবির নায়কের নীতিবান সৎ চরিত্র নির্মল স্বভাবের নায়কের পরিবর্তে গুরুর নায়ক হলেন আলো আঁধারে মেশানো এক চরিত্র। সমাজের অপছন্দের জগতে তাঁর অনায়াস যাতায়াত। আমেরিকার ফিল্ম নোয়া ঘরানা সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলল 'বাজি'তে। কেবল আখ্যানে নয় ছবির নির্মাণরীতিতেও। ছবির মতোই দুর্দান্ত সফল হল ছবির গানগুলি। গুরু দত্তের দৃশ্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি এই ছবি থেকেই দেখা যেতে লাগল আর গানের দৃশ্যায়নে তাঁর অভিনবত্ব দেখা গেল 'বাজি'তে। পরের ছবি 'জাল' (১৯৫২)। সেই অপরাধ, বিশ্বাসভঙ্গ, ভালোবাসার টানাপোড়েনের আখ্যান। এই ছবিতে দেবসাহেবের বিপরীতে গীতাবালি। এবারও শচীনদেব বর্মণের সুরে বাজিমাত করল ছবির গান। অবশ্যই সঙ্গীত চিত্রায়নের অভিনবত্ব দর্শক-সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াল না। তৃতীয় ছবি 'সিআইডি' (১৯৫৬) কাহিনিতেও অপরাধ জগৎ। এখানে দেবসাহেবের বিপরীতে শাকিলা, কিন্তু এই তুমুল হিট ছবিতে কয়েকটি বড় পরিবর্তন এল। প্রথমত গুরু দত্ত প্রযোজনায় এলেন। ছবির প্রযোজনা সংস্থা গুরু দত্ত মুভিজ প্রাইভেট লিমিটেডের অংশীদারিত্ব ছিল গুরু দত্ত, গুরুস্বামী এবং আত্মারামের। এই ছবিতে শচীনকর্তার জায়গায় সুর করতে এলেন ও.পি. নায়ার। এই ছবিতে প্রধান নারী চরিত্রে গুরু দত্ত হাজির করলেন ওয়াহিদা রহমানকে। এই ঘটনা ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, হয়তো গুরু দত্তের জীবনের ক্ষেত্রেও ততটাই। পরের ছবি 'বাজ' (১৯৫৩) ষোড়শ শতাব্দীতে মালাবার উপকূলের এক দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে পর্তুগিজ বণিকদের সংঘাতের কাহিনি। প্রচুর অ্যাকশন দৃশ্য সম্বলিত ছবি। এই ছবিতেই প্রথমবারের জন্য নিজের ছবির নায়ক হলেন গুরু দত্ত নিজেই। এ ছবির সাফল্যের রেশ মিটতে না মিটতেই মধুবালার সঙ্গে জুটি বেঁধে করলেন 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফিফটিফাইভ' (১৯৫৫)। নায়ক প্রীতম একজন কার্টুনিস্ট। যাঁর আঁকা কার্টুন চিত্রগুলো বাস্তবসম্মত করতে সেগুলো আঁকানো হল প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট আর কে লক্ষণকে দিয়ে। গুরু দত্তের কাল্ট মুভি 'পিয়াসা' (১৯৫৭) মুক্তির আগের বছরেই মুকুল রায়ের প্রযোজনায় 'সয়লাব' (১৯৫৬) পরিচালনা করেন গুরু দত্ত। তাঁর প্রভাত স্টুডিওর বন্ধু রামসিং এই ছবির নায়ক। যদিও 'পিয়াসা' ছবির প্রস্তুতি তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিয়েছিলেন। 'পিয়াসা' তাঁকে এক অসীম উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। কবি বিজয় (গুরু দত্ত) সমাজ-সংসার, আত্মীয়-পরিজন, প্রেমিকা সকলের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। দারিদ্র আর বঞ্চনা ছাড়া তাঁর প্রাপ্তির খাতা শূন্যই থাকে। তাঁর কবিতা প্রকাশে গররাজি সকল প্রকাশক। অথচ তাঁর মৃত্যুর খবর জেনে তাঁর রচনা প্রকাশ করে মুনাফা লোটে প্রকাশক ও তাঁর পরিবার। তাঁর প্রবঞ্চিত জীবনে তাঁর পাশে থাকে কেবল তাঁর বন্ধু এক মালিশওয়ালা (জনিওয়াকার) আর বারবনিতা গুলাবু (ওয়াহিদা

রহমান)। এই ছবিতে পরিচালক সরাসরি সমাজব্যবস্থাকেই কাঠগড়ায় তোলেন। 'পিয়াসা' সাধারণ দর্শক থেকে প্রাজ্ঞ সমালোচক সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটি একটি অত্যুজ্জ্বল মাইল ফলক। গুরু দত্তের পরিচালিত শেষ ছবি 'কাগজ কে ফুল' (১৯৫৯)। কেবল ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক সিনেমার নিরিখেও একটি অসামান্য সংযোজন। চলচ্চিত্র পরিচালক সুরেশ সিনহার শিল্পীজীবন ও ব্যক্তি জীবনের অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব এই ছবির আখ্যানের মূল অংশ। সুরেশের সাংসারিক জীবন সুখের নয়। স্ত্রীর থেকে বিচ্ছিন্ন সুরেশের জীবনের নোঙর তাঁর কন্যা। অন্যদিকে নবাগত শান্তি (ওয়াহিদা রহমান)- নিজের মেধা ও পরিশ্রমে দেশের সেরা তারকা অভিনেত্রী রূপে গড়ে তোলেন। নিজের অজান্তেই তাঁরা পরস্পরের মনের কাছাকাছি চলে আসেন। যে সম্পর্ক মানতেও নারাজ সুরেশের কন্যা। এই বিয়োগাত্মক আখ্যানের মহাকাব্যিক নির্মাণ সম্ভবত হিন্দি ছবির সর্বভারতীয় বাজারের কাছে সময়ের চেয়ে অনেকটাই এগিয়েছিল। গুরু দত্তের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর ফ্লপতম ছবি। ওই ছবির জন্য গুরু দত্ত ফিল্মস এর আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল সাত কোটি টাকা। হতাশ গুরু দত্ত এরপর চলচ্চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তাঁর প্রোডাকশন এরপর মহম্মদ শাহিদের পরিচালনায় 'চৌধবী কা চাঁদ' (১৯৬০), আবরার আলাভি'র পরিচালনায় 'সাহেব বিবি আউর গোলাম'(১৯৬২)-এর মতো ছবি করে। দুটি ছবিরই কেন্দ্রীয় চরিত্রে গুরু দত্ত অভিনয় করেন। দুটি ছবি বাণিজ্য সফল। পরিচালনার দায়িত্বে না থাকলেও এই ছবিগুলিতে তাঁর শিল্পভাবনা, তাঁর ঘরানার ছাপ স্পষ্ট। 'সাহেব বিবি গোলাম' সে বছর সেরা হিন্দি ছবিরূপে জাতীয় পুরস্কার পায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বি এফ জে) গুরু দত্তকে সেরা অভিনেতার পুরস্কার দেয়। তাঁর শেষবার পর্দায় আসা ঋষিকেশ মুখার্জির 'সাঝ অউর সাবেরা' (১৯৬৪) ছবিতে।

গুরু দত্তর জীবনে গীতা

গীতা রায়চৌধুরী বম্বের অন্যতম সেরা প্লেব্যাক সিঙ্গার। 'বাজি' ছবির গানের রেকর্ডিং-এর সূত্রে গুরু দত্তের সঙ্গে আলাপ। দু'জনের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই মন দেওয়া-নেওয়া সারা হয়ে গেল। গীতা তখন খ্যাতির চূড়ায়, গুরু দত্ত তখন নেহাতই স্ট্রাগলার। এই সম্পর্কে গীতার বাড়ির লোকের ঘোরতর আপত্তি ছিল। গীতার জেদের কাছে পরিবারকে হার মানতে হয়। সম্পূর্ণ বাঙালি রীতি রেওয়াজ মেনে গায়ে হলুদ থেকে ফুলশয্যার অনুষ্ঠান পালিত হয়। গীতার পরিবার বিয়েতে যে জাঁকজমক করে, তা দেখে গুরুর ভাইবোনেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ের পর নানা কানাঘুষো শুরু হয়। অনেকেই আড়ালে আবডালে বলতে থাকে গুরু বিয়ে করেছে গীতার টাকা দেখে। গুরু দত্তের পরিবার সত্যিই আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ ছিল। গুরু দত্তের বম্বের বাড়িতে নাকি প্রথম সিলিং ফ্যান কেনা হয় 'বাজি' ছবির সাফল্যের পর। গীতা রায়চৌধুরী থেকে গীতা দত্ত হওয়ার পর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। পরিচালক অভিনেতা প্রযোজকরূপে গুরু দত্ত সাফল্যের চূড়ায় ওঠেন। খ্যাতি অর্থ সব কিছু আসতে থাকে বন্যার মতো।

দু'জনের প্রেম থেকে সমস্যা

গীতা গুরুকে খুব ভালোবাসতেন আর প্রচণ্ড পজেসিভ ছিলেন। গুরুর শুটিং-এর সময় গিয়ে ফ্লোরে বসে গুরুর ওপর নজরদারি করতেন। কিন্তু গুরু দত্ত কি কম পজেসিভ ছিলেন? তিনি চাইতেন না গীতা তাঁর ছবি ছাড়া অন্যত্র গান করুন। এইসব টানাপোড়েনে গীতার কেরিয়ার খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গীতা ও গুরু দত্তের দুই ছেলে তরুণ ও অরুণ এবং এক মেয়ে নীনা।

গুরুর জীবনে ওয়াহিদা রহমান

ওয়াহিদা রহমানের আগমন গুরু আর গীতার সম্পর্ককে আরও জটিল করে তোলে। তেলেগু ছবির নবাগত নায়িকা ওয়াহিদাকে গুরু দত্ত ঘষে মেজে দেশের অন্যতম সেরা তারকায় পরিণত করেন। গ্রিক পুরাণের পিগম্যালিয়নের মতো গুরু দত্ত নিজের সৃষ্টির প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে দেশজুড়ে গসিপের বন্যা বইত। আবার ওয়াহিদা ও গুরু দত্তের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মীয় ভিন্নতা ছিল বড় অন্তরায়। গীতাকে খুশি করতে গুরু দত্ত তাঁকে নায়িকা করে গৌরী নামে একটি ছবির শুটিং শুরু করেন ১৯৫৭ সালে। যদিও স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় সেই ছবি অসমাপ্তই থেকে যায়।

গুরু ও গীতার বিবাদ ও মৃত্যু

তাঁদের পারস্পরিক বিবাদের জেরে পালিহিলের বাড়ি ছেড়ে গুরু দত্ত পেডার রোডে আলাদা থাকা শুরু করেন। মৃত্যুর আগের রাতে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ লেখক-পরিচালক আবরার আলভির সঙ্গে পরের প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করেন। মৃতদেহ আবিষ্কারের পর প্রথম সেখানে পৌঁছান দেব আনন্দ। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি গ্লাসে একটি গোলাপী পানীয় দেখতে পান। গ্লাসটি গুরু দত্তের ঘরের বেডসাইড টেবিলে ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ বলা হয় মদের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ মেশানোকে। বোন ললিতা মনে করেন এটি আত্মহত্যা। এর আগেও গুরু দত্ত দু'বার আত্মহননের চেষ্টা করেছিলেন। 'সাহেব বিবি গোলাম' ছবির সময় ঘুমের ওষুধ বেশি খেয়ে ফেলায় তিনি তিনদিন কোমায় ছিলেন। জ্ঞান ফিরতে প্রথম যে শব্দটি উচ্চারণ করেন সেটি গীতা।

গুরুর অকাল প্রয়াণের পর গীতারও মৃত্যু

গুরু দত্তের মৃত্যুর পর বলিউড সহজে নিজের ছন্দে ফিরেছিল। কিন্তু ফিরতে পারেননি গীতা। গুরু দত্তের অকাল প্রয়াণে জীবনের প্রতি সব আসক্তি হারিয়ে ফেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ১৯৭২ সালে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে গীতা দত্ত প্রয়াত হন।

শতবর্ষে গণকবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যের বহুপরিচিত, বহুপঠিত কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত এক নাম কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। সবার কাছে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত। ইংরেজ কবি শেলি, কিটস প্রমুখের মতো তাঁরও জীবন ফুরিয়ে যায় খুব কম বয়সে। মাত্র ২১ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যে অবদান রেখেছেন, তার কোনো তুলনা নেই। এবছর তাঁর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন চলছে।

জন্ম ও পরিবার

পিতা নিবারণ ভট্টাচার্য, মা সুনীতি দেবী। ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট সুকান্ত ভট্টাচার্য মাতামহের বাড়ি কলকাতার কালীঘাটের ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এক নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্ম। তাঁর পৈতৃক বাড়ি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার অন্তর্গত ঊনশিয়া গ্রামে। বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে অকৃতকার্য হন। এই সময় ছাত্র আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ায় তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। সুকান্তের বাল্যবন্ধু ছিলেন কবি অরুণাচল বসু। সুকান্ত সমগ্রতে লেখা সুকান্তের চিঠিগুলির বেশিরভাগই অরুণাচল বসুকে লেখা। অরুণাচল বসুর মাতা কবি সরলা বসু সুকান্তকে পুত্রস্নেহে দেখতেন। কবির জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল কলকাতার বেলেঘাটার ৩৪ হরমোহন ঘোষ লেনের বাড়িতে। সেই বাড়িটি এখনো অক্ষত আছে। কাছেই কবির ভাইদের মধ্যে দু'জন, বিভাস ভট্টাচার্য ও অমিয় ভট্টাচার্যের বাড়ি। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন সুকান্তের সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রগতিশীল রাজনীতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। সেই বছর আকাল নামক একটি সংকলন গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কৈশোর থেকেই সুকান্ত যুক্ত হয়েছিলেন সাম্যবাদী রাজনীতির

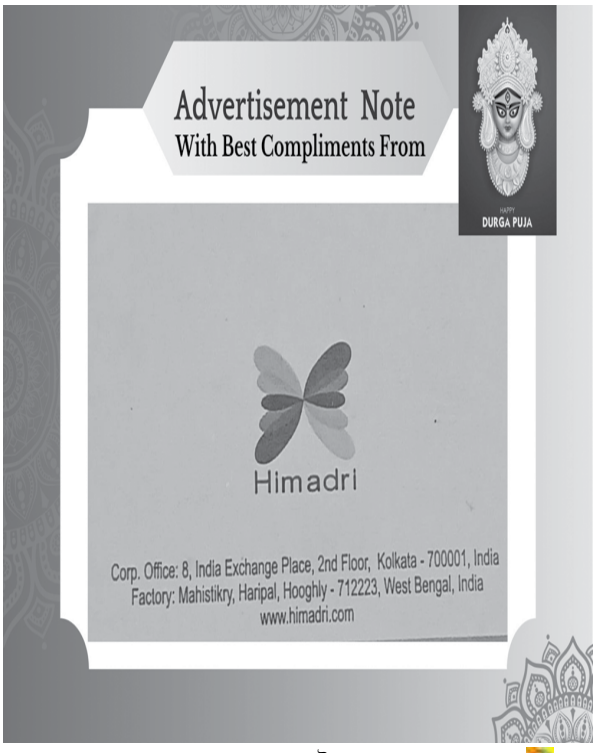

সঙ্গে। পরাধীন দেশের দুঃখ, দুর্দশাজনিত বেদনা এবং শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন, শোষিত মানুষের কর্ম জীবন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম তাঁর কবিতার মূল প্রেরণা। ১৯৪১ সালে সুকান্ত কলকাতা রেডিওর 'গল্প দাদুর আসর'এ যোগদান করেন। সেখানে প্রথমে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেই আসরেই নিজের লেখা কবিতা পাঠ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। গল্প দাদুর আসরের জন্য সেই বয়সেই তাঁর লেখা গান মনোনীত হয়েছিল আর সেই গান সুর দিয়ে গেয়েছিলেন সেকালের অন্যতম সেরা গায়ক পঙ্কজ মল্লিক। সুকান্তকে আমরা কবি হিসেবেই জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন কেবলমাত্র কবি ছিলেন না, সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তেমনি সুকান্তও ওই বয়সেই লিখেছিলেন কবিতা ছাড়াও, গান, গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধ। তাঁর 'ছন্দ ও আবৃত্তি' প্রবন্ধটি পাঠেই বেশ বোঝা যায় ওই বয়সেই তিনি বাংলা ছন্দের প্রায়োগিক দিকটিই শুধু আয়ত্বে আনেননি, সে নিয়ে ভালো তাত্ত্বিক দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন।

সাহিত্যকর্ম

আট-নয় বছর বয়স থেকেই সুকান্ত লিখতে শুরু করেন। স্কুলের হাতে লেখা পত্রিকা 'সঞ্চয়'-এ একটি ছোট্ট হাসির গল্প লিখে আত্মপ্রকাশ করেন। তার দিনকয়েক পরে বিজন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিখা' কাগজে প্রথম ছাপার মুখ দেখে তাঁর লেখা বিবেকানন্দের জীবনী। মাত্র এগারো বছর বয়সে 'রাখাল ছেলে' নামে একটি গীতি নাট্য রচনা করেন। এটি পরে তাঁর 'হরতাল' বইতে সংকলিত হয়। বলে রাখা ভালো, পাঠশালাতে পড়বার কালেই 'ধ্রুব' নাটিকার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সুকান্ত। সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাল্য বন্ধু লেখক অরুণাচল বসুর সঙ্গে মিলে আরেকটি হাতে লেখা কাগজ 'সপ্তমিকা' সম্পাদনা করেন। অরুণাচল তাঁর আমৃত্যু বন্ধু ছিলেন। মার্কসবাদী চেতনায় আস্থাশীল কবি হিসেবে সুকান্ত কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করে নেন। সুকান্তকে বলা হয় গণমানুষের কবি। অসহায়-নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের সুখ, দুঃখ তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের স্বার্থে ধনী মহাজন অত্যাচারী প্রভুদের বিরুদ্ধে নজরুলের মতো সুকান্তও ছিলেন সক্রিয়। যাবতীয় শোষণ-বঞ্চনার বিপক্ষে সুকান্তের ছিল দৃঢ় অবস্থান। তিনি তাঁর কবিতার নিপুণ কর্মে দূর করতে চেয়েছেন শ্রেণি বৈষম্য। মানবতার জয়ের জন্য তিনি লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অসুস্থতা অর্থাভাব তাঁকে কখনো দমিয়ে দেয়নি। মানুষের কল্যাণের জন্য সুকান্ত নিরন্তর নিবেদিত থেকেছেন। তিনি মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন। তাঁর অগ্নিদীপ্ত সৃষ্টি দিয়ে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে প্রয়াসী ছিলেন। মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা কাব্যধারার প্রচলিত প্রেক্ষাপটকে আমূল বদলে দিতে পেরেছিলেন। সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা দৈনিক স্বাধীনতার (১৯৪৫) 'কিশোর সভা' বিভাগ সম্পাদনা করতেন। মার্কসবাদী চেতনায় আস্থাশীল কবি হিসেবে সুকান্ত কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান করে নেন। তাঁর কবিতায় অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ পাঠকদের সংকুচিত করে তোলে। গণমানুষের প্রতি গভীর মমতায় প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর রচনাবলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল: ছাড়পত্র (১৯৪৭), পূর্বাভাস (১৯৫০), মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩), ঘুম নেই (১৯৫৪), হরতাল (১৯৬২), গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫) প্রভৃতি। পরবর্তীকালে উভয় বাংলা থেকে সুকান্ত সমগ্র নামে তাঁর রচনাবলি প্রকাশিত হয়। সুকান্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের পক্ষে আকাল (১৯৪৪) নামে এক কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। সুকান্তের কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যে ও লৈখিক দক্ষতায় অনন্য। সাধারণ বস্তুকেও সুকান্ত কবিতার বিষয় করেছেন। বাড়ির রেলিং ভাঙা সিঁড়ি উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। সুকান্তের কবিতা সব ধরনের বাধা-বিপত্তিকে জয় করতে শেখায়। যাপিত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাকে মোকাবিলা করার সাহস সুকান্তের কবিতা থেকে পাওয়া যায়। তারুণ্যের শক্তি দিয়ে উন্নত শিরে মানুষের মর্যাদার জন্য মানুষকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান সুকান্তের কবিতায় লক্ষণীয়। সুকান্তের কবিতা সাহসী করে, উদ্দীপ্ত করে। তাঁর বক্তব্য প্রধান সাম্যবাদী রচনা মানুষকে জীবনের সন্ধান বলে দেয়। স্বল্প সময়ের জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জীবনানন্দ দাশসহ সে সময়ের বড় বড় কবির ভিড়ে তিনি হারিয়ে যাননি। নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন নিজ প্রতিভা, মেধা ও মননে। সুকান্ত তাঁর বয়সের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন তাঁর পরিণত ভাবনায়। ভাবনাগত দিকে সুকান্ত নিজের বয়স থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন।

চলে যাওয়া

একাধারে বিপ্লবী ও স্বাধীনতার আপোসহীন সংগ্রামী কবি সুকান্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী। পার্টি ও সংগঠনের কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে নিজের শরীরের ওপর যে অত্যাচারটুকু তিনি করলেন তাতে তাঁর শরীরে প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে কলকাতার ১১৯ , লাউডন স্ট্রিটের রেড এড কিওর হোমে মৃত্যুবরণ করেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন মাত্র ২১ বছরের আর লেখালেখি করেন মাত্র ৬-৭ বছর। সামান্য এই সময়ে নিজেকে মানুষের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর রচনা পরিসরের দিক থেকে স্বল্প অথচ তা ব্যাপ্তির দিক থেকে সুদূরপ্রসারী।

কলকাতায় ৬টি হেরিটেজ ও জাদুঘর

কলকাতার নানা জায়গায় রয়েছে নানা ধরনের জাদুঘর। শুধুমাত্র সংগ্রহশালা নয়, এক একটা জাদুঘর আর তার ইতিহাস আলাদা। তারই কিছু খোঁজ দেওয়া হল।

আলিপুর জাদুঘর

ব্রিটিশ ভারতে নির্মিত কলকাতার প্রাচীনতম সংশোধনাগারের মধ্যে একটি হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। তৈরি হয়েছিল ১৯০৬ সালে।

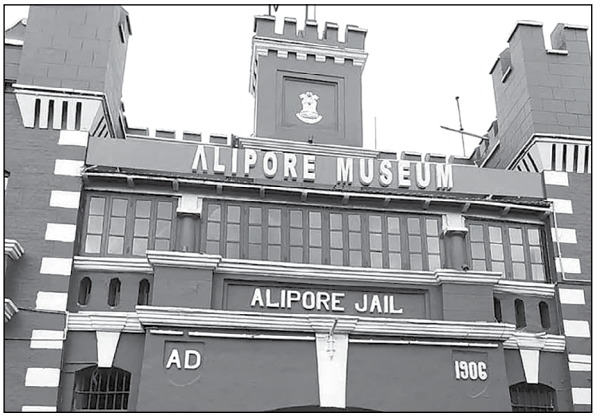

'হেরিটেজ' ঘোষণা হওয়ার পর ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে আর কোনও আবাসিককে রাখা হয় না সেখানে। সরকারি উদ্যোগেই এই সংশোধনাগার রূপান্তরিত হয় জাদুঘরে। এখন এটি কলকাতার অন্যতম ভ্রমণ স্থান। এই সংশোধনাগারের মধ্যেই এক সময়ে বন্দি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, রাধাচরণ পাল, প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরীরা। তাঁদের থাকার কুঠুরি, কীভাবে তাঁরা বন্দিজীবন কাটিয়েছেন, সব কিছুর নিদর্শন রয়েছে এখানে। ধ্বনি-আলোর অনুষ্ঠানও হয় এখানে। তার জন্য আলাদা টিকিট কাটতে হয়। ভিতরেই আছে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। কফি হাউস থেকে শুরু করে ফুড জোন।

সময় : মঙ্গলবার থেকে রবিবার দুপুর ১২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ধ্বনি-আলোর অনুষ্ঠান দেখতে হলে তা শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টার পরে।

নেতাজি ভবন

১৯০৯ সালে এলগিন রোডের এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর বাবা জানকীনাথ বসু। এখানেই সুভাষচন্দ্রকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল ইংরেজরা। সেখান থেকেই সুকৌশলে ব্রিটিশদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে দেশ ছেড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। ইতিহাসের অনেক স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি পরে সরকারকে দিয়ে দিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। ১৯৬১ সালে এই বাড়িটিকেই জাদুঘর ও গবেষণা কেন্দ্রের রূপ দেয় 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করা হয় এখানে। তাঁর ব্যবহার করা অনেক অমূল্য জিনিসপত্রও সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। রয়েছে তাঁর জামাকাপড়, খাট, জুতো, স্যুটকেস। ১৯৪১ সালে অন্তর্ধানের দিন যে গাড়িটি ব্যবহার করেছিলেন সুভাষচন্দ্র, তাও সযত্নে রাখা রয়েছে এই বাড়িতে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতি থাকাকালীন ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে এই ভবনের যে ঘরটিতে তিনি বসতেন ও সকলের সঙ্গে দেখা করতেন, সেটি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত টেবিল, বইয়ের তাক, আসবাবও রয়েছে সেই আগের মতোই।

সময়: সোমবার ছাড়া প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জাদুঘরটি সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে।

এশিয়াটিক সোসাইটি

১৭৮৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস কলকাতার

ফোর্ট উইলিয়ামে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮০৮ সালে দক্ষিণ কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের একটি ভবনে এই প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে ১৯৬৫ সালে এই ঐতিহাসিক ভবনটির পাশেই আরও একটি ভবন তৈরি হয়। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা রয়েছে। লক্ষাধিক দুষ্প্রাপ্য বই, পুঁথি, মুদ্রা সংরক্ষিত রয়েছে সেখানে। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি কেন্দ্রের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা 'জাতীয় গুরুত্ব' প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাসম্পন্ন।

সময়: সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ও শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা।

মার্বেল প্যালেস

১৮৩৫ সালে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক এই প্রাসাদটি তৈরি করেন। জোড়াসাঁকোর কাছে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে রয়েছে এই রাজকীয়

প্রাসাদ। এখানকার অফিসঘরে কাঠের ঝাড়বাতির দিকে চোখ পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়। দেওয়ালে হাডসনের দেড়শো বছর আগের তৈলচিত্র মুগ্ধ করবে। শিল্পরসিক রাজেন মল্লিকের আর্ট গ্যালারিও আছে এখানে। মার্বেল প্যালেসের সেরা আকর্ষণ হল এখানকার চিড়িয়াখানা ও পক্ষীশালা। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও হরিণের দেখা মিলবে সেখানে। প্রাসাদোপম এই বাড়ির নীচের তলায় রয়েছে সংগ্রহশালা। বিশাল বিশাল ফুলদানি থেকে ঝাড়লণ্ঠন, মূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে। মার্বেল প্যালেসে রাজেন মল্লিকের যাবতীয় শখ-আহ্লাদ, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মকর্ম সবেরই নিদর্শন রয়েছে। ঠাকুরদালানে রামায়ণ ও গ্রিক পুরাণের নানা নিদর্শন দেখা যাবে। প্রাসাদের ভেতরের বাগানে রয়েছে ১০০ বছরেরও পুরোনো গাছপালা। এখানে বসেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর ১২৫ বছরে গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সময়: বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকে। সোমবার বন্ধ।

জিপিও মিউজিয়াম

১৮৬৮ সালে ইউরোপীয় স্থাপত্যের আঙ্গিকে তৈরি হয় জিপিও-র সাদা ভবন। তারই পশ্চিমে ইতালীয় ধাঁচের লাল ইটের তিনতলা বাড়িটি বর্তমানে ডিরেক্টর জেনারেল অফ কলকাতা জিপিও। ভবনের একতলায় রয়েছে সংগ্রহশালা, যা 'পোস্টাল মিউজিয়াম' নামে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনকালে ডাকব্যবস্থা কেমন ছিল সেই

ইতিহাস সংরক্ষিত আছে এখানে। খুঁত-থাকা পয়সা বাতিল করার জন্য ১৯১২ সালে টাঁকশাল থেকে জিপিও-কে কয়েন কাটার যন্ত্র দেওয়া হয়। তা-ও রয়েছে স্মারক হিসাবে। রয়েছে রানারের ব্যবহৃত পোশাক, অস্ত্র, ঘন্টা আর লণ্ঠন। পুরোনো সব মানচিত্র, ডাকবাক্স, স্ট্যাম্পের সংগ্রহ রয়েছে। জিপিও সংগ্রহশালায় গেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাসবই ও তাঁর সেই মহামূল্য স্বাক্ষর দেখতে ভুলবেন না।

সময়: প্রতিদিনই বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খোলা থাকে সংগ্রহশালা।

নৌকা জাদুঘর

কলকাতার কাঁকুড়গাছির সিআইটি রোডে এই জাদুঘর। এটি ভারতে প্রথম নৌকা যাদুঘর ও শহরের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ।

জাদুঘরটি ২০১৪ সালে আম্বেদকর ভবনে স্থাপন করা হয়। এটি বোট মিউজিয়াম হিসাবে বেশি পরিচিত।

নৌকার কারিগরদের প্রথাগত প্রশিক্ষণ না থাকলেও তাঁর সাধারণ জ্ঞান ও অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে ঐতিহ্যবাহী নৌকা নির্মাণ এমন একটি জ্ঞান, যা 'গুরু-গুরু পরম্পরা' শৈলীতে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রসারিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, দ্রুতগতির পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য নৌকার মতো অনেক বর্তমান সময়ের নৌকাগুলিও হারিয়ে যাওয়ার পথে।

জাদুঘর গড়ে তোলার আগে স্বরূপ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ গবেষণা চালানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তফশিলি জাতিভুক্ত কারিগররা নিখুঁত ভাবে প্রতিটি নৌকো তৈরি করেছিলেন। জাদুঘরটি পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের

উদ্যোগে তৎকালীন মন্ত্রী ডঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ২০১৪ সালে উদ্বোধন করেন। জাদুঘরের পোশাকি নাম, 'হেরিটেজ বোটস অফ বেঙ্গল'। জাদুঘরে রয়েছে ৪৬টি নৌকার মডেল।

এই জাদুঘরে দুই বাংলার নৌকো সম্ভারের মডেল সংরক্ষিত রয়েছে। প্রতিটি মডেলের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে নৌকোর মাপ, কোথায় সেসব ব্যবহার হয় বা একসময় হত, কতদিন আগে কী কাজে ব্যবহার করা হত, তার তথ্যপঞ্জি। একই ধরনের যাত্রীবাহী অথবা মালবাহী নৌকোর চেহারা আবার অঞ্চলবিশেষে একেকরকম। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের নদীর নাব্যতা আলাদা হওয়ায় তাদের নির্মাণশৈলীও আলাদা। পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের নৌকার মধ্যেও রয়েছে তেমন ফারাক। আবার খালবিলে যে নৌকো চলে, তার সঙ্গে বিস্তর ফারাক উপকূলবর্তী অঞ্চলের নৌকোর। মাছ ধরার জন্য তৈরি নৌকো আর প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য তৈরি নৌকোর ধাঁচও একেবারেই আলাদা। জাদুঘরে হরপ্পা যুগের নৌকা থেকে আধুনিক যুগের নৌকা প্রদর্শিত হয়। এখানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পাশাপাশি কেরল ও তামিলনাড়ুর নৌকার মডেলও সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পানসি নামের একটি নৌকার প্রতিরূপ ১৮ শতকের অঙ্কিত চিত্র থেকে তৈরি করা হয়।

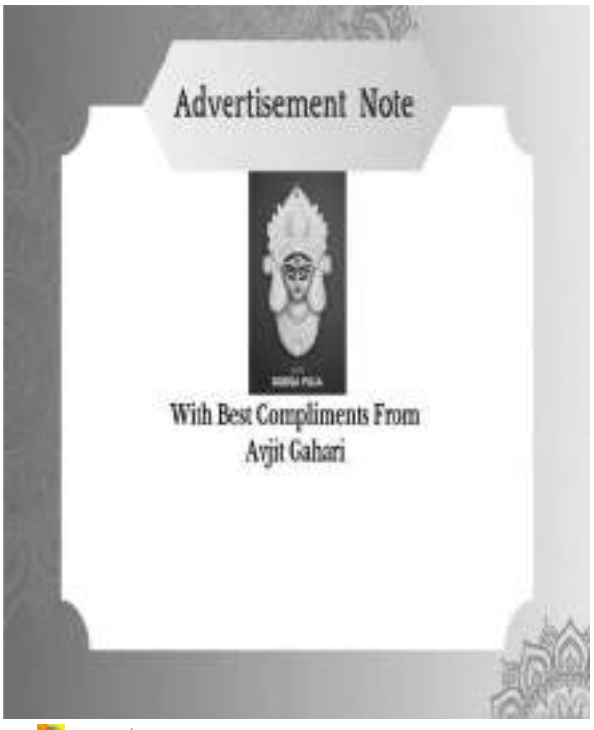

জাদুঘরের প্রদর্শনী কক্ষের মাঝে নৌকার একটি বৃহৎ রেপ্লিকা রয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার সময়কার একটি নৌকার রেপ্লিকা আছে। প্রদর্শনীর মাঝখানে একটি বড়ো আকারের নৌকা প্রদর্শিত হয়েছে। জাদুঘরে ছিপ, ছোট, ডিঙি ছাড়াও রয়েছে কাইলে বাছারি, খেয়া, খোরোকিস্তি, পানসি, তালাইয়ের মতো বাংলার ছোট ছোট নৌকার রেপ্লিকার সঙ্গে বৃহৎ আকারের আবার ময়ূরপঙ্খীর রেপ্লিকাও প্রদর্শিত। জাদুঘরটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বজরা 'পদ্মা'-র রেপ্লিকাও প্রদর্শিত হয়েছে।

কখন খোলা থাকে : জাদুঘরটি সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার জনসাধারণের জন্য খোলা থাকে। সকাল ১১ থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। জাদুঘরে ঢোকার জন্য কোনো টিকিট লাগে না।

পাঁচের দশক থেকে সাতের দশকে বিরতির সময় সিনেমা হলে এক ধরনের প্রচারপুস্তিকা পাওয়া যেত, যার জুড়ি মেলা ভার। সেসময় এর এক অন্য আকর্ষণ ছিল। পুরোনো সেই ইন্টারভ্যালের বইয়ের কথা জানাচ্ছেন অভিনেতা ও শিক্ষাবিদ

ড. শঙ্কর ঘোষ

হাড়ভাঙা গ্রামের জমিদার প্রয়াত ন্যাংটেশ্বর চৌধুরীর নামে ফুটবলের শিল্ড টুর্নামেন্ট চালু করেছিলেন ন্যাংটেশ্বরের বড় ছেলে গোবর্ধন ওরফে গোবর। তাঁর আশ্রিতা ভাগ্নি মনসা বেপরোয়া ও ডানপিটে। কলকাতার টিম ফাইনালে খেলতে এসে বিরতির আগে ১ গোলে পিছিয়ে পড়ে। দলের ক্যাপ্টেন কালা দত্ত। মনসা বগলার গলায় ঘুঁটের মালা পরিয়ে দেয়। বিরতির পর বগলার টিম গোবরের টিমের বিরুদ্ধে ১২টা গোল করে। বগলা এবার গিয়ে মনসার গলায় ঘুঁটের মালা পরিয়ে দেয়। এইসব কাণ্ডকারখানায় গোবর রেগে অস্থির। বন্দুক উঁচিয়ে সেই রাতেই বগলার সঙ্গে মনসার বিয়ে দিয়ে ছাড়েন গোবর। বগলার দাদা নিঃসন্তান কালী দত্তর কাছে ভাই হল ছেলের থেকেও বেশি আর ফুটবল হল প্রাণ। সেই কালী দত্ত এই বিয়ে কিছুতেই মানলেন না।।স্ত্রী স্নেহময়ীর শত অনুরোধে তার মন ভিজল না। বগলাকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়ালেন, কিন্তু মনসা জোর করে বাড়িতে ঢুকল। কালী নির্দেশ দিলেন, যতদিন মনসা এই বাড়িতে থাকবে, ততদিন বগলা এই বাড়িতে ঢুকতে পারবে না। এই কথা শুনে স্নেহময়ীর বুক কেঁপে উঠল। কারণ তিনি জানেন, সারা পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও তাঁর কথার নড়চড় হবে না। তাই স্নেহময়ী এখন একমাত্র চিন্তা, কালীর মন কি শান্ত হবে কোনোদিন? বগলা কি আর কখনো, কোনোদিন এই বাড়িতে আসতে পারবে? নিরাপরাধ মনসা কি কোনোদিন বধূর মর্যাদা পাবে এই বাড়িতে? এর উত্তর রূপালি পর্দায় দেখুন। এই যে সিনেমার গল্পের সারাংশ ও শেষে কিছু প্রশ্ন নিয়ে উত্তর খোঁজার জন্য রূপালি পর্দায় নজর রাখতে বলা হয়েছে - এই সবই সিনেমাটির প্রচারপুস্তিকাতে পাওয়া যাবে। আর ছবিটা হল এক সময়ের জনপ্রিয় সিনেমা অরবিন্দ মুখার্জির ‘ধন্যি মেয়ে’। এই পুস্তিকাকে বলা হয় ইন্টারভ্যালের বই বা হাফ টাইমের বুকলেট। এই প্রজন্মের দর্শক এই বইয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচিত নন। কিন্তু আটের দশকের শেষ অবধিও এ ধরনের পুস্তিকা বেরোতো। এর পথ চলা শুরু হয় নির্বাক যুগের সময় থেকে। পরিবেশক সংস্থার পক্ষ থেকে যিনি প্রচার সচিবের কাজ করতেন (আজকের ভাষায় পিআরও)। তিনি দায়িত্বে থাকতেন এই বুকলেট প্রকাশের দায়িত্বে।

কী কী থাকত এই প্রচারপুস্তিকায়? বেশিরভাগ ছবির বুকলেট হত ৮ পাতার। পাতায় পাতায় ওই ছবির বিভিন্ন শিল্পীর মুখ বা সিনের ছবি। প্রথম মলাটে থাকত ছবির নাম, প্রোডাকশন হাউসের নাম, আকর্ষণীয় কিছু স্টিল। দ্বিতীয় পাতা বরাদ্দ থাকত ছবির সঙ্গে জড়িত শিল্পী আর কলাকুশলীদের নামে। লেখক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক, গীতিকার, সুরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্পীর নাম ও প্লেব্যাক শিল্পীদের নাম থাকত। ৩ এর পাতা, কখনো কখনো ৪ পাতা জুড়ে থাকত ছবির সারাংশ। কিন্তু এমনভাবে শেষের কথা থাকত, তাতে দর্শক বিরতিতেও ওই শেষটুকু বুকলেটে পড়ার পর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন, বড় পর্দায় কখন ফুটে উঠবে সেইসব প্রশ্নের উত্তর। যে ছবিতে গানের আধিক্য বেশি ছিল, সেসব ছবির গান দু ‘পাতা নিয়ে নিত। বড় বড় হাউজ শেষের পাতাটি ধরে রাখত ছবির বিজ্ঞাপন হিসাবে। সেখান থেকে পাঠক দর্শক জানতে পারতেন, কী কী ছবি তৈরি অবস্থায় রয়েছে। বেশ কিছু ছবির ক্ষেত্রে অবাঙালি দর্শকদের সুবিধার জন্য বাংলার পাশাপাশি ইংরিজিতে সামারি দেওয়া হত। যেমন, সত্যজিৎ রায়ের বেশিরভাগ ছবির বুলেটের সামারি বাংলার পাশাপাশি ইংরিজিতে থাকত।

সুচিত্রা সেনের সাত পাকে বাঁধা ছবি যখন মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠানো হয়, সেখান থেকে সুচিত্রা সেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান ১৯৬৩ সালে, সেই ছবির উৎসবে পাঠানো বুকলেটে ইংরিজির পাশাপাশি রাশিয়ান ভাষায় সামারি ছাপানো হয়। শুধু তাই নয়, শিল্পী কলাকুশলীদের নামও ছাপা হয়েছিল রাশিয়ান ভাষায়।

বিরতির সময় যখন চিপস, কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রসারী হাঁকতেন, ঠিক তখন হলে ঢুকে কেউ একজন বিক্রি করতে আসতেন ওই সব বুকলেট। গোড়ার দিকে এর দাম ছিল ৫০ পয়সা। পরে দাম হয় ৩ টাকা পর্যন্ত। এই চল শুধু কলকাতা শহরে আটকে ছিল না, শহরতলিতে, গ্রামের প্রেক্ষাগৃহেও এইসব পুস্তিকা বিক্রি হত। অনেকে এইসব বই কিনতেন। কারোর কাছে গানের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ছবির জনপ্রিয় গান ওই সব বইয়ে ছাপা হত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া মণিহার ছবির গান জনপ্রিয়তায় সব সীমা ছাড়ায়। ফলে দেখা গেল, ওই বইয়ের চাহিদা এমন জায়গায় পৌঁছায় যে দু 'বার প্রিন্ট করতে হয়।

শুধু সিনেমার ক্ষেত্রে নয়, পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলোয় (বিশ্বরূপা, রংমহল, স্টার থিয়েটার, সরকারিনা, রঙ্গনা, বিজন থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার) বিরতির সময় এই ধরনের হাফ টাইম বুকলেট পাওয়া যেত। সেখানে অবশ্য অঙ্কের উল্লেখ আর অঙ্কের ভেতরের দৃশ্যের উল্লেখ থাকত। এই ছাঁচ ও আজকের নয়। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ যখন বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ করাচ্ছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটক, তখন ইউরোপীয় দর্শকদের সুবিধার জন্য নাটকের সামারি বিলির কথা মাথায় এল সিংহভাইদের। ওই নাট্যশালার সঙ্গে গৌরদাস বসাক ও কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলি, মধুসূদন দত্তের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। বন্ধুদের অনুরোধে রত্নাবলী'র সামারি ইংরিজিতে লেখেন মধুসূদন। নিজে সে নাটকে অভিনয়ও করেন। যদিও রমরমিয়ে চলা রত্নাবলী মধুসূদনকে আনন্দ দিতে পারেনি। পরের ইতিহাস সবার জানা। ওই সারাংশ লেখার সূত্র ধরে মধুসূদনের নাট্যকার হিসাবে আবির্ভাব। সেটাই বড় কথা।

সিনেমার বুকলেটে ছিল শিল্পের ছাপ। ওই সব বুকলেট আকর্ষণীয় করার জন্য নানা উপায় বার করা হয়। সত্যজিৎ রায়ের ছবির বুকলেট পরিকল্পনা সত্যজিৎ রায় নিজেই করতেন। যদিও কোনো না কোনো পিআরও থাকতেন। সত্যজিৎ রায়ের বেশিরভাগ ছবির প্রচার সামলাতেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। ওই সময়ের জনপ্রিয় প্রচারবিদের মধ্যে ছিলেন ফনীন্দ্র পাল, রমেন চৌধুরী, শ্রীপঞ্চানন, রনজিৎ কুমার মিত্র, সুকুমার ঘোষ, বিধুভূষণ ব্যানার্জি, বিজয় রায় প্রমুখ। প্রখ্যাত সাংবাদিক আশিসতরু মুখোপাধ্যায় ও মঞ্চু দের স্বর্গ হতে বিদায় ও পার্থপ্রতিম চৌধুরীর দোলনা ছবির প্রচার সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। এক সময়ে প্রচার জগৎ দাপিয়ে বেড়াতেন শ্রীপঞ্চানন। ৮৭ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রিটের বাড়িটি ছিল বাংলা সিনেমার লক্ষীর বাড়ি। কারণ এই বাড়িতেই ছোটো বড়ো মাঝারি ঘর নিয়ে ছিল পরিবেশক সংস্থার দফতর। পাশাপাশি লেনিন সরণিতে ছিল চণ্ডীমাতা, ছায়াবাণী, মিতালী ফিল্মস, অরোরা ফিল্মস সহ নানা বিখ্যাত পরিবেশক সংস্থার অফিস।। সেখানে বাঁধাধরা প্রচার সচিবরা থাকতেন। তাঁদের কাছে ছবির সারাংশ, গানের লাইন, স্টিল ফটো সহ যাবতীয় তথ্য দেওয়া হত। তাঁরা সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতেন এই সব বুকলেট।

অনেক অভিনব তথ্য জানা যায় এইসব পুস্তিকা থেকে। যেমন আর ডি বনশল প্রযোজিত বিভাস ছবির প্রচারপুস্তিকায় শেষ পাতায় আর ডি বনশালের পরের ছবির যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল, সেটা নষ্টনীড়' এর। কিন্তু মুক্তির আগে ছবির নাম পাল্টে সত্যজিৎ রায় দেন চারুলতা। সেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে ইন্টারভ্যাল বই। পার্থপ্রতীম চৌধুরী যখন আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি নিয়ে ছায়াসূর্য ছবি করলেন, তখন হাফটাইম বুকলেটে ছাপা হয় আশাপূর্ণা দেবীর একটি চিঠি, যা তিনি লিখেছিলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীকে। সেই চিঠি যেন গল্পের সারবস্তু : "স্নেহাস্পদ পার্থ, দুটি মেয়ে নিয়ে আমার এ গল্প। ঠিক গল্প নয়, যেন চোখে দেখা দুটি মেয়ে। দু'বোন। বৈমাত্রেয় নয়, একই মাতৃগর্ভজাত। আর শুনতে পাই দুটোতে নাকি মাত্র তেরো মাসের ছোটো বড়। এত কম সময়ের ব্যবধানে বিধাতা বদল হওয়া আশ্চর্য বটে, কিন্তু দু'জনকে একই বিধাতা গড়েছেন এটাও একেবারে বিশ্বাসের অযোগ্য। হয়তো বা ঠিক সেই সময়ে আসলে বিধাতা ছুটিতে ছিলেন, অস্থায়ী কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন আনাড়ি কেউ। আর এহেন মেয়ে দুটির নামকরণটাও মনে রাখার মতো। বড়র নাম মল্লিকা; ছোটর ঘেটু। ফুলের নাম। ইতি আশীবাদিকা আশাপূর্ণা দেবী"।

সুচিত্রা ও উত্তম অভিনীত ছবির মলাটে তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এছাড়াও উত্তমকুমার যখন অন্য নায়িকাদের বিপরীতে, তার আকর্ষণও কিছু কম নয়। সেসব ছবি ধরা আছে এইসব প্রচারপুস্তিকায়। সত্যজিৎ রায়ের মতো তরুণ মজুমদারও যত্নশীল ছিলেন তাঁর ছবিগুলোর প্রচারপুস্তিকার ব্যাপারে। নিজের নামে তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'আলোর পিপাসা'র বুকলেটটি দেখলে চোখ ও মন দুই জুড়িয়ে যায়। আটের দশকে যখন শেষ হওয়ার মুখে, তখনো এইসব বুকলেট বিক্রি হত সিনেমা হলের মধ্যে বিরতির সময়। সুজিত গুহর 'অমর সঙ্গী' বা অঞ্জন চৌধুরীর 'ছোটো বউ' ছবির বুকলেটগুলো তারই প্রমাণ দেয়। তারপর? একে একে নিভাইছে দেউলটি। ভালো গল্প, চিরদিনের মনে রাখার মতো গান, সুন্দর মুখের জুটি, দাপানো অভিনয় থেকে শুরু করে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে বাংলা ছবির জগৎ থেকে। তেমনিভাবেই হারিয়ে গেছে এইসব 'ইন্টারভ্যালের বই'। আর হাতিবাগান পাড়ার থিয়েটার হলগুলোর ঝাঁপ তো বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তাদের প্রচারপুস্তিকা বেরোবার আর প্রশ্নই আজ ওঠে না।

মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠ সৈনিক

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত দশটা। ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা চুপিসারে রেডিওতে কান পেতে সেই ভরাট আবেগময় উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায়। 'আকাশবাণী কলকাতা, খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়…' মোটা পাওয়ারের চশমা। মাইক্রোফোনের কাছে হুমড়ি খেয়ে সংবাদ পড়ছেন। স্টুডিওর মধ্যে শব্দের ওজনে, ঘটনার ভিন্নতায় ওই ব্যারিটোন ভয়েস কেমন করে শরীরের ভঙ্গিমাকে বদলে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে দিন-রাতের অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে সময়। তৈরি হচ্ছে খবর। শরীর ও মনে হিল্লোল তুলছে সেই খবরের দ্যোতনা। আন্দোলিত গোটা পূর্ব পাকিস্তান। এই সময়টুকুতে যুদ্ধের সংবাদে তারা মনে করতেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তাঁরাও সম্মুখযুদ্ধে নেমেছেন রাইফেলের বদলে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠকে হাতিয়ার করে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কণ্ঠস্বরে পৌঁছে যেতেন যুদ্ধরত মুক্তিসেনার কাছে। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে তা প্রেরণার কাজ করতো। এভাবেই শব্দকে কণ্ঠের জাদুতে মিশিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন মুক্তিযুদ্ধের শব্দসেনা। সেই শব্দতরঙ্গ কখন যেন দেশভাগের জ্বালাকে মুছিয়ে দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে আবার পূর্ব বাংলার সঙ্গে একাকার করে দিত। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠলেন বাঙালির এক প্রেরণা-কণ্ঠ।

সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল আকাশবাণী এবং বিবিসি রেডিও। উপেন তরফদারের প্রযোজনায়, প্রণবেশ সেনের গ্রন্থনায় রাত ১০টায় আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পরিক্রমায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠসৈনিক।

শুরুর কথা

১৯৩৪ সালের ২৫ জুন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম পশ্চিবঙ্গের নদিয়া জেলার শান্তিপুরে। বাবার নাম নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা নীহারবালা। শান্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলে তিনি কিছুদিন পড়াশোনা করেন। তারপর ওঁরা চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হোন সরস্বতী ইনস্টিটিউশনে। স্কুলের পড়াশোনার পর ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। কিন্তু সংসারের অর্থকষ্ট মেটাতে তিনি বন্ধ করেছিলেন পড়াশুনা। তাতে বিষম চটে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা। তিনি তখনই ছেলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

বিচিত্র পেশা

কলকাতায় ঘরছাড়া হয়ে উঠলেন হ্যারিসন রোডের একটি মেসে। ওই মেসে তখন থাকতেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। রোজগারের জন্য তখন যা পেতেন তাই

করতেন। কখনো গৃহশিক্ষকতা, কখনো টাইপিস্ট, কখনো স্টোরকিপার এমনকী চায়ের দোকানেও তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। অর্থকষ্ট এতটাই ভয়াবহ ছিল। এত অসুবিধার মধ্যেও তাঁর সৃজনী মনটা কিন্তু উধাও হয়ে যায়নি। সময় পেলেই শুনতেন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও বাচনভঙ্গি। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন কাজী সব্যসাচী। আবৃত্তিচর্চার সূত্রপাত তখনই। সারাদিন কাজ করতেন, রাতে ফিরে কলম-খাতা নিয়ে বসে যেতেন, কবিতাও লিখতেন। যৌবনে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখকশিল্পী সংঘে কাজ শুরু করেছিলেন। দেবদুলাল নিজেই লিখেছেন, "...পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। তখন উত্তর কলকাতার জেলেটোলা স্ট্রিটে 'অরণি' নামে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের একটি শাখা সংগঠনের কর্মী ছিলাম আমি"। আর এভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নাম। ১৯৫৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হোন।

আকাশবাণীর ঘোষক

এমনই একটা সময় সঙ্গীত পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত এবং সুবীর হাজরার (সত্যজিৎ রায়ের সহকারী) একটি ছবিতেও প্রোডাকশনের কাজ করেছিলেন তিনি। যদিও সে ছবি মুক্তি পায়নি। সুধীন দাশগুপ্তই তাঁকে আকাশবাণীর 'অনুষ্ঠান ঘোষক'-এর পদে চাকরির পরীক্ষা দিতে বলেন। অতঃপর ১৯৬০ সালে তিনি ঘোষক হিসাবে আকাশবাণীর চাকরিতে ঢোকেন। তারপর একটানা ৩৪ বছর আকাশবাণীতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। অচিরেই কুশলতায় হয়ে ওঠেন আকাশবাণীর সংবাদ ও ভাষ্যপাঠক। ১৯৬৪ সালে তিনি দিল্লিতে বাংলা বিভাগে সংবাদ পাঠক রূপে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফিরে আসেন কলকাতার বেতার কেন্দ্রে। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস, আগেই বলেছি।

আলাদা ঘরানা

সংবাদপাঠকে তিনি এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে, ঘরে ঘরে সংবাদ পরিক্রমা শোনার জন্য রেডিও খোলা হত। খবর পড়ায় একটা আলাদা ঘরানা তৈরি করেছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সহকর্মীদের মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, সমসাময়িক অনেকে তাঁকে নকল করতেন। কেউ কেউ গুরু মানতেন। তাঁর গভীরতা যে কতটা ছিল একটা ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। দেবদুলালের সঙ্গেই সংবাদ পড়তেন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। একবার খবর পড়তে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, "আকাশবাণী কলকাতা। খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়"। ডিউটি অফিসার তো মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছেন। কিন্তু এই ঘটনা ইঙ্গিত দেয় কী মারাত্মক প্রভাব ছিল দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কাজের প্রতি নিষ্ঠা

কাজের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড নিষ্ঠা। বানান নিয়ে ভয়ঙ্কর খুঁতখুঁতে ছিলেন। একটা ঘটনা। কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। প্রচুর বিদেশি ডেলিগেট এসেছেন শহরে। হঠাৎ আকাশবাণীর নিউজ রুমে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হন্যে হয়ে সব হাই কমিশনের ফোন নম্বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। উনি রেকর্ডিং-এর আগে সমস্ত হাই কমিশনে ফোন করে যাচ্ছেন। আর গম্ভীর মুখে কী সব আলোচনা করছেন। একটু পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। খবর পড়ার সময় নির্ভুল বিদেশি উচ্চারণে অনায়াসে বিদেশি নামগুলো বলে গেলেন। এই ছিলেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এর পরের ঘটনা। যখন কলকাতায় টেলিভিশন এল অনেকেই অপেক্ষা করেছিলেন কবে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন টেলিভিশনে খবর পড়তে। এলেন কিন্তু রেডিওর মতো আবেদন পাওয়া গেল না। পরে নিকটজনদের কাছে মজা করে বলেছিলেন, 'দু'দিন খবর পড়েই বুঝলাম, ওটা আমার কাজ নয়। বুঝলে, ওতে গ্ল্যামার লাগে, আর কী যেন বলে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। ওসব আমার নেই।'

বাচিকশিল্পী

কবিতার সঙ্গে মগ্ন সহবাসে বাচিক শিল্পী দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-জাদু-মায়ায় মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত না হয়ে পারা যায় না। আবৃত্তি শিল্পের জনপ্রিয়তার কাণ্ডারী ছিলেন তিনি। এই শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শৈশব থেকেই আবৃত্তির প্রতি দেবদুলালের ছিল গভীর অনুরাগ। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত শিল্পী শম্ভু মিত্রকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখে আবৃত্তিচর্চার প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। আকাশবাণীতে এসে তাঁর অন্যতম প্রিয় আবৃত্তিশিল্পী কাজী সব্যসাচীকে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে আবৃত্তিচর্চার প্রতি আরও উৎসাহিত হন। আবৃত্তি পঠিত শিল্প নয়, প্রয়োগ শিল্প, এটা তিনি মনেপ্রাণে অনুধাবন করতেন। তাই আবৃত্তিচর্চা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়েই তিনি উচ্চারণের শুদ্ধতা এবং দ্রুত-বাচনভঙ্গি, দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কণ্ঠস্বরের যত্ন ও চর্চায় তিনি ছিলেন অকৃপণ। ঈশ্বরপ্রদত্ত কণ্ঠস্বরটিকে সঠিক রাখার জন্য শোনা যায় তিনি নাকি পুকুরের মাঝখানে গিয়ে কীসব আওড়াতেন। রবি ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুকুমার রায় থেকে শুরু করে সমসাময়িক বহু কবির কবিতা তাঁর কণ্ঠের জাদুতে শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ রাখত। রবি ঠাকুরের প্রতি তাঁর টান ছিল খুব। রবি ঠাকুরকে নিয়ে তাঁর একটি কবিতা, 'তোমার গান, তোমার সুর' ১৩৮৮ বাংলা সনের ২৫ শে বৈশাখ 'সৌম্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতা ও গদ্য দুই-ই তিনি কণ্ঠের মাধুর্যে সুখশ্রাব্য করে তুলেছিলেন জনমনে। তাঁর ওই ব্যারিটোন কণ্ঠস্বরে বিমোহিত ছিল দুই বাংলার মানুষ, কয়েক দশক। পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, তরুণ চক্রবর্তী, জগন্নাথ বসুর মতো প্রখ্যাত বাচিক শিল্পীরাও তাঁর কাছে ঋণী বলে উল্লেখ করেছেন।

বাচ্চাদের আবৃত্তি শিক্ষার জন্য খুব সহজ সরল ভাষায় অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে লিখেছেন, ছোটদের বিষয়ঃ আবৃত্তি। এখানে এক জায়গায় দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপ করে লিখেছেন

– ইদানিং শিশুদের মুখে ছড়া প্রায় শোনাই যায় না। তাদের মুখ দিয়ে এমন সব ভারী ভারী দুরূহ কবিতা বলানো হয়, সেগুলোর অর্থ একবর্ণও তারা বোঝে না। আমার তাই মনে হয়, ছড়া শুনিয়ে ছড়া শিখিয়ে ছড়ার ছন্দে তার কান ভরিয়ে, ছড়ার মজায় তার মন মজিয়ে তারপর তাকে কবিতা-আবৃত্তি শেখানো উচিত। বোঝাই যায় শিশুমনের কত গভীরের খোঁজ তিনি রাখতেন।

অবসর জীবন

আকাশবাণী কলকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪ সালে অবসর নেন। কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে তাঁর নিজ বাসভবন। সেখানেই চারতলায় থাকতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন কত্থক নৃত্যশিল্পী রুবি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্ত্রীর সঙ্গে শুরু করেছিলেন 'রসকলি' নামে একটি আবৃত্তি ও নৃত্যচর্চা কেন্দ্র। কিন্তু ২০০৮ সালে তাঁর স্ত্রীর অকাল প্রয়াণে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে হঠাৎ সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি শুয়ে থাকতেন তাঁর ছোট্ট বিছানাতে। কারণ তিনি দুরারোগ্য পিএসপি বা প্রোগ্রেসিভ সুপ্রা নিউক্লিয়ার পলসি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বেশ কিছুদিন অসুস্থ হয়ে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল তাঁর। সেই দরাজ কণ্ঠ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। পরিবারের লোক ছাড়া কারও সঙ্গে তেমন সাক্ষাৎ করতেন না। মাঝে মাঝে হয়তো তাঁর অনুরাগীরা যেতেন, দু-চারটে কথা বলতেন তারপর আবার নিবিড় একাকীত্ব। নিজের বাসভবনে ২০১১ সালের ২ জুন ৭৭ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর কন্যা দেবারতী বন্দ্যোপাধ্যায় আর পুত্র দেবরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবদুলাল সম্পাদিত গ্রন্থ

কর্মক্ষেত্র থেকে অবসরের পর পর একক বা যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন বিভিন্ন বিষয়ের বই। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন, আবৃত্তি, ছোটদের বিষয়ঃ আবৃত্তি, বড়োদের আবৃত্তির কবিতা। পীতম ভট্টাচার্যের সঙ্গে লিখেছেন, আবৃত্তির বাংলা ব্যাকরণ। এছাড়া এককভাবে লিখেছেন বা সম্পাদনা করেছেন, সেরা আবৃত্তির কবিতা সংগ্রহ, গল্প সংকলন- বাংলাদেশের গল্প, প্রবন্ধ- সম্প্রচারের অন্তরালে এবং একাত্তরের যুদ্ধে ভারত-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু আবৃত্তির রেকর্ড/ক্যাসেট প্রকাশিত করেন। যেমন – বঙ্গভূমির প্রতি, কেউ কথা রাখেনি, উত্তরাধিকার (এইচ এম ভি), রবীন্দ্র বিচিত্রা – (অডিও), হৃদয়জ কিছু কথা (আধুনিক কবিতা) – হৃদিরঞ্জন ক্যাসেট, রথের রশি – সাউন্ড উই, ক্ষুদিরামের মা – গীতালি (বাংলাদেশ), কবিতার আবৃত্তি – বঙ্গীয় সংগীত পরিষদ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির ওপর কলকাতায় নির্মিত ' জয় বাংলা ' ছবিতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক বাংলাদেশি কবির ভূমিকায় অভিনয় করেন

বরুণদা ছিলেন ঘরোয়া মালিক সম্পাদক

দীর্ঘদিন বর্তমান পত্রিকায় কাজের সূত্রে প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক - সম্পাদক **বরুণ সেনগুপ্তকে** খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় সাংবাদিক **ড. রফিক আনোয়ারের**। এই পুজো সংখ্যায় রইলো তাঁর স্মৃতিচারণা।

মেদিনীপুরে স্কুলে পড়ার সময় সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তর নামটা প্রথম শুনি। আমার বাবা ছিলেন মেদিনীপুর জাজ কোর্টের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বাড়িতে আনন্দবাজার পত্রিকা আসত। ওই সময় প্রতি বৃহস্পতিবার 'রাজ্য রাজনীতি' নামে কলাম ছিল বরুণ সেনগুপ্তর। বাবার পাশাপাশি আমিও তাঁর সহজ ও সরল লেখার গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলাম।

এরপর মাস্টার ডিগ্রি পড়ার জন্য কলকাতায় চলে আসি। বাবারও কলকাতা হাই কোর্টে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে পোস্টিং হয়। আমরা থাকতাম জোড়া গির্জার কাছে এন্টালিতে। মাস্টার ডিগ্রি পাশ করার পর ইউজিসির স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত হই। ঠিক তখনই জোড়া গির্জার কাছে একটা প্ল্যাকার্ড দেখি : বরুণ সেনগুপ্তর নেতৃত্বে নতুন কাগজ বেরোচ্ছে। এটা

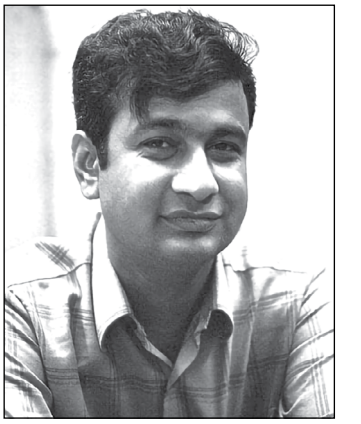

দেখে বাবা আমাকে বলেন, বরুণ সেনগুপ্ত কাগজের জন্য লোক নিচ্ছেন। একবার গিয়ে দেখ না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার কথায় সাদা কাগজে দরখাস্ত করি। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয় ও এরপর আমাদের ইন্টারভিউতে ডাকা হয় জোড়া গির্জার বিপরীতে বর্তমান পত্রিকার অফিসে। বোর্ডে ছিলেন বরুণ সেনগুপ্ত, সমর বসু ও আরো অনেকে। বরুণ সেনগুপ্ত আমাকে বলেন, আরবি, ফার্সি ও উর্দু পড়তে ও লিখতে পারো তো? আমি হ্যাঁ বলি। এরপর আর কিছু প্রশ্ন করেননি। কাগজ বেরোনোর কথা ছিল ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর জন্য দিন পিছিয়ে যায়। ইন্টারভিউয়ে নাম ওঠার পর আমাদের এক থেকে দুই মাসের ট্রেনিং হয়। সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের ট্রেনিং দিতেন সরকারি আমলারাও। বরুণ সেনগুপ্ত ঘরে ঢুকতেই আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্যার সম্বোধন করায় উনি রেগে গিয়ে বলেন, তোমরা কি গোমস্তা যে আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছ? আমাকে স্যার নয়, দাদা বা নাম ধরে বাবু বলে ডাকতে পার। তারপর থেকে বরুণ সেনগুপ্ত আমাদের সবার কাছে বরুণদা হয়ে ওঠেন। বরুণদা সেভাবে কোনোদিন হাতে কলমে ট্রেনিং

দেননি। আমাদের পুরোনো দিনের গল্প বলতেন। তাঁর জীবনের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার কথা শোনাতেন। বরুণদা তিনটে কথা বলতেন। প্রথমত, সেই কাগজ জনপ্রিয় যে কাগজ মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে যায়। দ্বিতীয়ত, সেই সাংবাদিক সফল বা বড় যার লেখা পড়ে সবাই বুঝতে পারেন। বরুণদা লেখার ক্ষেত্রে জটিল বাক্য বা দুর্বোধ্য শব্দ পছন্দ করতেন না। খবর লেখার ক্ষেত্রে সাংবাদিকের নিরপেক্ষ থাকার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, খবরের ক্ষেত্রে রিপোর্টার হবে থার্ড পার্সন।তৃতীয়ত, বরুণদা সাংবাদিকদের কেউকেটাভাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত ছিল, সাংবাদিকের জীবন হবে সহজ ও সরল। নেতাদের তোষামোদ করা পছন্দ করতেন না।

প্রখর ব্যক্তিত্বের বরুণদাকে বাইরে থেকে খুব গম্ভীর ও রাশভারী মনে হলেও তিনি ছিলেন মিশুকে আর খোলামেলা। বরুণদা অফিসে ঢুকেই লুঙ্গি ও শার্ট পরে নিতেন। সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। কাগজ নিয়ে ভাবতেন। তাঁকে দেখতাম কাগজ পড়তে, টেলিফোনে নেতা, মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে। রোজ বিকেল ৪টে ও রাত ৯টায় আমাদের সঙ্গে মিটিং করতেন। এরমধ্যেই রোজ সন্ধ্যাবেলায় সবার সঙ্গে মুড়ি তেলেভাজা খেতেন। রোজ রাত ৯টায় নিজে কাগজের প্রথম পাতার ডামি করতেন (তখন বর্তমান ট্রেনে করে বাইরে পাঠানো হত, তাই আগে কাগজের কাজ শেষ করতে হত)। আর ডামি করার সময় সবার মতামত নিতেন। বরুণদা সাধারণভাবে রাজনীতির খবর প্রথম পাতার লিড খবর করতেন। বড় ইনসিডেন্ট থাকলে সেটাই লিড করতেন। তবে ইনসিডেন্ট হার্ড কপির সঙ্গে সফট কপি করতে বলতেন। যেখানে থাকবে দুর্ঘটনার কারণ। প্রথম পাতার অ্যাঙ্করে পছন্দ করতেন হিউম্যান স্টোরি।

আমি ডেস্কের দায়িত্ব সামলাতাম। ট্রেনি থেকে প্রমোশন পেয়ে ডেপুটি নিউজ এডিটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর পর্যন্ত হই। বরুণদা আমাকে খুব বিশ্বাস ও স্নেহ করতেন। মাঝে মাঝে প্রশ্রয়ও দিতেন। একটা ঘটনার কথা বলি। সেদিন আমি নাইট এডিটরের দায়িত্বে। আমার দায়িত্ব প্রথম পাতা করার। আমার সঙ্গে ছিলেন রিপোর্টার মুশারফ হোসেন, শুভময়। পাতার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়। তখন মোশারফ জানায়, রফিক একটা খবর আছে বৌবাজারে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘটনাস্থলে যেতে বলি, তার সঙ্গে এক পরিচিত ছেলেকে ফটোগ্রাফার হিসাবে পাঠাই। মুশারফের কাছ থেকে প্রাথমিক খবর পেয়ে বউবাজার নিয়ে একটা ছোট খবর করি। কাগজের প্রায় ৩০ হাজার কপি ছাপা হয়ে যায়। তখনই বৌবাজার থেকে ফোনে মুশারফ জানায়, বড় বিস্ফোরণ হয়েছে, অনেকে মারা গেছে। তখন কাগজ ছাপা বন্ধ রেখে বড় খবর করে ফের প্রথম পাতা তৈরি করে কাগজ ছাপার নির্দেশ দিই। সেদিন বরুণদা কলকাতার বাইরে থাকায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। পরেরদিন ভোরে তাঁর ফোন পাই ও পুরো ঘটনা তাঁকে জানালে তিনি বলেন, তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। কাগজের খরচের চেয়ে তাঁর কাছে খবর বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর একটা ঘটনা। একবার বর্তমান পত্রিকায় মেয়েদের প্যান্টি ও ব্রেসিয়ারের খোলামেলা বিজ্ঞাপন আসে। বরুণদা ছবি নিউজ ডেস্কে এনে আমাদের সবার কাছে জানতে চান, এটা রাখা ঠিক হবে কিনা। টাকার ব্যাপার থাকায় সবাই চুপ করে থাকেন কিন্তু আমি প্রতিবাদ করে বলি, বরুণদা এই বিজ্ঞাপনটা আমাদের কাগজে ছাপা ঠিক হবে না। কারণ আপনি বলেন বর্তমান ঘরোয়া কাগজ। ঘরের মেয়েরা এই বিজ্ঞাপন ভালোভাবে নেবেন না। কথাটা শুনে সেদিন বরুণদা বলেন, রফিক ইউ আর রাইট।

বরুণদা কাউকে বকাবকি করতেন না। সবাইকে আপন করে নিতেন। সবাইকে বর্তমান পরিবারের সদস্য ভাবতেন। তিনি কখনো মালিক হিসাবে নিজেকে জাহির করতেন না।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কলকাতার পরিস্থিতি অশান্ত হয়। তার প্রভাব পড়ে আমাদের এন্টালি এলাকায়। সবার সামনে অফিসে একদিন বরুণদা বলেন, রফিক তোমার শরীর ও মন ভালো আছে? বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হলে বর্তমান অফিসে থাকতে পারো। আমি তোমার গার্জেন।

আর একটা কথা। বরুণদা আমাকে একইসঙ্গে রিসার্চ করার ও বর্তমান পত্রিকায় চাকরি করার সুযোগ দেন। বরুণদা খুব গর্বের সঙ্গে বলতেন, আমাদের অফিসে ২ জন পিএইচডি। একজন রফিক ও অন্যজন রথীন। আরো বলতেন, আমাদের অফিসে চার জন মুসলিম কাজ করেন (রফিক, মুশারফ, সফিউন্নিসা ও ইকবাল দিরগাই)। আমাদের মুসলিম পাঠকদের মন জয় করতে হবে। তিনি চাইতেন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলিমরা এগিয়ে আসুক। বরুণদার মতো অসাম্প্রদায়িক সম্পাদক ও কর্ণধার খুব কম দেখেছি।

তবে বরুণদা সাহিত্য ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করতেন না। আমরা চেয়েছিলাম বর্তমান- এর একটা লেখক গোষ্ঠী তৈরি করতে কিন্তু বরুণদা রাজি হননি। তিনি কাল্পনিক বিষয় নয় রিয়েলিটিকে বিশ্বাস করতেন। বরুণদার দৃষ্টি ছিল সব জায়গায়। বর্তমানের বেশ কিছু সাংবাদিক আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি পাওয়ার পর ডেস্কে আমিও চাকরির অফার পাই। সকালে গিয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে অফিসে ঢুকতেই বরুণদা বলেন, কোথায় গিয়েছিলে? আনন্দবাজার-এ চাকরির জন্য। ওখানে তুমি টিকতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আর যাইনি।

সম্পাদক ও কর্ণধার হিসাবে বরুণদার সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ তাঁর দূরদৃষ্টি ও পাঠকের পালস বোঝার ক্ষমতা। তার সঙ্গে ছিল তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি। বরুণদা চেয়েছিলেন বর্তমানকে সাধারণ মানুষের কাগজ করতে। এলিটদের কাগজ করতে নয়। তাই গোড়া থেকে শহরের পাশাপাশি জেলার গ্রামের লোকের সুখ, দুঃখের খবরকে গুরুত্ব দেন। আলাদাভাবে মেয়েদের জন্য, হেলথের জন্য ম্যাগাজিন করেন। বরুণদা সবসময় সাংবাদিকদের বলতেন, পাড়ার চায়ের দোকানদার, রিক্সাওয়ালার মতো নিচু তোলার লোকের সঙ্গে মিশতে। যাতে হাঁড়ির খবর জানা যায়।

বাংলায় জ্ঞানী ও গুণী অনেক সাংবাদিক এসেছেন কিন্তু বরুণ সেনগুপ্ত ছিলেন বাংলা সাংবাদিকতার উত্তমকুমার। সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংবাদিক। তিনি প্রথম রাজনীতির খবরকে বাঙালির ঘরের হেঁসেলে পৌঁছে দেন।

কলকাতা দূরদর্শন ৫০

বাংলা

কলকাতা দূরদর্শনের নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখা দরকার

কলকাতা দূরদর্শন এবছর ৫০-এ পা দিল। ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট যাত্রা শুরু হয়। জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন **পঙ্কজ সাহা**। প্রথমে প্রযোজক হিসাবে যোগ দিয়ে অধিকর্তা হয়ে কাজে অবসর নেন। কলকাতা দূরদর্শন ঘিরে তাঁর কিছু টুকরো স্মৃতির কথা শোনালেন। আলাপনে **সবুজ সেন**।

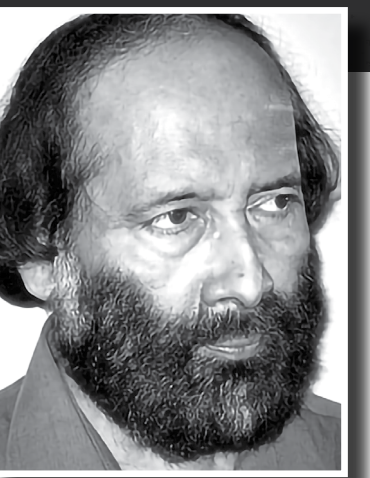

শুরুর সেই কথা

পৃথিবীতে টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরুর সময় আকাশবাণী কলকাতার 'বেতারজগৎ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "জগতে এমন একটি যন্ত্র এসে গিয়েছে, যাতে একইসঙ্গে কথা শোনা যায়, ছবিও দেখা যায়, তার নাম টেলিভিশন। কলকাতায় টেলিভিশন আসতে আর দেরি নেই, এখন থেকে তরকারি কুটতে কুটতে আঙুরবালার গান শোনা যাবে, আবার তাঁকে দেখাও যাবে।" কলকাতায় তখনও টিভি আসেনি। কলকাতার অনেক আগেই ঢাকায় টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সূচনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রথম বিদেশ ভ্রমণে ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে কলকাতায় এলেন। কলকাতা ময়দানে বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনা কভার করার জন্য বাংলাদেশ টিভির ওবি ভ্যান এল। আকাশবাণী থেকে ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে আমরা সেই ওবি ভ্যানের ভেতরে ঢুকে টিভির আশ্চর্য কর্মকাণ্ড প্রথম দেখার সুযোগ পাই। কলকাতায় তার বছর চারেক পরে যখন টিভি চালু হল, তখন স্টুডিয়ো প্রোডাকশন প্যানেল ইত্যাদির কাজ শেষ হয়নি। একটি ওবি ভ্যানকে সম্বল করে তার মাধ্যমেই অনুষ্ঠান রেকর্ডিং শুরু হয়। ৯ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে দু'ঘণ্টার সম্প্রচার আরম্ভ করে দেওয়া হয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এখানকার শিল্পীদের সঙ্গে ছিলেন শাহনাজ রহমতুল্লাহ, হামিদা আতিক প্রমুখ বাংলাদেশের শিল্পীরাও। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের তখনকার ডিরেক্টর জেনারেল জামিল চৌধুরী। রুমা গুহঠাকুরতার নেতৃত্বে ক্যালকাটা কয়্যারের শিল্পীরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। টিভির পর্দায় প্রথম ভেসে উঠেছিল কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম ঘোষিকা শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্তর মুখ। ঘোষণার প্রথম বাক্য ছিল- নমস্কার, কলকাতা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শুরু হল ব্যান্ড এক, চ্যানেল চারে। 'টেলিভিশন' বলা হয়েছিল, কারণ 'দূরদর্শন' নামটি এসেছে অনেক পরে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, রাজ্যের তথ্য দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। টালিগঞ্জের রাধা ফিল্ম স্টুডিয়ো অধিগ্রহণ করে টেলিভিশন সেন্টার তৈরি হয়।

টেলিভিশন ছিল আকাশবাণীরই একটি অঙ্গ। তাই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন আকাশবাণীর তখনকার ডিরেক্টর জেনারেল পি সি চট্টোপাধ্যায়। টেলিভিশন স্বতন্ত্র হওয়ার পর টিভির প্রথম ডিরেক্টর হন জেনারেল পি ভি কৃষ্ণমূর্তি।

নিয়োগের সময় বিপুল সাড়া পড়ে

টেলিভিশন প্রোডিউসার পদে নিয়োগের প্রথম বিজ্ঞাপন বেরোলে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। সাংবাদিক, সম্প্রচারক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্পী, চলচ্চিত্র ও নাট্যজগতের এত মানুষ চাকরির দরখাস্ত করেন যে, আকাশবাণী ভবনে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার স্থান সঙ্কুলান হয়নি, সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালের প্যারিস হল ভাড়া নিতে হয়। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে অধ্যাপক, প্রশিক্ষকরা আসেন। এখান থেকে পরিচালক মৃণাল সেন, তরুণ মজুমদার ছিলেন। চাকরিতে নিয়োগের কথা আমাদের টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে যোগ দিতে বলা হয় সরাসরি পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে। আমরা সেখানে টেলিভিশন ফ্যাকাল্টির প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী হিসেবে যোগ দিই। সত্যজিৎ রায় টিভি ফ্যাকাল্টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তখন ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পরিচালন সমিতির সভায় যোগ দিতে এসে মৃণাল সেন ছিলেন, আর ঋত্বিক ঘটক ওখানেই তাঁর অধ্যাপনা জীবন শেষ করেন। কলকাতায় ফিরে আমরা পরম উৎসাহে ওবি ভ্যানের মাধ্যমেই অনুষ্ঠান রেকর্ডিং শুরু করে দিই।

সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠান

আমার উদ্যোগে কলকাতা দূরদর্শনে নানা ধরনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। কলকাতার দর্শকদের কথা ভেবে আমি 'সাহিত্য সংস্কৃতি' নামে একটি অনুষ্ঠান শুরু করার প্রস্তাব দিই। লক্ষ্য ছিল, সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বদের অডিও ভিস্যুয়ালি ধরে রাখা। এই অনুষ্ঠান নিয়মিত সংযোজনা করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। শিল্পজগৎ থেকে এসেছেন এম এফ হুসেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, পরিতোষ সেন, রামকিঙ্কর বেইজ।

সত্যজিৎ রায়ের প্রশংসা ও অনুতাপ

শঙ্খ ঘোষের স্ক্রিপ্ট অবলম্বনে একটি অনুষ্ঠান দেখে প্রশংসা করে এক বার সত্যজিৎ রায় বলেন, 'কিন্তু তোমাদের ক্যামেরা এত কাঁপে কেন'! আমাদের ক্যামেরার স্ট্যান্ড নেই জেনে তিনি বলেছিলেন, 'তবে তো হয়েই গেল'!

কবি শঙ্খ ঘোষের অবদান

কবি অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ আমাদের অসামান্য সব স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আমাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় থেকে, সারা রাত ধরে এডিটিং-এ বসে, অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর চলচ্চিত্রবোধ কত গভীর, তা জানার সুযোগ হয়েছে আমাদের। শঙ্খদার স্ক্রিপ্ট অবলম্বনে 'জন্মদিন মৃত্যুদিন', 'জন্মদিনের ধারা', 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে পৃথিবীর প্রথম তথ্যচিত্র 'রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে'-র মতো নির্মাণে তাঁর কাছে শিখেছি- কেমনভাবে গভীর বিষয়কে কেন্দ্র করে নান্দনিক অনুষ্ঠান করতে হয়।

দর্শকের কথা ভেবে দর্শকের দরবারে

প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল দর্শকদের। প্রথম থেকে টানা ১০ বছর আমি 'দর্শকের দরবারে' অনুষ্ঠানে দর্শকদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেছি। দর্শকদের প্রতিটি প্রস্তাব ও অনুরোধকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতাম আর বর্ষপূর্তিতে তালিকা প্রকাশ করতাম, দর্শকদের কোন কোন অনুরোধ বা প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পেরেছি। তাই দর্শকরাও মনে করতেন এটা তাঁদের নিজস্ব মাধ্যম। সাদা-কালো টেলিভিশনের যুগে ৯ আগস্ট আমাদের সূচনার দিনটিতে দর্শকরা ফুল, কেক নিয়ে আসতেন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। প্রথম বর্ষপূর্তিতে আমাদের ট্রান্সমিশনে সংবাদ ছাড়া শুধু বিশেষ 'দর্শকের দরবারে' অনুষ্ঠানই ছিল দর্শকদের অংশগ্রহণের মাধ্যম। 'কলকাতায় টেলিভিশন' বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দর্শকদের মনোনয়ন করা হয়েছিল। সেই রচনাগুলো বিচার করেছিলেন বাইরের অধ্যাপক আর সাংবাদিকরা। পত্রলিখিয়ে, সেরা প্রস্তাবকদের পুরস্কার দেওয়া হয়। লাইভ অনুষ্ঠানে দর্শক সমাবেশের ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা কাজ করতে গিয়ে যে সব ভুল করি, তা নিয়ে নিজেদের নিয়ে ব্যঙ্গ করেও একটি অনুষ্ঠান করেছিলাম।

বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে নববর্ষের বৈঠক

বাঙালিয়ানা বজায় রাখতে বাংলা নববর্ষের দিন চালু করি 'নববর্ষের বৈঠক'। এই অনুষ্ঠান নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল। মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি নববর্ষকে একটা ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হিসাবে তুলে ধরা। এক এক বছর এক একটি বিষয়কে রাখা হয় এই অনুষ্ঠানে। যেমন, বাঙালির বিজ্ঞানচর্চা, বাঙালির চলচ্চিত্র সৃষ্টি, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ। অনুষ্ঠানের ফরম্যাটেও বাছা হয় বাঙালির প্রিয় আড্ডার ধরন। এই আড্ডা হয় কখনো ট্রেনের মধ্যে যেতে যেতে , কখনো জলপথে নৌকায় যেতে যেতে। দর্শ কিরা সাদরে গ্রহণ করেন। প্রতিটি বৈঠকে হাজির দুই বাংলার বিশি ষ্টরা। গান-কথা ও আলাপনে জমে উঠত নববর্ষের বৈঠক। দুর্গাপুজোর চার দিনে ওই নববর্ষের বৈঠকের ধরন ও মেজাজে অনুষ্ঠান চালু হয়। পরে অন্য চ্যানেল তা অনুসরণ করে। দূরদর্শন এখানকার প্রথম টিভি চ্যানেল। ফলে কলকাতার টেলি-সংস্কৃতির জন্ম হয় কলকাতা দূরদর্শনের মাধ্যমে।

জ্যোতি বসুর সাক্ষাৎকার

মনে পড়ছে, রাজ্যের নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতায় এসেছে। জ্যোতি বসুকে কোথাও পাচ্ছি না, জ্যোতিবাবুর বন্ধু স্নেহাংশু

আচার্য আমাকে বললেন, তুই ওর বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা কর, জ্যোতি ওর শ্যালিকার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে সেখানে দেখে জ্যোতিবাবু বিস্মিত। আর আমার জোড়হাত অনুরোধ, কাল আপনাকে প্রথম ইন্টারভিউটা টেলিভিশনকে দিতে হবে, কাল আর কোনও মাধ্যমকে আপনি দয়া করে ইন্টারভিউ দেবেন না! জ্যোতিবাবুর প্রতিক্রিয়া, সে কী! নাছোড়বান্দা আমার খুলে বলা, আপনি যদি আর কোনও মাধ্যমকে ইন্টারভিউ না দেন, তা হলে পরের দিন সবাইকে লিখতে হবে বা বলতে হবে যে, আপনি কলকাতা টেলিভিশনকে এসব কথা বলেছেন। আমরা নতুন, আমাদের কোনও জায়গা নেই, এই সূত্রে আমাদের একটু গুরুত্ব আসবে। জ্যোতিবাবু তাঁর সেই বিখ্যাত না-হাসি হেসেছিলেন, কিন্তু আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। পরের দিন সব মাধ্যমকেই 'টেলিভিশনে বলেছেন' বলে উল্লেখ করতে হয়েছিল। ওইটুকুতেই আমাদের যে কত আনন্দ! আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রণব মুখার্জির সাক্ষাৎকার পর্বও।

দূরদর্শনের সামাজিক দায়িত্ব

অনেক সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল দূরদর্শন। ১৯৭৮ সালের বন্যায় সারা পশ্চিমবঙ্গের বন্যাদুর্গত মানুষের কথা এক মাস ধরে তুলে ধরেছিলাম। কোথাও বুক জল কিংবা গলাজল সরিয়ে, কোথাও বা মৃত গরু এমনকী মানুষের মৃতদেহ ঠেলে বন্যাদুর্গত মানুষদের কাছে আমাকে পৌঁছোতে হয়েছিল। হিংলো বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। আমরা সেই অঞ্চলে ঢুকে ছবিতে দেখিয়েছিলাম, গাছের মাথায় শাড়ি কিংবা ধুতি আটকে আছে। বন্যার জল উঠেছিল অত উঁচুতে। সেই সব নারী-পুরুষ ভেসে চলে গিয়েছেন, তাঁদের পোশাক আটকে থেকে গিয়েছে। বাঁধ খুলে না রেখে কর্মীরা পিকনিক করতে যাওয়ায় এই দুর্দশা। অনুষ্ঠান প্রচারের পর হিংলো বাঁধ প্রকল্পের চেয়ারম্যানের চাকরি যায়।

স্মরণীয় অনেক অনুষ্ঠানের কথা আজো ভুলতে পারি না

(স্মৃতিচারণা)

কলকাতা দূরদর্শনের লোক নেওয়ার প্রথম বিজ্ঞাপন বেরোলে আমি দুটি পদের জন্য আবেদন করি- ঘোষক ও প্রযোজক। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে আমাদের বাছাই করা হয়। প্রযোজনার কাজ দিয়ে আমার কেরিয়ার শুরু হয়। বেশ কিছুদিন চলার পর অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য লোকের দরকার হয়, তখন ফের অডিশনের মাধ্যমে ঘোষক পদে আসি। কলকাতা দূরদর্শনের প্রথম ঘোষিকা আমি। কলকাতা দূরদর্শন চালু হওয়ার দিন ঘোষণার আমার মুখে প্রথম কথা ছিল- নমস্কার, কলকাতা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান শুরু হল ব্যান্ড এক, চ্যানেল চারে। টেলিভিশন বলা হয়েছিল কারণ দূরদর্শন নামটা অনেক পরে আসে। কলকাতা দূরদর্শনের অনেক অনুষ্ঠানের কথা এখনো ভুলতে পারি না। তার মধ্যে আমার প্রযোজনায় হয়- 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান' নিয়ে একটা সিরিজ। নানা পর্বে সেখানে অংশ নেন সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, সুবিনয় রায়ের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের তারকারা। তাঁরা আলোচনা করেন মূল গান ও রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে। অনেকদিন ধরে 'দর্শকের দরবারে' প্রযোজনা করেছি। 'নববর্ষের বৈঠক'কেও নানা অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছি। তারমধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয় মেট্রোরেল, কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন ট্রেনে যাত্রা, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ। পঙ্কজ সাহার সঞ্চালনায় একাধিক অনুষ্ঠানের প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। এছাড়াও 'পরম্পর' নামে একটা অনুষ্ঠান করি, যা খুব জনপ্রিয় হয়। ওইসব সোনালি দিনের কথা ভুলতে পারি না। কিন্তু আক্ষেপ, সংরক্ষণের অভাবে ওইসব অনুষ্ঠান আর দেখার সুযোগ নেই। আমরা সারাজীবন সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নিইনি। টেকনিক্যাল ফরম্যাট বারবার বদলেছে কিন্তু পুরোনো সব ফরম্যাট বা যন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা আমাদের দেশে হয়নি।

দরকার ছিল সংরক্ষণের

সংবাদপত্রের সুবিধে হল, প্রতিদিনের কাগজ ফাইলে থেকে যায়। কিন্তু আমরা সারা জীবন যেন হাওয়ায় ছবি এঁকেছি, হাওয়ায় কথা বলেছি। কিছুই থাকেনি। ৫০ বছরের সব কিছু যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। সংরক্ষণের ভাবনা প্রথম থেকেই ছিল না। টেকনিক্যাল ফরম্যাট অনবরত বদলেছে ও পুরোনো ফরম্যাটগুলো বাঁচিয়ে রাখার কোনও চেষ্টা আমাদের দেশে হয়নি। কিন্তু আমি সুইডিশ টেলিভিশনের স্টুডিয়োয় দেখেছি লো ব্যান্ড, হাই ব্যান্ড থেকে শুরু করে সব ফরম্যাটকে তারা সজীব রেখেছে আর প্রয়োজন মতো পুরোনো ফরম্যাটের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থাও রয়েছে।

কলকাতা দূরদর্শন বনাম বেসরকারি চ্যানেল

একটা জনপ্রিয় ধারণা, বেসরকারি চ্যানেলের প্রভাব ও দাপুটের সামনে দূরদর্শন দাঁড়াতে পারল না। আমি বিশ্বাস করি দূরদর্শনের কর্মীদের প্রতিভার ও কাজের উদ্যোগের কোনো অভাব নেই। এখানে পরিকাঠামোরও অভাব নেই। কিন্তু ভুললে চলবে না দূরদর্শন একটা চ্যানেল নয়। একটা প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি চ্যানেলের লক্ষ্য বিনোদন আর কলকাতা দূরদর্শনের লক্ষ্য দর্শক-শ্রোতাকে সচেতন, শিক্ষিত করা তথা সমাজিক দায়িত্ব পালন করা। দুরদর্শনের মোটো- 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ'। বাংলায় আক্ষরিক অর্থ হল- আরো বেশি মানুষের উপকারের জন্য ও আরো বেশি সংখ্যক মানুষের সুখের জন্য। তবে খবরের ক্ষেত্রে দূরদর্শনকে আরো স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি আশাবাদী। দূরদর্শন এখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারে, দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব। গত ৫০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনে কলকাতা দূরদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়ের ও জীবনের ইতিহাস দূরদর্শনকে বাদ দিয়ে লেখা সম্ভব নয়।

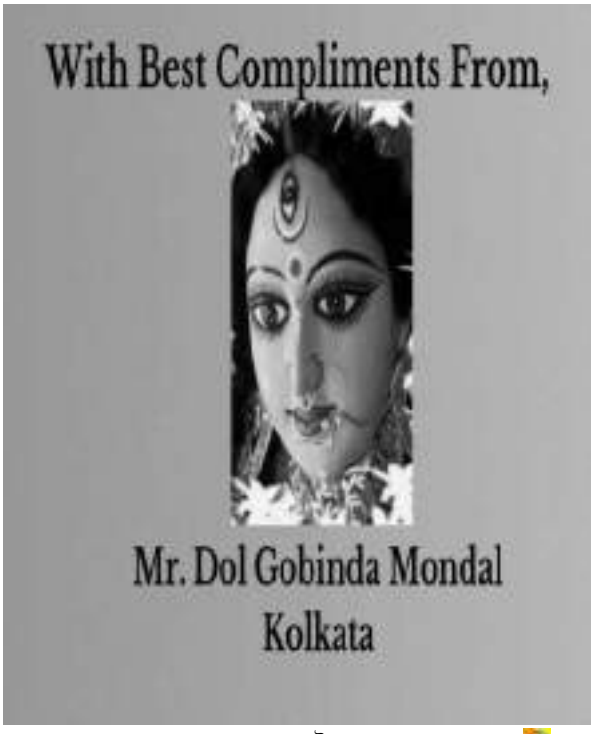

ইদানিং কেউ আর বই পড়ে না বলে গেল গেল রব উঠেছে। অথচ প্রকাশকদের দেওয়া হিসাবে দেখা যাচ্ছে বইয়ের বিক্রি বাড়ছে। একথা ঠিক, ছাপানো বইয়ের পাশাপাশি ই-বইয়ের চাহিদা বাড়ছে। এই বিষয়ে এই সময়ের লেখকরা কী বলছেন শোনা যাক।

কেউ কারোর বিকল্প হতে পারে না

বিনোদ ঘোষাল, সাহিত্যিক

রসগোল্লা কি সন্দেশের বিকল্প? বরং একটা মিষ্টির দোকানে নানা রকমের মিষ্টি থাকলে তার কাটতি বেশি হয়। নানা ধরনের খরিদ্দার আসেন। সেরকমই বইয়ের বাজারে ই - ভার্সন নামে এক নতুন মাধ্যম এসেছে। কিন্তু সেটা কোনোভাবেই ছাপানো বইয়ের বিকল্প নয়। দুটো বিষয় দু'ভাবে বাজারে আসে। ই -ভার্সনের অনেক সুবিধা। ভারী বই কোথাও নিয়ে যেতে সমস্যা হয়, সব সময় পড়া যায় না। সেক্ষেত্রে ই-ভার্সন ইচ্ছেমতো পড়া যায়। ই-বুক লেখকদের আয় বাড়ায়। খরচ কম বলে ই-বুক লেখকদের রয়েলটি বেশি দেওয়া হয়। তবে, আমি মনে করি কেউ কারোর বিকল্প হতে পারে না। আসল ক্ষতি করে অবৈধ পিডিএফ ভার্সন।

ক্ষতি ডেকে আনছে পিডিএফ ভার্সন

উল্লাস মল্লিক, সাহিত্যিক

আমরা এখনো ছাপানো বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের পরের প্রজন্ম সোশাল মিডিয়ায় আসক্ত বলে, তাদের ই-ভার্সনে আগ্রহ বেশি। বই কিনতে গিয়ে তারা পিডিএফ ভার্সন খোঁজেন। কিন্তু পিডিএফ লেখকদের ক্ষতি ডেকে আনছে। এখানে অনেক তথ্যের ভুল থাকে। তার একটাই কারণ, ঠিকঠাক প্রুফ রিডিং ও সম্পাদনা হয় না।

আশঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই

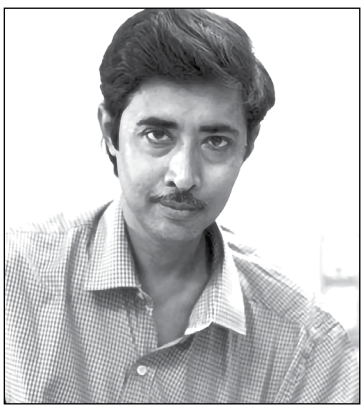

হিমাদ্রীকিশোর দাশগুপ্ত, সাহিত্যিক

কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের গত তিন বছরের বইমেলার শেষ দিনের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর বইয়ের বিক্রি বাড়ছে। ফলে, বই বিক্রি হচ্ছে না বা ছাপানো বইয়ের বিকল্প ই-বুক এমন ভাবার এখনই কোনো কারণ নেই। বই ছাপানোর সঙ্গে শুধুমাত্র লেখক ও প্রকাশক নয়, অনেক কর্মী জড়িত। সকলের এটা রুটিরুজি। হয়তো এক শ্রেণির মধ্যে ই-ভার্সন বইয়ের প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যাঁরা সিরিয়াস পাঠক তাঁরা বই পড়বেনই।

পাঠকের কল্পনা শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের জীবনযাপন আর সংস্কৃতি পুরোটাই হাতের স্মার্টফোনে বন্দি। আমরা কী খাব, কী বই পড়ব, কেমন ধরনের পোশাক পরব সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে সোশাল মিডিয়া। আমি বোকা বলে আমার নিজস্ব কোনো স্মার্টফোন

বিমল কুণ্ডু, ভাস্কর

নেই। আগে সুধীর মৈত্রর অলংকরণ দেখে গল্প উপন্যাস পড়তে চাইতাম। তিনি ছিলেন সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। আমরা প্রসাদ, উল্টোরথ, আনন্দলোক দেখে নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত জীবন ও ছবি দেখতাম। আর এখন নায়িকাদের ছবি ও খবর দেখে কমেন্ট করলে তাঁরাও জবাব দিচ্ছেন। ফলে, নতুন প্রজন্ম ছাপানো বই ছেড়ে ই-বুক এ আসক্ত হবে এ আর নতুন কথা কী! সমস্যা হল, তাদের কল্পনা শক্তি কমে যাচ্ছে। তবে ই- বুক কখনো ছাপানো বইয়ের বিকল্প হবে না।

S. K. Samanta & Co. (P) Ltd.
(An ISO 9001:2015 Company)
An Infrastructural Engineering Company
Corporate Office:
2/3, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020
Phone: +91 33 6637 4090, 2454 4090, Fax: +91 33 2454 4094
E-mail: kol@sksl.in

Specialists in Turnkey Construction of:

- Material Handling Plants
- Heavy Industrial Workshop Complexes
- Earthwork by Heavy Machineries
- Booster Pumping Stations
- Electrical Sub-stations
- Cross Country Water Conveying Systems
- Water & Waste Treatment Plants
- Roads, Bridges & Dams

Serving the Nation for last 75 years

SKSL

We Practice Innovative Technology & Quality
For Achieving Total Customer Satisfaction

টিভিতে নাচের রিয়েলিটি শো কি বন্ধ হওয়া উচিত

জি বাংলার জনপ্রিয় নাচের রিয়েলিটি শো ড্যান্স বাংলা ড্যান্স। গত কয়েক বছরে এই অনুষ্ঠান থেকে অনেক নতুন প্রতিভা উঠে এসেছে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের নাচ নিয়ে ফের বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অনেকের মতে, এখানকার ফিউশন নাচ নাকি বাংলা সংস্কৃতির পরিপন্থী। এ বিষয়ে নৃত্যশিল্পীদের মতামত তুলে ধরা হল।

বিচারকের আসনে গ্ল্যামার মুখের পাশাপাশি থাকুক নৃত্যগুরুরা

আমি কোনোভাবে রিয়েলিটি শোয়ের বিপক্ষে নই। এ ধরনের শোয়ের মাধ্যমে অনেক লোকের কাজের সুযোগ হয়। লাখলাখ দর্শক দেখেন। গ্রামবাংলার অনেক নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে। যাঁরা কোনোদিন বড়ো ধরনের অনুষ্ঠানে সুযোগ পেতেন না, তাঁরা

কোহিনূর সেন বরাট, নৃত্যগুরু

রিয়েলিটি শোয়ে অংশ নিয়ে পরে বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানে সুযোগ পাচ্ছেন। আমি বিদেশে গিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি অনুষ্ঠানেও দেখেছি গানের রিয়েলিটি শোয়ের সফল প্রতিযোগীদের অনুষ্ঠান করতে। গর্বে বুক ভরে গেছে। গানের রিয়েলিটি শো নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। সেখানে সঠিক বিচারকরা সঠিকভাবে বিচার করেন। কিন্তু আমার নাচের রিয়েলিটি শো নিয়ে বলার আছে। এখানে সঠিক বিচার হয় না। মানছি নাচের লোকেদের হয়ত সেভাবে গ্ল্যামার নেই। তাঁদের দিয়ে টিআরপি হয় না। যেখানে রিয়েলিটি শো করতে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। সেখানে গ্ল্যামারাস নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে নৃত্যগুরুদের রাখা হোক। যাঁরা নাচের সঠিক ব্যাকরণ জানেন ও বোঝেন। তাঁদের হাতে প্রতিযোগীদের নাম্বারের ভার দেওয়া হোক। অভিনেত্রীদের দর্শকরা দেখবেন আর নৃত্যগুরুরা নাচের বিচারের কাজটা করবেন। এর জন্য থাকা দরকার একটা বোর্ড। সর্বভারতীয় নাচের রিয়েলিটি শোয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু বিচারকদের আসনে নৃত্যগুরুদের রাখা হয়।

এখনই নাচের রিয়েলিটি শো বন্ধ করা উচিত

গানের রিয়েলিটি শো নিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু বাংলার নাচের রিয়েলিটি শোয়ে নাচের নামে কী চলছে? এসব নাচ নাকি জিমন্যাস্টিক? নাচের একটা ব্যাকরণ থাকে কিন্তু রিয়েলিটি শোয়ে নাচের নাচে কী হচ্ছে? ছেলেখেলা চলছে। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের চন্ডালিকা নাচ নিয়ে যা হল তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নিয়ে এই ছেলেখেলা শুধু বাংলার নয় বিশ্বের কাছে আমাদের মুখ পুড়লো। নতুন প্রজন্ম কী শিখবে? নাচের নামে এসব প্রহসন বরদাস্ত করা যায় না। অবিলম্বে জি বাংলার 'ড্যান্স বাংলা ড্যান্স' রিয়েলিটি শো বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

অনিতা মল্লিক, নৃত্যগুরু

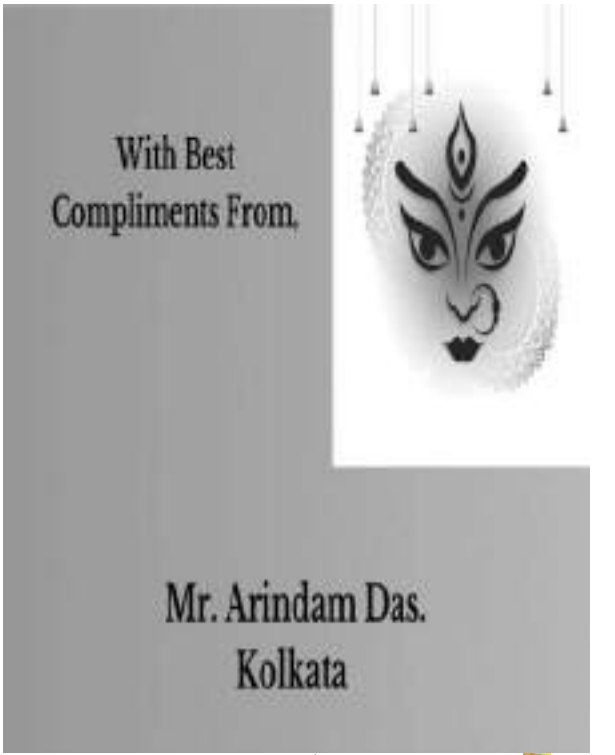

মুদ্রা রাক্ষস

রমাপদ পাহাড়ি

টাকা থাকলে করিনা কাপুরকে নিয়ে ডেটিংয়ে যেতে পারেন। সানি লিয়ন আপনার লোমে ভরা দাবনায় সুড়সুড়ি দিয়ে 'ইয়ে' জাগিয়ে তুলতে পারেন।

মুদ্রা নাকি খোক্ষসের বড়ভাই! সে নাকি সব গিলে খায়। আগুনের মতো সর্বভুক। গরিবকে গিলে ধনী করে আর ধনীকে গিলে নির্ধন করে। শিবরাম চক্রবর্তীর কোথায়, পৃথিবীটা কার গোলাম? পৃথিবী টাকার গোলাম। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই দুনিয়ায় যাঁরা বেঁচে আছি, টিকে আছি, প্রতিদিন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি টাকার গুরুত্ব ও মাহাত্ম। টাকা থাকলে রাধাও নাচে, তেমনি বাঘের দুধ দিয়ে চা তৈরি করে খাওয়া যায়। মার্কিন রাষ্ট্রপতির অতিথি হয়ে এক টেবিলে ডিনার সারতে পারেন। পানিয়ে চুমুক দিতে পারেন। করিনা কাপুরকে ডেটিংয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সানি লিয়ন আপনার দাবনায় সুড়সুড়ি দিয়ে 'ইয়ে' জাগিয়ে তুলতে পারেন।

টাকায় কী না হয়! টাকা টাকা দেবী চরাচর সারে। যাঁদের হাতে টাকা তাঁদের হাতে জগতের চাবিকাঠি। তাঁদের স্বার্থে দেশের আইনকানুন ও প্রশাসন।

আমেরিকার বিল গেটস, ফোর্ড, কার্নেগী থেকে এদেশে টাটা, বিড়লা, আম্বানি, গোয়েঙ্কা, আদানি পর্যন্ত আপনাকে সেলাম করবে। শুধু আঙুল ফুলে কলাগাছ হোতে পারলেই হল।

মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড। গোদা বাংলায়, দ্বিতীয় ঈশ্বর। বহুশ্রুত এই কথার অর্থ হল, ঈশ্বর গত হননি, তিনি টাকায় রূপান্তরিত। আবার অর্থহীনতার কারণেই সুকান্ত ভট্টাচার্য'র কথায় পৃথিবী গদ্যময় আর পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি।

প্রখ্যাত রুশ লেখক আন্তন চেখভের কথাটাকে রেফারেন্স টেনে বলা যায়, "ভদকার মতো অর্থ ও খ্যাপাটে অনেক কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে"। শেকসপিয়র থেকে কার্ল মার্কস, দু'জনে কাগজের টুকরোগুলোকে 'অর্থ' ধরে নিয়ে গোটা পৃথিবীতে সারগর্ভ সব আলোচনার জন্ম দেন। আতঙ্কও তৈরি করেছেন অনেকক্ষেত্রে। নির্দেশদাতার ভূমিকা নিয়েছেন। নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছেন। এক শ্রেণির লোককে এক করেন। আবার ভাগ করেছেন। সৃষ্টির পাশাপাশি ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিয়েছেন, আবার নানা বিষয় এই আলোচনার ফলে উন্মোচিতও হয়েছে।

কার্ল মার্কস প্রশ্ন তুলেছিলেন, অর্থের জাদুকরী ক্ষমতার উৎস কী? অর্থ কীভাবে অর্থ হয়ে ওঠে। কোন জাদুকরী বস্তুকে প্রকৃতঅর্থে অর্থ বলা হয়? অর্থ তো একজনকে অন্যজনের পশ্চাৎদেশেও চুম্বন করাতে পারে। এমনই অর্থ মহিমা।

এক একটা মুদ্রার গায়ে লেখা থাকে জয়, পরাজয়, লজ্জা, ঘৃণা, লাভ, হিংসা, সেইসঙ্গে গুপ্তভাবে থাকে ষড়যন্ত্রের কাহিনি। মুদ্রা যেমন সুখের মুহূর্তের সঙ্গী, তেমনি মুদ্রার জন্য অনেক যুদ্ধ

দেখেছে ইতিহাস।

দূরদেশে জন্মেও শেকসপিয়ার আমাদের ব্যাকরণে ঢুকে পড়েন। সেই ছেলেবেলায় এই প্রতিবেদকের মতো অনেকের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, অর্থই সব অনর্থের মূল। আর তারপর অর্থ কী এবং কেন, কীভাবে অনর্থ তৈরি করে, সেই ভাব সম্প্রসারণ করতে করতে প্যান্টের দড়ি আলগা হয়ে যায়। শেকসপিয়র তখনও লঘু গুরু মস্তিকে জমিয়ে রাজপাট করতে নামেননি, সেই আম কস বয়সে ভাব সম্প্রসারণের পরিবর্তে মাথায় চলে এসেছিল একটি ভাব সংকোচন। সূর্য ওঠা থেকে রাতে গুটলি পাকিয়ে এটুলির মতো বিছানায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত মা বাবার কথা কানে তিরিং বিড়িং করে ভেসে আসত, টাকা ছাড়া এক মুহূর্ত অচল। শুক্রাণু গিয়ে ডিম্বাণুকে যেই ভালোবেসে জড়িয়ে ধরল তলপেটে, অমনি শুরু হল জলের মতো টাকা খরচ। ডাক্তার দেখাও রে, থ্যালাসেমিয়ার মতো শারীরিক ত্রুটি থাকলে সংশোধন করো, ফলিক অ্যাসিড খাওরে, এটা ওটা ভালো-মন্দ খাও। সবশেষে চুল্লিতে জ্বলতে গিয়েও টাকাই কেবলম।

কয়েকশো বছর আগের কথা, তবুও সেই ওমর ডায়লগ না বলে পারছি না— "মানি ইজ দ্য ভিজিবল গর্ড"। হায়, এক ঈশ্বরকেই আমরা শুধু দেখতে পাই। তার নাম টাকা। মোদী যুগে এই অধম ও আরো একটি লাইন যুক্ত করতে চায়। সেটা হল, 'ব্যাঙ্ক ইজ দ্য গ্রেটেস্ট টেম্পল'। ঈশ্বরের স্বর্গে আমরা যেতে পারি না, কল্পনা করতে পারি মাত্র। কিন্তু টাকা নামের ঈশ্বরের বাস হচ্ছে ব্যাঙ্ক। সেখানে মোদীজীর কল্যাণে লাইন লাগাও লাগাও। ব্যাঙ্ক মন্দিরে যার যত বেশি আছে, সেই তত ঈশ্বরের কাছাকাছি যায়! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝি এই কারণে বলেছিলেন, ঈশ্বর থাকে ওই ভদ্র পল্লিতে !

টাকা না থাকলে জীবন কীভাবে কাটে? চিনা প্রবাদ অনুযায়ী, যে পুরুষের টাকা নেই সে পতিতার চেয়েও খারাপ দিন কাটায়। এরপর কেউ কেউ বলেন, টাকা হয়তো অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু সব কিছু করতে পারে না। টাকা ঘুমের ওষুধ জোগাতে পারে, ঘুম কিনতে পারে না। সুখের সব উপকরণ জোগাড় করে দিতে পারে কিন্তু সুখ সরবরাহ করতে পারে না। ভালোবাসাও নাকি সবসময় টাকার বিনিময়ে কেনা সম্ভব হয় না।

আপনি যদি এতটা পড়াশোনার পরও দার্শনিক সুলভ চক্ষু চিত্তির করে বলেন, টাকার সুখ মেলে না ভাই! তাহলে কোটি টাকার প্রশ্ন ছুঁড়ে মারতে হয়, সুখ আসলে কী মশাই? প্রশ্ন শুনে কেউ কেউ মূর্ছা যেতে পারেন। বুজগুড়ি কেটে কেউ বলতে পারেন, কেউ সুখ খোঁজে সাফল্য, কেউ লেটেস্ট মডেলের গাড়িতে, কেউ সুন্দরী নারীতে, কেউ চাটন দিয়ে, কেউ খ্যাটন খেয়ে, কেউ আড্ডায়, কেউ গানে, কেউ পাঠে, কেউ অতিভোজনে, কেউ চিত্তে, কেউ বিত্তে। সহজিয়াদের পাঞ্চটা অবশ্য এই রকম —চাহিদা যত কম, সুখ তত বেশি।

অর্থজ্ঞানীরা বলেছেন, এই সুখের অনেকটা নির্ভর করছে টাকা কামাইয়ের ওপর। ডাক্তাররা অবশ্য সাবধানবাণীর সাইনবোর্ড হাতে ধরিয়ে বলেছেন, নিজের সঙ্গে ওপরের তুলনা যত কম টানবেন, সুখের সঙ্গে শান্তিকে তত উপভোগ করতে পারবেন।

কবিরা বলেছেন, হায় সুখ সোনালী ডানার সুখ। এত কিছুর মাঝে সুখ কোথায়? সুখ আসলে ভাবনায়। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার সুখ, শীতের ভোরে শিশির ছোঁয়ার সুখ। কেউ সুখ পায় ভোগে, কেউ সুখ পায় ত্যাগে। সুখের মাপকাঠিতে মাপজোখ করতে বসে আবারো সেই হ্যাঁচকা টানে টাকারসাগরের নৌকা ভিড়াই। মনে মনে দার্শনিকের কথাটাকে মনে করি, সুখকে গিলে ফেলতে পারলেও মুদ্রা শুধু শান্তিটুকুকে গিলে ফেলতে পারে না!

যা: আবার সেই কলুর বলদের মতো টাকায় এসেই পাঁচন গেলা।

হবে না, এটাই যে মুদ্রা রাক্ষসের মুদ্রাদোষ! কবীর সুমন যখন তিনোমূল থেকে বিচ্ছিন্নমূলে ছিলেন, তখন চ্যানেল চ্যানেলে একটা ক্লিপিংস দেখানো হত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, 'শুধু খাই খাই খাই'। সত্যি, এত খেয়েও হজম হল না বটে দুঃশাসনের। সুমন যখন সুমন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, তখন গেয়েছিলেন, 'হজমি খেলে হজম হবে, তাই বলে কেউ হজমি খায়'।

তাই তো! "আমি তো এমনি এমনিই খাই"। মুদ্রা রাক্ষসের এও এক মহাদোষ।

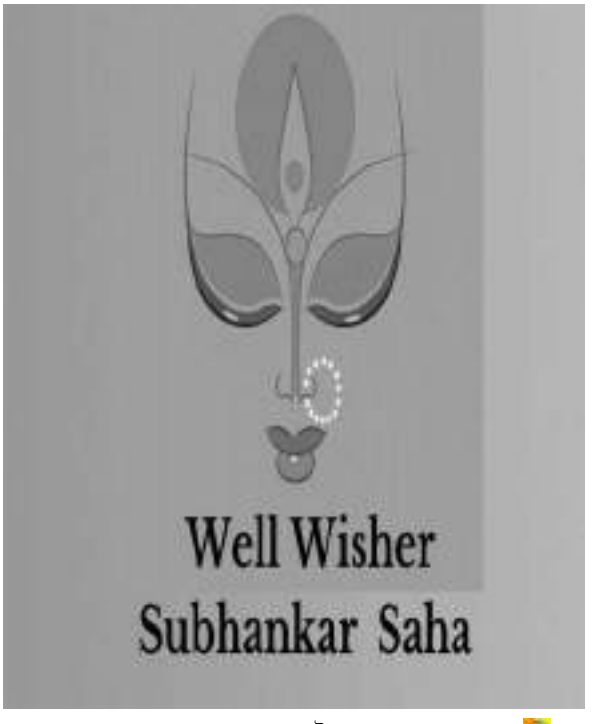

আগন্তুক

তনিমা সাহা

শর্মিষ্ঠা একজন সিঙ্গেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট মহিলা। শর্মিলা যে চাকরিটা করে তার জন্য মাঝে মাঝেই তার থাকার জায়গাটা পাল্টাতে হয়। আসলে প্রজেক্ট বেসিস কাজ। প্রজেক্ট শেষ হলেই অন্য শহরে চলে যায়। শর্মিলা পুরোনো হেরিটেজ বিল্ডিংগুলোর সংস্কারের কাজ করে। শর্মিলার মা অবশ্য তার এইধরনের কাজের ঘোর বিপক্ষে।

তিনি বলেন, ‘কী যে এক কাজ করিস কে জানে ! সারাবছর ভূতের মতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ভূতুড়ে বিল্ডিং পরিষ্কার করিস। এদিকে বাড়িতে তো একটা কিচ্ছুটি করিস না। একদিন এসে দেখবি আমিই মরে ভূত হয়ে গেছি। তখন বুঝবি।’

শর্মিলা মৃদু হেসে বলে, ‘আমি ইতিহাস খুঁজি মা। অতীতে ওরা মারা গিয়েছিল বলেই আমরা আজ বেঁচে আছি। যাদের জন্য আমরা আজকে এই জীবনটা দেখছি। তো তাদের স্মৃতিকে একটু যত্ন করবো না।’

মা রেগে গিয়ে বলেন, ‘যে বেঁচে আছে তার জন্য কোন চিন্তা নেই। যে মরে গেছে তার স্মৃতি রক্ষা করছেন।’

শর্মিলা শুধু মিটি মিটি হাসে।

আজ শর্মিলা নতুন একটা জায়গায় এসেছে। জায়গাটার নাম জুনাগড়। জুনাগড়ের একটা পাঁচশো বছরের পুরোনো আর্কিটেকচার বিল্ডিং আছে। এদিকে লোকসংখ্যা কম হওয়ায় বিল্ডিংটার রক্ষণাবেক্ষণ সেভাবে হয় না। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক ইমারতটির সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই টিমের সাথে শর্মিলাও এসে পৌঁছেছে জুনাগড়ে।

এখানে আসার আগে মা অবশ্য ফিরিস্তি গেয়েছেন, ‘এভাবে ভূতুড়ে ইমারতের বাঁদরের মতো ঝুলে ঝুলে কাজ করতে গিয়ে একদিন দেখবি একটা ভূতুড়ে বাঁদর তোর গলায় ঝুলবে। তখন বুঝবি যে কেন আমি সারাক্ষণ গজগজ করি।’

শর্মিলা হেসে বলে, ‘ও.. তার মানে তুমি স্বীকার করছ যে তুমি

গজগজ কর।'

কথাটা বলে মা'কে আরো রাগিয়ে দিয়ে শর্মিলা ফিচেল হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। বছর তিরিশের শর্মিলার এই গোটা পৃথিবীতে এক মা ছাড়া আর কেউ নেই। শর্মিলার জন্ম যখন হয়েছিল তখন তার মায়ের বয়স ছিল কুড়ি। মা'কে বিভিন্ন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে দেখে শর্মিলার বিয়ে, সংসার এইসবের ওপর থেকে বিশ্বাসটাই উঠে গেছে। তাই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কাজের মধ্যেই ডুবিয়ে রাখে সে। জুনাগড়ে পৌঁছে সাইট ভিজিট করে শর্মিলা টিমের সাথে একটা বাড়িতে আসে। এখানে কোন সরকারি বাংলো বা হোটেলের সুবিধা না থাকায় একটা পুরোনো বাড়িতেই শর্মিলাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বিজন হতাশ গলায় বলে, 'এর থেকে আর বেটার কিছু কি পাওয়া গেল না!'

বিজন শর্মিলার সমকক্ষ এবং বন্ধু স্থানীয়। বিজনের হতাশ মুখটা দেখে শর্মিলা বলে, 'আহাহা! বিজন ওই কথাটা শুনিস নি.. ডোন্ট জাজ এ বুক বাই ইটস কভার। এমনও তো পারে যে ভেতরে অন্যরকম কিছু এক্সপেরিয়েন্স করলি।'

বিজন মুখটা ব্যাজার করে বলে, 'তুই আর তোর থটস.. উফ্! মাঝে মাঝে মনে হয় অন্য গ্রহ থেকে এলিয়েন এসে মানুষের ভেক ধরে বসে আছে।'

শর্মিলা কিছু না বলে মিটিমিটি হেসে বাড়িটির ভেতরে ঢোকে। আর সত্যিই বাড়িটি ভেতর থেকে খুব সুন্দর। বাড়ির বাইরেটা দেখে ভেতরটা আন্দাজ করাই যায় না। রাতের খাবার খেয়ে সবাই যে যার মতো ঘরে ঢুকে যায়। আগামীকাল সব মেশিন এবং ইন্সট্রুমেন্ট আসবে। তখন কাজ শুরু হবে।

রাতে ঘুমিয়ে শর্মিলার কানে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আসে। সারাদিনের জার্নিতে ক্লান্তি থাকায় প্রথমে শর্মিলা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কিন্তু আওয়াজটা আবারও হয়। শর্মিলা আলোটা জ্বালিয়ে ঘরটা ভালো করে দেখে নেয়। কোথাও কিচ্ছু নেই। আলো নিভিয়ে তাই আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে।

দিন কয়েক পরে বিজন শর্মিলার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বেশ চিন্তিত গলায় বলে, 'এই শর্মি তোর কী হয়েছে বল তো! চোখমুখ কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের তলায় কালি পড়ে গেছে। শরীরটা কী তোর ভালো নেই?'

শর্মিলার গলায় ক্লান্তি ঝরে পড়ে। বলে, 'শরীরটা তো এমনিতেই ঠিক আছে। কিন্তু..।'

কিন্তু কী?

রাতে ঘুমোতে পারছি না রে।

ঘুমোতে পারছিস না! কিন্তু কেন?

আওয়াজ.. কীসের যেন একটা আওয়াজ হতে থাকে। যেন কেউ কিছু খাচ্ছে, কেউ যেন হেঁটে চলে বেরাচ্ছে। মাঝে মাঝে কী যেন কেউ টানতে থাকে। কিন্তু যতবার আলো জ্বালাই ততবার কাউকেই আর দেখতে পাই না। সারারাত.. জানিস সারাটা রাত এইসব আওয়াজ হয়। আমি ঘুমোতে পারি না। এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারি না।

ঠিক আছে। ভাবিস না। আজকে আমি তোর ঘরে শোবো।

রাত তখন বারোটা বাজে। শর্মিলা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজে বিজনের ঘুমটা ভেঙে যায়। কেউ যেন কিছু একটা খোলার চেষ্টা করছে। বিজন বুদ্ধি করে আলো জ্বালল না। কিছুক্ষণ অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে থেকে তারপর অন্ধকারেই শব্দটাকে অনুসরণ করে হেঁটে এগিয়ে গেল। খানিকটা এগোতেই বিজন অন্ধকারে একটা আবছা অবয়ব দেখতে পায়। সে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেই অবয়বটার ওপর জোড়ালো টর্চের আলো ফেলে জোরে বলে ওঠে, 'হ্যান্ডস আপ।'

প্রায় মাসখানেক পর জুনাগড় থেকে শর্মিলারা ফিরছে। ট্রেনে আসতে আসতে শর্মিলা ভাবতে থাকে যে সেদিন যদি বিজন তার ঘরে না ঘুমোতে আসতো তাহলে তো সে কখনও জানতেই পারত না যে প্রতিরাতে তার ঘরে একটা লোক ঢুকতো। পুরোনো কনস্ট্রাকশন হওয়ায় পেছনের দরজাটা ঢিলে ছিল। সেটা দিয়ে প্রতি রাতে লোকটা শর্মিলার ঘরে ঢুকতো, খাবার দাবার খেত। ঘুমোতো। তারপর ভোর ভোর বেরিয়ে যেত। লোকটার আসল উদ্দেশ্য যে কী ছিল সেটা অবশ্য বোঝা যায় নি। সত্যিই সে শর্মিলাকে কোন ক্ষতি করত কিনা; সেটাও সে জানে না।

শর্মিলা মনে মনে ভাবে, 'মায়ের কথাটাই শেষমেষ ঠিক হল। একটা ভূতুড়ে বাঁদর গলায় জড়িয়ে যাচ্ছিল প্রায়।'

কথাটা মনে আসতেই হেসে ওঠে শর্মিলা।

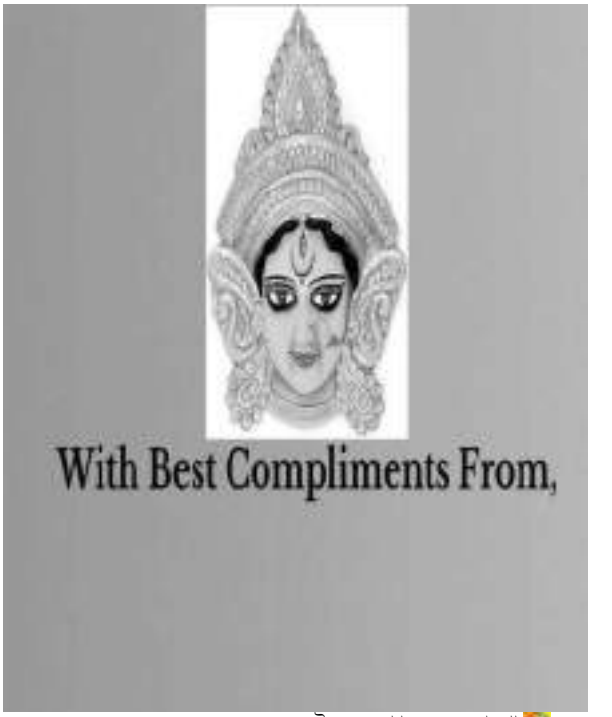

ভোর

সৌমিলি রায়

চমৎকার! দাদা বোনে যে বেশ ভালোই আসর জমিয়েছে ছোট বোনটির মাথা খাওয়ার জন্য। গর্জে ওঠে অন্নদা। হঠাৎই, চিৎকারে স্তব্ধ হয়ে যায় তিন ভাই বোন। গর্জন শুনে ঘর থেকে উঠানের দিকে ধাবিত হয় চাটুজ্যেমশাই অর্থাৎ পাড়ার সকলের প্রিয় সুধাম। অন্নদাকে বলে, কী হয়েছেটা কী? এত চেঁচামেচি কীসের ? বাড়িতে কী একটু শান্তিতে আজকাল ঘুমানোও যাবে না নাকি?

উহঃ! বলি নাকে তেল দিয়ে ঘুম ছাড়া আর কী পারো বলো দেখি তুমি?

মায়ের হঠাৎই এরকম স্বর পরিবর্তনে বড়ো ছেলে একটু মেজাজ নিয়েই বলে ওঠে- হ্যাঁ গো তোমার হয়েছেটা কী বলতো মা ! দিব্যি তো গেলে পুকুরে নাইতে, কোথা থেকে কী শুনে এলে বলতো?

হ্যাঁরে বাইরে তো এত ঘুরিস, তোরা কি কোনো খবরই রাখিসনে নাকি এই অপয়াটা জানলে কুরুক্ষেত্র হবে বলে বলিস নে? আমি তো ঘাসে মুখ দিয়ে চলিনে রে, কিছু জ্ঞান আমারও আছে, শুনতে আমিও পাইরে, তা তোদের বাবা তো দেখছি ভালোই চাপার হয়েছে! এরপর তো দেখব আমি মরলে সেই খবরটাও গিলে রয়ে যাবে, পাছে অশুচ পালার পাপটা করতে হয়।

বলি তোমার হয়েছেটা কী গিন্নি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

থিয়েটারে নাম লেখাতে পারো তো যা ভালো নাটক করতে লিখেছ! তাহলেও জানতাম কিছু কাজের কাজ হয়েছে, আমাদের আর ভোর ভোর উঠে এত খাটতে যেতে হত না স্বপরিবারে।

গাঁয়ে তো ঢি ঢি পড়ে গেছে। আর মোড়লমশাই সে নিমাইখুড়ো আর তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মনসাতলায় তোমাকে নীলার বিয়ে নিয়ে বলে গেছে, কই তুমি তো আমায় এই খবরের খোঁজ পর্যন্ত পেতে দাওনি! আর তোমার বড়ছেলে, সে তো বোনের পড়াশুনো ভালোই দেখে, এইটে কী দেখেও না, নাকি দেখার ভান করে আছে যে বোনটির সতেরো পেরোলো বলে। এইবেলা পার না করতে পারলে, সারাজীবন কি ও ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরবে? আমি বলে দিচ্ছি ঐসব পড়াশুনোর নিকুচি করেছে, নীলার বিয়ের বন্দোবস্ত না হলে এবার কিন্তু সত্যিই কুরুক্ষেত্র বাঁধবে। তোমরা পুরুষমানুষ, পাড়াপ্রতিবেশী বাণ ছুঁড়লে লাগবে কেবল এই বুড়ি-র গায়েই।

কথোপকথন শুনে মনে হবে এ আবার কোন জগতের কথা, সতেরো বছরেই বিয়ে! হ্যাঁ, হেথা এরকমই হয়। সুন্দরবনের ভেতরের প্রত্যন্ত এক গ্রামের সাধারণ জেলে পরিবারে আজও এরকম হয়, এই চাটুজ্যে পরিবার হল সেইরকমই এক পরিবার, তবে গ্রামের বেশ মান্যিগন্যি পরিবারগুলোর মধ্যে এটিও পরে। শুধু টাকাকড়ি, নাম-যশ দিয়ে তো আর সব হয় না, তাই বোধহয় গ্রামে এই পরিবারটির বেশ কদর আছে, এদের সদস্যদের ব্যবহার ও নিজেদের মধ্যে সু-সম্পর্কের জন্য, তথাকথিত উন্নত পরিবার বলেই নীলাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। একজন জেলের পরিবারের সদস্য হওয়ায় প্রত্যুষে উঠে পরিবারের সাথে মাছ ধরতে গেলেও বাড়ি এসে নিজের পড়াটা ঠিক করে নেয়; কারণ সে যে হতে চায় লেখিকা। আর যতোই মান্যিগন্যি পরিবার হোক না কেন, একটা মেয়ের শিক্ষা নিয়ে কথা হবে না সমাজে তা কী হয়? নইলে সমাজের হাওয়া পরিপূর্ণতা পাবে কীভাবে?

প্রথম চরণেই উক্ত নীলা ও নীলার দাদা তাদের বোনকে পড়ানোর বিষয়েই উৎসাহ দিচ্ছিল, সেই শুনেই অন্নদা আরও গর্জে ওঠে ও রাগে ফেটে পড়ে।

—বলি তোরা কী রে, একটাকে নিয়ে হচ্ছে না? আবার বোনটাকেও নিজেদের দলে টানছিস!

সেদিনের মতো সবাই শান্ত হয়ে যায়, বাড়িতে বেশ ঘন অন্ধকার মেঘ নেমে আসে। গ্রামের মোড়ল ও বাকির তাগাদা দিতেই থাকে বিয়ের। অন্নদা চায় তার মেয়ে লেখিকা হোক কিন্তু মন থেকে চাইলেও বাইরে থেকে সে বড়োই-কঠোর, সমাজ যে তার মনের মাপকাঠি। অবশেষে পরিকল্পনা হল যে নীলাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সম্পূর্ণ গোপনে, নীরবে হল পরিকল্পনা। এমনকী বাড়ির সবথেকে ছোট সদস্য খিড়িকেও কিছুর আঁচ পেতে দেওয়া হল না। সে বাচ্চা মেয়ে, পাছে কোথাও কিছু বলে দেয়। ভোরবেলায় একদিন দাদা নীলাকে নিয়ে রওনা দিল কলকাতার উদ্দেশ্যে। কলকাতায় সুধামের বেশ কিছুটা পরিচিতি ছিল মাছের রপ্তানি করতে গিয়ে। তাদের সাথেই সোগাযোগ করে নীলার জন্য একটি ভাড়া ঘরের ব্যবস্থা করা হল। ওটা নাকি ছিল মেয়েদেরই খালি থাকার জায়গা, পড়াশুনো করে এমন ছাত্রছাত্রীরা থাকে, তাদেরও নাকি দূরে দূরেই বাড়ি। বাড়ি ছেড়ে এতটা দূরে আসতে নীলার খারাপ লাগলেও সে বুঝদার মেয়ে, তাই মনকে বুঝিয়ে নিয়েছিল। সেদিন ভোরবেলায় তারা রওনা দিয়েছিল, সেদিনই সন্ধ্যে নাগাদ তারা এসে উপস্থিত হয় শ্যামবাজারে কাছে সেই জায়গায় যেখানে নীলার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলকাতার পা রাখার সাথে সাথেই রঙিন জগতের ছটায় জ্বলজ্বল করতে থাকে নীলার চোখ। এই বুঝি পা-পিছলাতে চলল বলে। সেদিন নীলাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েই দাদা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বাড়ির পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য। নীলার সাথে সেখানে থাকত আরও ছয়জন মেয়ে, কিছুদিন যাওয়ার পর বেশ ভালোই বন্ধুত্ব হয়ে যায় তাদের সাথে। কিছু সমবয়সি, কেউ বা ছোট বা হয়তো বড়ো, কলকাতার এক নামী ইউনিভার্সিটিতে বাংলা পড়ার সুযোগও পায় সে প্রবেশিকা দিয়ে। সব ভালোই চলছিল, তিনটে বছর কেটেও গেল। বাড়িতেও সে মাঝে গেছিল বহুবার দেখা করতে। গ্রামে বেশ হইচই পড়ে গিয়েছিল প্রথমে, তবে আস্তে আস্তে সেটিও থেমে যায়। নীলা ঠিক করে সে লেখিকা হওয়ার পরই প্রথম গল্প লিখবে তার নিজের জীবন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। কারণ এই লেখিকা হওয়ার জন্য খেটে পড়াশুনা করে চেষ্টা করা নিয়েই সামনে পেছনে অনেক কথা শুনেছে সে। অনেক ঝড় সামলেছে। সেই ঝড় সামলেছে তার পরিবারের সদস্যরাও। তাই সে চায় এটা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে। তবে আকাশ কী আর সবসময় সমান থাকে! গর্জে, বরসে সব কিছু ভাসিয়ে দিতে তো

শুধু টাকাকড়ি, নাম-যশ দিয়ে তো আর সব হয় না, তাই বোধহয় গ্রামে এই পরিবারটির বেশ কদর আছে, এদের সদস্যদের ব্যবহার ও নিজেদের মধ্যে সু-সম্পর্কের জন্য, তথাকথিত উন্নত পরিবার বলেই নীলাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল।

তারও ইচ্ছা করে...শখ যায়...! আর আকাশের এই রীতিই অবলম্বন করল নীলার নিয়তি। প্রতি মাসের মতোই মোট সাতজনের ভাড়া এক জায়গায় করে এই মাসেও নীলা দিতে গেল তাদের বাড়িওয়ালাকে। গিয়েই ঘরের আড়াল থেকে সে দেখতে পায় তিনি অন্য কারোর সাথে কথা বলছেন। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে। কিন্তু কিছু কথা তার কানে আসে, বহিরাগত লোকটি বাড়িওয়ালাকে বলছে —আরে কী আছে দাদা এত দুশ্চিন্তার! এরকম তো হয়ই। খুব নতুন নয়, মেয়েগুলোকে বলুন যেই বাড়িটায় পাঠানো হচ্ছে সেটাও আপনারই বাড়ি। এই বাড়ির রিপেয়ারিংয়ের কাজটা করা হলে না হয় আবার ফিরে আসবে। আর একবার ওই এলাকার ঢুকে গেলে তো আর কুছ পরোয়া নেই দাদা ! কোনো মেয়েই কি আজ পর্যন্ত ব্যবসায় ঢুকে গেলে বেরোতে পারে? চাইলেও পারে না। সাতটা মাঝবয়সী মেয়ে, এ সুযোগ কি ছাড়া যায় ?

—মেয়ের বয়সি মেয়ে সেটজী! আমার একান্তই এই টাকাটার খুব প্রয়োজন। নইলে আমার ছেলে বিলেতে পড়ার সুযোগ পেয়েও যেতে পারবে না, নইলে কী এ কাজ আমি, ছিঃ ছিঃ !!

বাড়িওয়ালার কথার আংশিক শুনেই নীলা নিঃশব্দে চলে আসে। তার হাত পা কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে, কাকে কী বলবে সে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বন্ধুর মতো হয়তো মেশে। সে যাদের সাথে থাকে তার এই কথা কী কেউ শুনবে! সেদিন সারারাত ভাবে সে, চোখে কোনো ঘুম নেই, পরদিন সকালেই নীলা মাস্টারমশাই অর্থাৎ বাড়িওয়ালার কাছে গেল। খুলে বলল গতদিনের সব কথা। মাস্টারমশাই ভালো লোক ছিলেন ঠিকই কিন্তু আত্মবলিদান কী কেউ চায়? সে বুঝে গেছিল নীলাকে। বাড়ি ফিরে যেতে দিলে পাছে সে পুলিশ নিয়ে সব জানাজানি করে ফেলে! সব তো শেষ তাহলে। মাষ্টারমশাই পাশে টেবিলের ওপর রাখা কাঁচের ফুলদানিটা দিয়ে নীলাকে সজোরে আঘাত করতে গেলে পেছন থেকে বাকি দু'জন মেয়ে জাপটে ধরে মাস্টারমশাইকে। তারা আগেরদিন থেকেই নীলার ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ করেছিল ও হঠাৎই মাষ্টারমশাইয়ের সাথে দেখা করতে যাওয়ায় তারাও নীলার পেছনে যায় ও তার কথা শোনে। তারা সকলে মাষ্টারমশাইকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একসাথে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে। ওরা পুলিশ স্টেশনের দিকে যায়। তাদেরই মধ্যে একটি মেয়ে কিছু টাকা সাথে রেখেছিল বুদ্ধি করে,

বাড়িওয়ালার কথার আংশিক শুনেই নীলা নিঃশব্দে চলে আসে। তার হাত পা কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে, কাকে কী বলবে সে, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বন্ধুর মতো হয়তো মেশে।

সেই দিয়েই তারা ডায়েরি করে। সেইদিন বিকালেই মাষ্টারমশাই ও ওই সেটজীকে অ্যারেস্ট করা হয়। তারা সকলেই যে যার বাড়ি ফিরে যায়। দীর্ঘ একমাস মামলা চলে ও তাতে মাস্টারমশাইয়ের তিনবছর ও সেটজীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নীলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেইদিন, বাকি দু'জন ও তাদের বাড়ির সদস্যরা নীলার বাড়ি এসে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যায়। কারণ নীলা সেদিন সাহস করে বলতে না গেলে আজ বোধহয় সাতজনের কারোরই বাড়ি ফেরা হত না। নীলা নিজের বাড়ি থেকে যাতায়াত করেই কলকাতায় তার বাকি দশ মাসের পড়াশুনো শেষ করে। রোজ নামখানা লোকাল ধরে সে আসত কলকাতায়। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যেন আর পারা যাচ্ছে না। তবুও সে লেগে থেকেছে ছাড়েনি হাল। পরবর্তীকালে একজন নামজাদা লেখিকা হয়। তার মনে পড়ে বহুদিন আগে এই হিংস্র যুদ্ধের শুরুর কথা। সে নিজের প্রথম গল্প লেখার জন্য আজ তৈরি। সে আজ তার জীবন নিয়েই লিখবে গল্প। তবে যোগ হবে আরও ঘটনা, আর সে ঠিক করল গল্পের নাম দেবে 'ভোর'। কারণ মেয়েদের জীবনটা যে এমনই, রাত ফুরিয়ে আজ এই যুগে দাঁড়িয়ে আবছা আলোর ভোরে পা রেখেছে প্রত্যেকটি মেয়ের জীবন। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সকালে পা রাখা বোধহয় কোনো মেয়েরই আর হল না এই অপরিষ্কার অস্বচ্ছ জঞ্জাল, ধুলো ধোঁয়াসায় ভরা সমাজে।

✦ ✦ ✦

পঞ্চম কন্যা

পূবালী চট্টোপাধ্যায়

শেষ আলোটুকু নিভিয়ে দিয়ে গেল পরিচারিকা এসে। অন্ধকারে স্থানুর মতো বসে আছেন মন্দোদরী। শুধু তাঁর হৃদয়ে জ্বলছে স্বামী, সন্তান হারানোর এক সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা। চোখের জল তপ্ত হৃদয়াকাশ মুহূর্তে শুসে নিচ্ছে। লঙ্কার বাতাস কী অসম্ভব ভারী হয়ে আছে। মৃত্যুর গন্ধ মিশে আছে লঙ্কার মাটিতে। নরম শয্যা তাঁর কাছে কন্টকের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে। উঠে বসলেন মন্দোদরী। তিনি স্বর্ণপাত্র থেকে এক পাত্র জল গড়িয়ে খেলেন। এই সুদীর্ঘ রাত্রির প্রগাঢ় শূন্যতা তাঁর শরীরকে ব্যাকুল করছে। শয্যা ত্যাগ করে কক্ষ সংলগ্ন বাগানের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন রাজপুরীর দিকে। সর্বাঙ্গসুন্দর স্বর্ণপুরীর এ কী হত কুৎসিত দৈন্যদশা। উদভ্রান্তের মতো মনে মনে বললেন, কেন দশগ্রীব কী দেখলেন আপনি জানকীর মধ্যে যার জন্য কুল, শীল, মানমর্যাদা সব বিসর্জন দিলেন? একটা আর্ত হাহাকার বেরিয়ে এসে মিশে গেল লঙ্কার বাতাসে বাতাসে। তিনি বলতে থাকলেন, লঙ্কেশ্বরের উদ্দেশ্যে। নাথ তোমার কেন এই মতি বিস্মৃতি ঘটল? তোমার তেজ, তোমার বিক্রম তোমার পাপের কাছে ম্রিয়মান হল? সামান্য বনচারী মানুষ তাঁর হাতে তুমি শেষে কিনা নিহত হলে? ইন্দ্র তোমার রুদ্র রূপ দেখে পথবিহ্বল হত, মহর্ষি গান্ধর্বেরা তোমার পরাক্রমে পলাতক হত সেই তুমি আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। আমি একান্ত মনে শুধু তোমাকেই আরাধনা করেছি। তবুও তোমায় এই পাপ কাজ থেকে আমি দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি। তোমার অন্তঃপুরের নারীরা রূপে, গুণে অসামান্য তবুও কেন তুমি সীতার প্রতি এই অমোঘ টান অনুভব করলে? কী দেখলে এই সামান্য মানবীর মধ্যে? মন্দোদরী চোখের জল আর বাঁধ মানলো না। আকুল নয়নে তিনি কাঁদতে থাকলেন। ঘন রাত্রির অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল লঙ্কার আকাশ বাতাস।

দশাননের চিতা এখনো জ্বলছে। এরই মধ্যেই দূত এসে খবর দিয়ে গেল বিভীষণের আগমনের। হৃদয় বিদীর্ণ করে মন্দোদরীর একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। বিভীষণ আসবেন তাঁর কাছে রাজ্যাভিষেক সম্পূর্ণ হবার আগে। না জানি তিনি কি বলতে আসবেন? আনমনা হয়ে পড়েন রাবণের প্রিয় জ্যেষ্ঠা পত্নী। কিছুকাল পরে দাসী এসে জানালেন স্নানগার প্রস্তুত করা হয়েছে তার জন্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি মন্থর গতিতে পা বাড়ালেন স্নানের উদ্দেশ্যে বিভীষণ আসার আগে।দুধ আর গোলাপের পাপড়ি বিছানো সুগন্ধী মিশ্রিত জলের মধ্যে শরীরটাকে ডুবিয়ে দিলেন মন্দোদরী। বেশ অনেকটা সময় শুয়ে থাকলেন শীতল জলের মধ্যে। মনের মধ্যে যে আগুন জ্বলছে তা খানিক প্রশমিত হল শীতল জলস্পর্শে। স্নান সেরে উঠে তিনি পরিধান করলেন অনাড়ম্বরহীন পাটের বস্ত্র। কোনো অলংকার ধারণ করলেন না তিনি। তাঁর কিছুই ভালো লাগছে না। এই স্বর্ণ সুখ তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। তিনি যে দিকেই তাকাচ্ছেন প্রিয় দশাননের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। তবু প্রজাদের স্বার্থে তাঁকে বিভীষণের সাথে এই গভীর শোকের সময়ও দেখা করতে হবে, বসতে হবে রাজ্যের হিতের আলোচনায়। সমগ্র লঙ্কা রাজাহীন হয়ে পড়ায় রাজ্যে চলছে এক অদ্ভুত নৈরাজ্যকতা। রাজ্যের নানা স্থানে ছোট ছোট আকারে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে। এই অসংলগ্ন পরিস্থিতিতে তাঁকে দেবর বিভীষণের সাথে আলোচনা করতেই হত। স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দাসীদের বিভীষণের জন্য খাদ্যের থালা সাজিয়ে প্রস্তুত করতে বললেন। বিভীষণ গৃহে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে রইলেন অধোবদনে, মন্দোদরীর দিকে তাকাতে তাঁর সংকোচ হচ্ছে। নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বললেন মন্দোদরী। তিনি বললেন, অন্তঃপুরের সকল রমণীরা শোকে বিহ্বল হয়েছে। আমাদের সোনার লঙ্কা মৃত্যুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই সংকট সময়ে তুমি শ্রীরামের পরামর্শ মতো লঙ্কার রাজকর্যের দায়িত্ব নেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছো তার জন্য আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তোমার ভ্রাতার মৃতদেহ রামের কথামতো সৎকার করেছ তার জন্য আমি তোমার কাছে চিরঋণী। বিভীষনের দুই আঁখি অশ্রুসিক্ত হল, তিনি বললেন, আমি মনে মনে ভীষণ আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হচ্ছি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর দ্বায়ভার আমার। একথা আমিও অস্বীকার করতে পারি না। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ভ্রাতাকে অনেক বোঝানোর পরেও কোনোভাবে বুঝলেন না। আমার কোনো বারণ ভ্রাতা শোনেননি। মন্দোদরী চোখের জল মুছে বললেন, লঙ্কেসকে আমিও বহুবার বারণ করেছি, এই পাপ থেকে বিরত থাকতে বলেছি। বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম বারংবার দেবী সীতা সাধারণ রমণী নন, তিনি এক তেজস্বিনী নারী। তাঁর শরীর, মন কেবল ও কেবলমাত্র

পুরুষোত্তম রামের প্রতি সমর্পিত। দশানন কোনো কথাতেই কর্ণপাত করেননি। কুম্ভকর্ণ, পুত্র মেঘনাদ আমার পিতা সকলেই দশাননকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর বীরত্বের গৌরব ছেড়ে এক সামান্য নারীর প্রতি বশীভূত হয়ে নিজের এবং আমাদের প্রভূত সর্বনাশ করলেন। বিভীষণ ভ্রাতৃ জায়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর সোনার বরণ গায়ের রঙ পান্ডুর হয়েছে। চোখের কোণে ক্লান্তি আর কালিমার স্পস্ট ছাপ। আমি এই সব কোনো কিছুর জন্য তোমাকে দোষারোপ করিনা বিভীষণ। এ আমার নিয়তি। বলে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন মন্দোদরী। মন্দোদরী লক্ষ্য করেননি রাক্ষসী ত্রীজটা কোন এক সময় এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের বাইরে। হঠাৎ মন্দোদরী তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জানতে চাইলেন তাঁর আগমনের হেতু। ত্রীজটা জানালেন, অন্তঃপুরের সকল রাক্ষসী রমণীরা শোকবিহ্বল হয়ে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করছেন। তাঁরা নাথহীন হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। এই মুহূর্তে রাজরানীকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রীজটা এখানে এসেছেন। ত্রীজটা জানালেন, মহারাজের মৃত্যুর আগে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, রাবণ উন্মাদের ন্যায় আচরণ করছেন। রাম, লক্ষ্মণ শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে হাতির পিঠে উঠেছেন। সূর্যের মতো তাঁদের তেজ ও প্রতাপ। জানকী রামের কোল থেকে উঠে এক হাতির পিঠে চড়ছেন। ত্রীজটা যেন তার লাবণ্যমণ্ডিত সুন্দর মুখটিতে আত্মতুষ্টির ছাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন।তিনি তাঁর হাতের মধ্যে সূর্যকে ধরার চেষ্টা করছেন। তাঁরা হাতির পিঠে চড়ে উত্তর দিকে যাত্রা করছেন। অপরদিকে, রাবণ গাধার পিঠে চড়ে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। ত্রীজটা কাঁদতে কাঁদতে আরো বলতে থাকলেন, আমার মনে সেদিন ভীতির উদ্রেগ হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমাদের মহারাজ আমাদের অভিভাবকহীনা করে চলে যাবেন। মন্দোদরী বলতে যাচ্ছিলেন কেন জানাসনি তোর এই স্বপ্নের কথা আমায়। তারপর কী ভেবে চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বিভীষণের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। তারপর ধীরে বললেন, রাম সাধারণ মানুষ নন। পরমপুরুষ রামের বেশে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর নিজের হাতে রাবণের অনাচারের বিনাশ করতে। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ স্বয়ং নিয়তি হয়ে বধ করেছেন রাবণকে। এখন তোমার যা করণীয় কর্তব্য তুমি সেই রূপ কর বিভীষণ। একবার অন্তঃপুরে চলো সেখানে রাক্ষস রমণীদের কী অবস্থা তা তুমি নিজের চোখেই পরিদর্শন করো। বিভীষণ অন্তঃপুরে যাওয়ার আর সাহস পেলেন না। তিনি ভ্রাতৃ জায়ার মুখেই রাক্ষস রমণীদের কথা শুনলেন। তারপর ভ্রাতৃ জায়ার থেকে অনুমতি নিয়ে সেই স্থান থেকে প্রস্থান করলেন তারপর যাত্রা করলেন রামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে।

নরোত্তম রাম তাঁর পারিষদবর্গদের সাথে বসে নানান আলোচনায় ব্রতি হয়েছিলেন। অযোধ্যায় কবে প্রত্যাবর্তন করবেন সেই নিয়েও দিনক্ষণ ধার্য করা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় বিভীষণ সেখানে প্রবেশ করলেন। তিনি জানালেন লঙ্কার রমণীরা শোকে আকুল হয়েছেন রাবণের প্রাণনাশের পরে। মহাবল ও মহাবীর রাবণকে হারিয়ে তাঁরা অনাথ হয়েছেন। প্রিয় ভ্রাতৃবধূ মন্দোদরীর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। তাঁর রাজমহিষীর বেষ আজ মলীন হয়ে ধূলায় লুণ্ঠিত। প্রভু আপনি আমাকে রাবণের শেষকৃত্য করার আদেশ দিয়েছিলেন। আমি আপনার কথার অন্যথা না করে সে আদেশ পালন করেছি। অধার্মিক দুশ্চরিত্র রাবণকে তাঁর মহাপ্রতাপের জন্য আপনি বীরের ন্যায় অগ্নিসংস্কার করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁকে মহাসমারোহে চন্দন, সুগন্ধী প্রভৃতি দ্বারা চর্চিত করে, ব্রাহ্মণ-রাক্ষসগণ তাঁকে মাল্য পতাকার দ্বারা আচ্ছাদিত করে অন্তিম শয্যায় শায়িত করেছিলেন । এখন লঙ্কার রমণীদের প্রতি আমার কর্তব্য কী আপনি বলে দিন। স্বামী পুত্রহীনা দেবী মন্দোদরী নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। তাঁর এই গভীর শোক আমাকে বিহ্বল করছে। রাম বিভীষণের কাছে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন, তারপর বললেন, তুমি এই মুহূর্তে রাজার উচিত সেই কাজই করো প্রিয় বিভীষণ। তুমি তোমার ভ্রাতৃজায়াকে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে গ্রহণ করো পত্নীরূপে। রামের মুখে এরূপ কথা শুনে বিভীষণ স্তম্ভিত হলেন। রাম বললেন, রাজ্যের এই অরাজক পরিস্থিতিতে নিরপরাধ স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর কর্তব্য। লঙ্কার ভবিষ্যতের জন্য তাঁর উচিত মন্দোদরীকে অবিলম্বে বিবাহ করা। রামের কথায় বিভীষণ সম্মত হলেন। আবার একটা ভয়ংকর কালো রাত্রি। প্রিয়হীনা হয়ে মন্দোদরী শোকে মুহ্যমান। তার মনে হচ্ছে এই হৃদয় এই শরীর যা রাবণকে রক্ষা করতে পারেনি তাঁকে এই মুহূর্তে ত্যাগ করা সমীচীন। মাথার মধ্যে হাজার একটা চিন্তা বাসা বাঁধছে। প্রাণের অধিক প্রিয় স্বামীর প্রতি অদ্ভুত ক্ষোভ, অভিমান জমে উঠছে। মনে হচ্ছে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রাবণকে ডেকে তুলে জিজ্ঞাসা করেন, কীসের জন্য কী কারণে রাবণ সীতাকে দেখে এতখানি মোহাবেষ্টিত হয়েছিলেন? সীতা কুল মর্যাদায় কোনোভাবেই আমার থেকে অধিক নন, আবার সমকক্ষ নন। তবে কীসের এত তীব্রতা সীতার প্রতি অনুভব করলেন রাবণ? এই লঙ্কাপুরীতে সীতার চাইতে রূপে গুণে অনন্য বহু রমণী আছেন তবু তাঁদের উপেক্ষা করে রাবণ সীতাতে মনোনিবেশ করলেন কেন? নিয়তি যখন শিওরে এসে দাঁড়ালো তখন মহাবীর ও মহাপরিক্রমী রাবণেরও বুদ্ধি ভ্রষ্ট হল। মন্দোদরী মনে মনে বাসনা করলেন এই প্রাণ পরিত্যাগের। প্রাসাদ সংলগ্ন যে পুষ্করিণী আছে সেটির দিকে অগ্রসর হলেন। আশ্বিনের আকাশ মেঘমুক্ত উজ্জ্বল তারারা পথ দেখাচ্ছে মন্দোদরীকে। বাতাসের শীতল একটা স্পর্শ আছে শিউলির গন্ধে চারপাশটা মম করছে। আকাশে বাঁকা চাঁদ সেই চাঁদের আলোয় পথের দু'ধারের কাশফুলগুলোর দিকে একবার চোখ ফেরালেন মন্দোদরী। বহু যুগের স্মৃতির ওপার থেকে ভেসে এল যেন তাঁরই পূর্বজন্ম। তিনি দেখতে পাচ্ছেন কৈলাসে অপূর্ব শোভা বর্ধিত হয়ে চারপাশ সুসজ্জিত। সেখানে মাতা পার্বতীর জন্য অপেক্ষা করছেন এক অপ্সরা। তিনি মাতা পার্বতীর একনিষ্ঠ ভক্ত। মাতার দর্শনের হেতু তিনি কৈলাসে অপেক্ষমান। শংকর জায়া উমা

তখন কৈলাসে ছিলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎই সেই অপ্সরার চোখ পড়ল মহাদেবের ওপর। মহাদেবের নয়নাভিরাম রূপ দেখে তিনি মোহিত হলেন। তিনি নৃত্য এবং গানে মহাদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমত অবস্থায় দেবী পার্বতী সেখানে উপস্থিত হয়ে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরলেন। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, অপ্সরা মধুরা তোমার এত দূর স্পর্ধা তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের উপরে তোমার কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করো। আমি এই মুহূর্তে তোমায় অভিসম্পাত দিচ্ছি তুমি দীর্ঘ বারো বৎসর একটি কুয়োর মধ্যে মণ্ডূক রূপে বসবাস করবে। মধুরা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। তিনি পার্বতী এবং মহাদেব কে নমস্কার করলেন। মহাদেব তাঁর আন্তরিক অনুতাপ বুঝতে পেরে পার্বতীর কাছে অনুরোধ জানালেন মধুরার অভিসম্পাতের আয়ু কম করার জন্য। বিশ্ব জননী ক্ষমাশিলা তিনি আপন ভক্তকে ক্ষমা করে সেই অভিশাপের আয়ুকাল এক বৎসর করে দিলেন। মধুরা মর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটি কুয়োর মধ্যে এক বছর কাল সময় অতিবাহিত করে কঠোর তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত করলেন মণ্ডূক রূপে। স্বর্গের অপ্সরা নিজ দোষে ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়ে গভীর অনুতাপে জীবন অতিবাহিত করলেন এক বৎসর কাল। তাঁর কঠোর তপস্যা তাঁর পাপ মুক্তি ঘটালো। তিনি একটি সুন্দরী শিশুকন্যা রূপে কুয়োর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই কুয়োর পার্শ্ববর্তী স্থানে ময়দানব ও অপ্সরা হেনা একান্ত চিত্তে কন্যা লাভের জন্য তপস্যা করছিলেন। হটাৎ ক্রন্দনরত শিশুটি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন তাঁরা সেই শিশু কন্যাটিকে নিজেদের পুত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। নাম হল মন্দোদরী।

মন্দোদরী একটি পাথরে হোঁচট খেলেন। তাঁর ভাবনাই হঠাৎ ছেদ পড়ল। তিনি ফিরে এলেন বাস্তবে আরো দ্রুত পদে এগিয়ে চললেন পুষ্করিণীর দিকে। হঠাৎ কে যেন তাঁর কানের কাছে বলে গেল তুমি লঙ্কার অধীশ্বরী। রাবণকে হারিয়ে পুরো লঙ্কা শোকে নিমজ্জিত, দিশাহীন। এমত অবস্থায় তুমিও যদি প্রাণ ত্যাগ কর তাহলে ধর্মকে উত্তর কী দেবে? মন্দোদরী তো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। তবে কার এই কণ্ঠস্বর এই শোকের সময় তিনি কি নিজের মতি হারিয়েছেন? সামনেই একটি স্বর্ণচাঁপা গাছ। তার নিচে তিনি বসলেন। তাঁর আজানুলম্বিত কেশোরাশি স্পর্শ করছে মেদিনী। রাবণের মৃত্যুর পর থেকে তিনি তাঁর কেশরাশির পরিচর্যা করেননি। হায় নিয়তি! রাজমহিষীর কপালে মৃত্যুও কি জুটবে না? প্রজাগণের হেতু তাঁর ধর্মই এখন এই লঙ্কাকে রক্ষা করা। মন্দোদরী মন স্থির করলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দু'হাতের করতলে চোখের জল মুছলেন। তারপর এগিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। সেখানে একটি ঘরে এই অন্ধকার নিশিথেও জ্বলছে বাতি। সে ঘর রাবণের আরাধনা কক্ষ সে ঘরে অধিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেব। মন্দোদরী নিজের কক্ষে ফিরে গিয়ে পূর্ণ অবগাহন করলেন। তিনি ভৈরবীকে ডেকে বললেন মহাদেবের পূজার উপাচার প্রস্তুত করতে। দেবাদিদেবের সামনে এসে তিনি কৃতাঞ্জলিপুত হয়ে বসলেন। হৃদয়ের সমস্ত ভার তিনি অর্পণ করলেন পরমপিতা দেবাদিদেবের পদতলে। মহাদেবের আরাধনায় তিনি নিমগ্ন হলেন। ধীরে ধীরে কেটে গেল রাত্রির প্রতিটি প্রহর। তিনি মহাদেবের সামনে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে বললেন, প্রভু পূর্বজন্মে যে পাপ করেছি সে পাপের খণ্ডন বুঝি এজন্মে এভাবেই হল। নাথহীন হয়ে আমি অনাথ হলাম। রাবণ তোমার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়েও পাপের পথ ত্যাগ করতে পারলেন না। মহাজ্ঞানী হয়েও যথেচ্ছ নারীর সঙ্গে নিজের অকাল সংহার নিজেই বয়ে নিয়ে এলেন। মহাদেবের জ্যোতি পুঞ্জিত লিঙ্গের সামনে মাথা নোয়ালেন মন্দোদরী। একবার প্রাণনাথ রাবণের মুখের ছবি কল্পনা করলেন মনে মনে। তারপর উদার কণ্ঠে গাইলেন রাবণ বিরচিত শিব তাণ্ডব স্তোত্রম। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে স্তোত্র পাঠে মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন। তার মন এখন অনেকটা লঘু হয়েছে।

ভৈরবী এসে খবর দিলেন রঘুনন্দন ও দেবর বিভীষণ তাঁর কাছে একটি বিশেষ প্রয়োজনে আসছেন সায়াহ্নে। রঘুনন্দনের নাম শুনে তাঁর মনে অদ্ভুত এক দ্বৈত ভাবাবেশ ঘটল। একইসাথে শ্রদ্ধা ও তিক্ততা অনুভব করলেন তিনি। তাঁর মনে পড়ে গেল প্রথম দিনের কথা যেদিন লঙ্কেশ্বর জানকীকে এই স্বর্ণলঙ্কাপুরীতে নিয়ে এলেন। লঙ্কেশ্বরের মুখে দর্প অহংকার আর দম্ভ খেলা করছিল। রাগে, দুঃখে মন্দোদরী ছুটে গিয়েছিলেন রাবণের সম্মুখে। গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। রাবণ আত্মঅহংকারের বশীভূত হয়ে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে অপমান করেন। রাবণ বলেন, বীরের কাছে যা কিছু ভোগদ্রব্য বীর তাকে ছিনিয়ে নিতে পিছপা হয় না। তুমি তো জানো রাক্ষসরানি বীর ভোগ্যা পৃথিবী আর রূপসী নারী এই ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ নিজের বাহুবলের জোরে হরণ করে নিয়ে এসেছে সীতাকে। রাক্ষসীরা অতি আদরে জানকীকে রেখেছেন অশোকবাটিতে। তাঁকে আমি সোনায় মুড়ে রাখব। তাঁর সোনার অঙ্গ বনবাসে থেকে কালিমালিপ্ত হয়েছে। বনবাসীরাম এই সুন্দর রমণীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারেননি। সেদিনই লঙ্কেশ্বরের মুখে তিনি প্রথম রামের কথা শুনেছিলেন। তারপরে রামের সম্বন্ধে তিনি যত জেনেছেন তত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেছেন। রাবণের কথা শুনে মন্দোদরী সেই মুহূর্তে বললেন, বীর ভোগ্যা পৃথিবী একথা যেমন সত্য ঠিক তেমনি একজন পরস্ত্রীর প্রতি মনোযোগী হওয়াটাও পাপাচার এই সত্যও কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন দশগ্রীব? অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন রাবণ। তুমি কি মনে মনে ভীত হয়ে উঠছ মন্দোদরী? রাক্ষসরানি কি আতঙ্কিত তাঁর পট্টমহিয়সীর পদ হারানোর ভয়ে! তুমি কি জানো না রাক্ষসরা এইভাবেই ছলে বলে কৌশলে বিবাহ করে। মন্দোদরী ব্যথিত হৃদয়ে কিয়ৎক্ষণ দশাননের দিকে চেয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, আপনি কি সবকিছুই বিস্তৃত হয়েছেন মহারাজ? আপনার জ্যেষ্ঠা রানি আর যাই হোক পদ হারানোর ভয়ে ভীত নয়। আমার ভয় অন্যত্র। আপনি যে সর্বনাশ আমাদের লঙ্কায় নিয়ে এসেছেন তা আপনার সাথে আমাদের সকলকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। মন্দোদরী নিজের মনেই বলতে থাকলেন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আমাদের প্রথম

সাক্ষাতের দিন। আমি পিতার সাথে জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলাম আপনি কাছে এলে পিতার সাথে কথা বললেন জানালেন আপনি ঋষি বিশ্রবার ও রাক্ষসী কৈকসীর পুত্র, পুলাস্ত্যের পৌত্র। আপনার বংশ গৌরব শুনে আমিও আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলাম। পিতার সাথে কথা বলার সময় আপনি দেখলেন আমাকে। আপনার চোখে তখন আমার জন্য মুগ্ধতা। পিতা ময়দানব উত্তম কারিগর। তিনি আপনার কীর্তির কথা শুনে আমার সাথে আপনার বিবাহ স্থির করলেন আর যৌতুক হিসেবে আপনাকে তাঁর তপোলবদ্ধ অমোঘ শক্তি দান করলেন। রাক্ষসরাজ সেই সময় আপনি শুধু আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। সেই সব সুখের দিন আমি কীভাবে ভুলে যাব? আমি নিজেকে চরম সৌভাগ্যবতী মনে করতাম। নন্দনকানন কত সুন্দর স্থান পর্বত আপনার সাথে আমি ভ্রমণ করেছি। আজ আমি স্বামী থাকতেও এত অভাগী! আজ আপনার একি দুর্মতি হল নাথ? আপনি ছলে বলে কৌশলে অন্যের স্ত্রীকে হরণ করে আনলেন! আপনার বংশ গৌরবের কথা একেবারে বিস্তৃত হলেন। দশানন অতি দর্পে মাটিতে দু'বার পা ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দিন এগিয়েছে মন্দোদরী সীতার কথা শুনেছেন তার দাসী এবং সেবিকাদের মুখে। শুনেছেন কোমল স্বভাবা এই নারীর চোখে জল থাকলেও অন্তরে আছে পবিত্রবহ্নির শিখা। কোনোমতেই দেবী সীতা রাবণকে স্বামীরূপে স্বীকার করে নেননি। বহু যাতনা সহ্য করে তিনি প্রিয় রামের জন্য অপেক্ষমান। শুনেছেন রাম নাকি আসছেন সীতাকে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি তৈরি করেছেন তাঁর বানর সেনাদের। অলস দুপুরে তাঁর নারী হৃদয় ঈর্ষান্বিত হয়েছে জানকীর কথা ভেবে। কী আছে এই নারীর মধ্যে যার জন্য জানকীর স্বামী সাত সমুদ্র পেরিয়ে আসছেন! ভৈরবীকে দিয়ে একবার সীতার পরিধানের জন্য রাজ পরিবারের বস্ত্র পাঠিয়েছিলেন মন্দোদরী। সীতা সেই বস্ত্র নিতে অসম্মত হন। তিনি ভৈরবীকে বলেন, তুমি রাক্ষসরানিকে বলো, যে বস্ত্র আমি পরিধান করেছি তা দেবী অনুসূয়ার আশীর্বাদ। এ বস্ত্র কোনোদিন মলিন হবে না। তিনি বরং তাঁর স্বামীকে বোঝান যাতে করে তিনি আমাকে নিজের স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেন। বুদ্ধিমতী তেজোদিপ্তা মন্দোদরী সেদিনই বুঝেছিলেন এ সামান্য নারী নয় সীতা সতী। তিনি নিয়তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। মন যেন ঈশ্বরের এক অদ্ভুত সৃষ্টি সেখানে মুহূর্তের মধ্যে কত না ভাবনার সমারহ। এইসব সাত পাঁচ পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতেই সময় এগিয়ে গেল। রঘুনন্দন আর বিভীষণ আসলেন মন্দোদরীর সাক্ষাতে।কিছু আগে প্রধান সেবিকা ধরা এসে খবর দিয়ে গেছে রঘুনন্দনের পবিত্র পদধূলি এই প্রাসাদে পড়েছে। দেবর বিভীষণ রঘুনন্দনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন মন্দোদরীর কক্ষে। রামকে দেখে মন্দোদরী ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। সৌভাগ্যবতী ভব বলে রাম আশীর্বাদ করলেন। মন্দোদরী করুণভাবে হাসলেন। রাম বিভীষণ আসনগ্রহণ করলেন। বিভীষণ বললেন, আমি আপনার কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এসেছি। আমি আপনার সাথে বিবাহ করতে চাই। মন্দোদরী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন বিভীষণের মুখের দিকে। তিনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারপর ধীরে বললেন দশানন চলে গেলেও আমি এখনো তাঁর বিধবা পত্নী। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, প্রেম আমার একান্ত সাধনা। তুমি কি আমাকে করুণা দেখানোর জন্য বিবাহ করতে চাইছ? বিভীষণ বললেন, রাজমহিসীকে করুণা দেখানোর স্পর্ধা আমার নেই। আমি শুধু আমাদের রাজ্যের কথা ভেবে আমাদের রাজ পরিবারের কথা ভেবে আপনার পানিপ্রার্থী। মন্দোদরী কিছুতেই সম্মতি প্রদান করবেন না। তাঁর চোখ অপমান লজ্জায় অশ্রুসিক্ত হল। নরোত্তম রাম তখন বললেন, দেবী আপনি যথার্থই প্রতিব্রতা তবু লোকোকল্যাণ হেতু রাজ্যের পাটরানি হওয়ার দায়ভার আপনাকে নিতে হবে। বিভীষণ আপনার সাথে বিবাহ করলে সহজেই লঙ্কার রাজা হতে পারবে। লঙ্কাবাসী যে নৈরাজ্যের মধ্যে ডুবে আছে আপনি সহৃদয় হলে এ রাজ্য পুনরায় স্বর্ণলঙ্কা হয়ে উঠবে। এতে আপনার ধর্মের কোনো হানি হবে না। আপনার মর্যাদা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন হবে না। আপনার আর বিভীষণের বিবাহ কোনো প্রেমাকাক্ষিত বিবাহ নয় এক রাজনৈতিক চুক্তি।

শেষে সকলের হীতের জন্য মন্দোদরী এই ত্যাগ স্বীকার করলেন। বিবাহের পরে বিভীষণের সাথে একই কক্ষে মন্দোদরী। দেবর বিভীষণ ধর্মপ্রাণ মানুষ। দশাননের মতো বীর না হলেও তিনি ধর্মজ্ঞ কোমলহৃদয় পুরুষ। আজ তাঁকে স্বামী হিসেবে পেয়ে মন্দোদরীর জীবনের ঘোর অন্ধকারময় রাত্রি কেটে গিয়ে দিবালোকের আলো ফুটে উঠল। অযোনী সম্ভূতা মন্দোদরীর পূর্ব জন্মের পাপ ধুয়ে মুছে গেল। মন্দোদরী বুঝলেন, তাঁর বাকি জীবন কঠোর সাধনার মধ্যে কাটাতে হবে। সে সাধনা রাষ্ট্রের কল্যাণের হেতু। তিনি যেমন রাবণের প্রতি তাঁর কর্তব্য কোনদিন অবহেলা করেননি। ঠিক সেভাবেই বিভীষণের ভার্জা হিসেবে বাকি জীবন তিনি তাঁর সুখ দুঃখ সবকিছুর প্রতি যত্নশীল হয়ে থাকবেন। এত কিছু পরেও যখন একলা ঘরে মন্দোদরী নিজের সাথে নিজে কথা বলেন তখন মনে হয় আমি কি অসতী হলাম? সীতা একান্তভাবে রামের হয়ে থেকে গেল। খবর এসেছে সীতা নিজের সতিত্ব প্রমাণের জন্য পাতাল প্রবেশ করেছেন। আমিও কি সেরম কিছু পারতাম না? দশগ্রীবের মৃত্যুর পর আমিই বা কেন আত্মত্যাগী হলাম না? তারপর তিনি সচেতনভাবে ভাবলেন, এই আমার ভবিতব্য। এই দায়িত্ব আমার শিরোধার্য। সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি মহামায়া ও মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। নিয়তি অলক্ষে তখন মন্দোদরীর ত্যাগের গাঁথা লিখছে। তাঁর কর্তব্য বোধ তাঁকে ভবিষ্যতের পথে নিত্য স্মরণীয় করে তুলল তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও তাই আজীবন কুমারী রয়ে গেলেন।তাঁর কৌমারিত্ব কোনোদিন মলিন হল না। পঞ্চম কন্যার একজন হয়ে রইলেন মন্দোদরী। যার নাম স্মরণ করলে মহাপাপের বিনাশ ঘটে। বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে তবু মুক্ত মনা ভারতবর্ষের মহান হৃদয়ে রাক্ষস রানি আজও প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে রয়েছেন। যে হৃদয় মন্দোদরীকে আবিষ্কার করেছেন পবিত্র মানবী হিসেবে।

মৌরলা মাছের গন্ধ

অলোক বসু

—মৌরলা মাছ কত করে গো?

আজ চন্দনের হঠাৎ মনে হল একটু মৌরলা মাছ নিলে কেমন হয়? কিছুটা কাটা পোনা নেওয়ার পর আর কী নেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে মৌরলা মাছের কথা মনে হল। বাবা বোধ হয় কিছুদিন আগে মৌরলা মাছের কথা বলছিল! কিন্তু ও যেখান থেকে মাছ নেয় সেই মাছওয়ালা বলল যে আটটার পরে কিছু ভালো মৌরলা মাছ আসবে। কিন্তু অতক্ষণ তো থাকা যাবে না। ওর তো অফিস আছে। ওর বউ মধুজাকেও স্কুলে যেতে হবে।

খুঁজতে খুঁজতে মাছের বাজারের এক কোণে একজনের কাছে মৌরলা মাছ দেখতে পেল।

লোকটা বলল—পাঁচশো টাকা কেজি।

—কেটে দেবে তো?

—না, আপনাকে ওই মাসিদের থেকে কাটিয়ে নিতে হবে।

এই আর এক ঝামেলা। মাছের বাজারের একদিকে অন্তত দশ-বারো জন মাছ কাটার মাসি বসে মাছ কাটে। তাদের পাশে আবার দু'জন ছেলেও মাছ কেটে দেয়। তবে আলাদা করে মাছ কাটার ক্ষেত্রে মাসিরাই বাজার গরম করে রাখে। ও যেখান থেকে সাধারণত মাছ কেনে তারাই কেটে দেয়।

চন্দন পাঁচশো টাকার মৌরলা মাছ পাঁচশো গ্রাম নিল। এবার মাসিদের কাছে গিয়ে কাটানো। কে জানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে! ওর ভাগ্য ভালো একজন মাসি খালি ছিল। ওকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিল।

তারপর মৌরলা মাছ দেখে কেমন একটা বিরক্তিসূচক শব্দ উচ্চারণ করে প্রায় হুমকি দেওয়ার স্বরে বলে উঠল—তিরিশ টাকা লাগবে কিন্তু।

ওর মুখ এখন এই মাছকাটানি মাসিদের মধ্যে তেমন চেনা নয়। কারণ ওকে তো আর আলাদা করে মাছ কাটাতে হয় না। না হলে নিয়মিত মাছ কাটানো খদ্দেরদের উদ্দেশে যে ধরনের গলায় কথা বলে তার চেয়ে একটু চড়া গলায় ওর দিকে চেয়ে বলল। আসলে হরেকরকম লোক থাকে। পাঁচ- দশ টাকা নিয়েও ঝগড়াও করে তুলকালাম ! তাই আগে থেকেই সাবধানবাণী ! চন্দন নিজের অজান্তেই বলতে যাচ্ছিল—তিরিশ টাকা ? কুড়ি নাও!

কিন্তু তারপর বলল—ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি করে দাও !

এগুলো সব কথার কথা। কিন্তু মাসি গজগজ করে উঠল—হ্যাঁ আমি যেন সারাদিন নিয়ে নিচ্ছি ! এক্ষুনি করে দিচ্ছি !

এমন সময় বিমলদার গলা শুনতে পেল—ওইটুকু মাছ কাটতে তিরিশ টাকা নিচ্ছ মাসি ? কুড়ি টাকায় করে দাও !

বিমলদা ওর পাশের বাড়ির লোক। সব বিষয়ে কথা বলার একটা ব্যাপার তার মধ্যে সবসময় কাজ করে!

মাসি মাছ কুটতে কুটতে বিমলদার দিকে চেয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ তুমি নিজে এসে মাগনায় কেটে দিয়ে যাও!

বিমলদার দিয়ে চেয়ে চন্দন হাসল। এখন রিটায়ার জীবন। লোকটা সর্বঘটে থাকে ! কী এনার্জি মাইরি !

চন্দনের বউ মধুজা বেশ ভালোই রাঁধে। যদিও একজন রান্নার লোক আছে। কিন্তু কিছু রান্না মধুজা নিজেই করে। যেমন মৌরলা মাছের ঝালটা আজও দারুণ রেঁধেছিল। এখন যদিও প্রায় বিকেল। চন্দন ভাত খেতে বসেছিল। সকালে তো ভেবেছিল আজ বোধহয় বাড়িতে ফিরতেই পারবে না। নার্সিংহোমে কেটে যাবে। সেখানেই যদিও অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আসলে চন্দন যখন অফিস যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বাবা হঠাৎ প্রায় অজ্ঞান মতো হয়ে গেছিল !

তাই বাবাকে নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছে। কদিন ধরেই বাবার শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বাবার অনেক বয়স হয়েছে। তা সত্বেও বাবা এখন বেশ শক্ত সবল। গতবছর পুজো শুরুর দিন মা হঠাৎ চলে গেল কোন কিছু জানান না দিয়ে। তেমন কোনো কিছু সমস্যা ছিল না। হঠাৎই চলে গেল। কেউ জানতেও পারেনি মা সপ্তমীর রাতে হঠাৎ বাড়ির বিছানাতেই চলে গেল।

মা খুব ভালো রাঁধত সবকিছু। নানা মহলে সবাই জানতো মার রান্নার হাত খুব ভালো। মধুজাও খারাপ রাঁধে না। মার কাছ থেকে অনেক নতুন নতুন রান্না শিখেছে। ওদের ছেলে সৌনক একবার একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল।

—আচ্ছা বাড়িতে একদিন মা আর ঠাম্মির মধ্যে কম্পিটিশন হোক কে ভালো রাঁধে !

চন্দনের কাছে প্রস্তাবটা কেমন যেন লেগেছিল !

মা সৌনককে খুব দাবড়ে দিয়ে বলেছিল—বাঁদর ছেলে কোথাকার ! নিজেদের লোকেদের মধ্যে কখনো কম্পিটিশন করতে আছে !

মধুজারও ছেলের কথাটা পছন্দ হয়নি সেটা চন্দন বুঝতে পেরেছিল !

মধুজা ছেলেকে বলেছিল, তার চেয়ে তুই বরং আমাদের একদিন মৌরলা মাছের ঝোল রেঁধে খাওয়া!

ও ভেবেছিল সৌনক কেন যে এমন সব কথা বলে! নিজেদের মধ্যে যেন লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা ! সৌনক কোন কিছু চিন্তা না করেই এমনি মজা করেই যে কথাটা বলেছিল তা অবশ্য সবাই বুঝেছিল ! তবুও মার ওই কথাটা কেমন যেন কানে বেজেছিল !

নিজেদের লোকেদের মধ্যে কখনো কম্পিটিশন করতে আছে !

মার আর মধুজার মধ্যে মোটামুটি সম্পর্ক ছিল। ভালোও নয়, তেমন খারাপও নয়।

বাড়ির সবাই মৌরলা মাছ খেতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সৌনক কিছুতেই মৌরলা মাছ খেতে চায় না একদম ! ওর নাকি কেমন যেন এক গন্ধ লাগে !

সৌনক বাড়িতে থাকলে সাধারণত চন্দন বাড়ির জন্য মৌরলা মাছ কেনে না। ছেলেটা গন্ধ লাগে বলে খাবে না। এখন তো অবশ্য ছেলে কাছে নেই। সৌনক এখন ওদের বাড়ি থেকে পনেরো মিনিট হাঁটা দূরত্বে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে বউ ধরিত্রী আর বাচ্চাকে নিয়ে থাকে ! বিয়ের কিছুদিন পরেই ওরা ওই ফ্ল্যাটে চলে যায় ! যদিও বাড়িতে একটা বড় ঘর আলাদা পড়ে আছে ওদের জন্য। এই নিয়ে ওদের একটা চাপা ক্ষোভ আছে। কিন্তু এখন তো এসব চলছে। কোন ছেলেই আর বাবা মার কাছে থাকে এখন ! তাও তো ছেলে দূরে কোথাও চলে যায়নি। কাছাকাছি আছে, যাওয়া আসাও আছে। মোটামুটি সম্পর্ক ভালো।

হঠাৎ মনে হল আচ্ছা সৌনকের বউ কি মৌরলা মাছ খায় ? বা খেতে ভালোবাসে?

বিয়ের পর সৌনক খুব তাড়াতাড়ি নিজের ফ্ল্যাটে চলে গেছিল। এর মধ্যে তার বউ মৌরলা মাছ খায় কি না খায় খোঁজ নেওয়া হয়নি ! কে জানে নাতি খায় কিনা!

বা হয়তো সৌনকের বউ মৌরলা মাছ চেনে কিনা!

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আরেকটা কথা মনে হল হঠাৎ ---- আচ্ছা মৌরলা মাছকে ইংরিজিতে কী বলে?

ওদের ছোটবেলায় ওয়ার্ড বুক ছিল, তাতে কত কিছু শব্দের

মা খুব ভালো রাঁধত সবকিছু। নানা মহলে সবাই জানতো মার রান্নার হাত খুব ভালো। মধুজাও খারাপ রাঁধে না। মার কাছ থেকে অনেক নতুন নতুন রান্না শিখেছে।

ইংরিজি মানে লেখা থাকত। ওরা বইয়ের পড়ার বাইরে সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে মুখস্থ করত ! তাতে কি মৌরলা মাছের ইংরিজি দেওয়া ছিল ? মনে হয় না। এখন অবশ্য খুব সোজা হয়ে গেছে সব কিছু জানা ! গুগুলে একবার ঘা মারলেই হল! আজকে মৌরলা মাছ কেনার সময় কি বাবার কথা অবচেতন মনে ভাবছিল চন্দন? কিছুদিন আগে কথায় কথায় বাবা একবার মৌরলা মাছের কথা বলেছিল !

নার্সিং হোমে প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নেওয়া গেছে। দু'তিন দিন বাদে হয়তো বাবাকে ছেড়ে দেবে।

বাবা আজকে আর মৌরলা মাছের ঝাল খেতে পারল না। নার্সিংহোম থেকে ফিরলে আবার একদিন আনবে বরং।

মৌরলা মাছের ঝাল ভাতে মাখার সময় বাবার কথা মনে হল। আজকে ওরা কেউ অফিস যেতে পারেনি। সৌনকও যায়নি।

চন্দন মৌরলা মাছ ভাতের সঙ্গে মাখছিল এমন সময় দরজায় কলিং বেলটা বাজল।

এখন কে এল ?

খারাপ লাগল না গো ! তবে ওইটুকু মাছ কী বীভৎস দাম গো !

—এখন একটু মৌরলার ঝাল খাবি ?

মধুজা ছেলেকে জিজ্ঞেস করল।

—আমি নিজে করেছি আজকে। খাবি ? দেব একটু?

কী মনে করে সৌনক বলল—দাও তো একটু চেখে দেখি।

মধুজা সৌনককে একটা ছোট্ট বাটিতে অল্প একটু মৌরলা মাছ দিল। সৌনক খেতে লাগল। চন্দন ছেলের মুখ দেখে বুঝতে চাইল সৌনক মাছটা খেতে পারছে কিনা। মুখ দেখে মনে হল সৌনকের খেতে ভালোই লাগছে।

— কিরে? খেতে গন্ধ লাগছে ? – চন্দন জিজ্ঞেস করল।

সৌনক মাথা নাড়ল—না গো! হেভি লাগছে ! একদম গন্ধ লাগছে না !

চন্দন আর মধুজা দু'জনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। যেন তৃপ্তির হাসি !

সৌনক বলে উঠল—ও মা ! দারুণ গো ! তুমিও তো ঠাম্মির মতো রান্না শিখে গেছো!

মধুজার কি মনে হচ্ছিল তার মানে সত্যিই চিরকাল তার শাশুড়ির রান্নাই তার থেকে ভালো! এই কথায় তো নতুনত্ব কিছুই নেই। সবাই তো জানতো তার শাশুড়ি খুব ভালো রান্না করতো !

মধুজা দরজা খুলে দিলে সৌনক ঢুকল। সকাল থেকে চন্দনের সঙ্গে ও খুব দৌড়োদৌড়ি করেছে। ওর বউ আর ছেলে কালকে সকালেই বাপেরবাড়ি গেছে। ধরিত্রী ফোনে খবর নিয়েছে বাবার।

চন্দন ছেলেকে দেখে বলল—আয়।

—এত বেলায় ভাত খাচ্ছ ? অন্য কিছু তো খেতে পারতে!

সৌনকের কথায় হাসল ও। মধুজা বলল, তোর বাবার তো আজ সারাদিন ভালো করে খাওয়া হয়নি ! আর তুই জানিস তো তোর বাবার অন্তত দিনে একটু ভাত না খেলে ….

মধুজা কথা সম্পূর্ণ করল না।

ওর সেই ছোটবেলা থেকেই অভ্যেস অন্তত দিনে একবার ভাত খাওয়া। রাতে খেতে পারলেও ভালো। কিন্তু এখন রাতে অল্প করে রুটি খায়। সৌনক বলল—তুমি আবার কখন নার্সিংহোমে যাবে ? আমিও একটু পরে যাব।

—তোর তো অফিস কামাই হয়ে গেল !

—সে তো তোমরাও ! তুমি আর মা কেউই তো যেতে পারলে না!

হঠাৎ সৌনককে বললাম—এই দ্যাখ কতদিন বাদে বাবার কথা মনে করে মৌরলা মাছ আনলাম আর আজ সকালেই বাবা…

মধুজা বলল—তুই তো খাস না – তোর তো গন্ধ লাগে !

—না গো একদিন একটা রেস্টুরেন্টে ধরিত্রী মৌরলা মাছের অর্ডার দিয়েছিল। হঠাৎ কী ভেবে খেয়ে দেখলাম খুব একটা

চন্দন হঠাৎ দেখল চকিতে মধুজার মুখের হাসি কে যেন শুষে নিল !

মধুজার কি মনে হচ্ছিল তার মানে সত্যিই চিরকাল তার শাশুড়ির রান্নাই তার থেকে ভালো! এই কথায় তো নতুনত্ব কিছুই নেই। সবাই তো জানতো তার শাশুড়ি খুব ভালো রান্না করতো ! মধুজাও তো মনে মনে সেটা স্বীকার করে ! কিন্তু এখন ছেলের কথাটা কেমন যেন মধুজার ভালো লাগল না ! কোথাও যেন মধুজা আর তার শাশুড়ির মধ্যে সবসময় ভালো রান্না করার একটা অদৃশ্য অঘোষিত প্রতিযোগিতা ছিল !

এমন সময় চন্দনের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। ও ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে যেন সবাইকে শুনিয়ে বলল—নার্সিং হোম থেকে ফোন…..

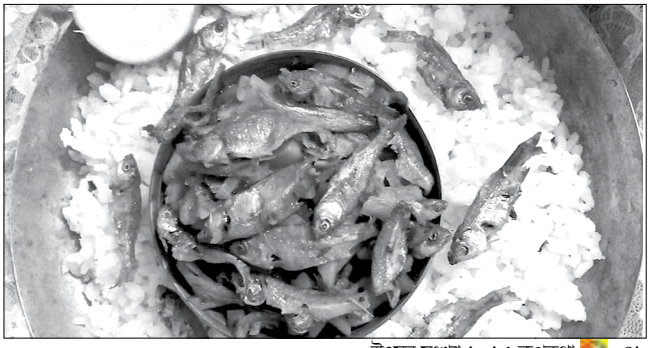

কৃষের কর্ষণ

তনুশ্রী চক্রবর্তী

গল্পের শুরু যেখানে সেখানে আছে মন। কেমন মন? শিশু মন। তার আত্মবিশ্বাস অবাক করে গল্প লেখার তাগিদ সৃষ্টি করে। আসলে প্রতিটা জীবন গল্পের উৎস ভাণ্ডার। সেখানের প্রকাশ সাথে নিয়ে এবারের পুজো সংখ্যায় 'কৃষের কর্ষণ'।

রবিবারের সকাল। অন্যদিনের তুলনায় একটু আরাম আয়েষব্রেকফাস্ট শেষ হতেই কৃষ কী করবে খুঁজে চলেছে। কারণ তার মোটামুটি সকালের কাজ শেষ।

হ্যাঁ ---এই ফাঁকে বলি- সদ্য ছয়ে পৌঁছেছে। অনেকদিন ধরেই বেশ কিছু কাজ তার নখদর্পণে। বাবা বাইরে গেলে তার মহান দায়িত্ব। তার ছোট, বড়ো মিলে তিনটে অ্যাক্যুয়ারিয়াম । কত রকমের মাছ!

সান্তাক্লজ প্যারট, শূড়ওয়ালাটা এ্যারোয়ানা, কালো রঙের অস্কার, ফ্লাওয়ার হর্ণ, সেভারাম, গোরামি, ব্ল্যাক জাগুয়ার ফিস, কালোসাদা গোল্ডেন ফিস, কালারফুল টেট্রা ----- এসব মাছেদের খেতে দেওয়া। কচ্ছপকে রোদে দেওয়া। জল পাথর দিয়ে তার খাবার দেওয়া। কার কোনটা খাবার সে ঠিক জানে । আবার পেট ডগ রেম্বকে সঙ্গ দেওয়া। তার ফাঁকে ফাঁকে কাগজ কলম নিয়ে বসে যাওয়া। না, পড়াশোনা নয়। আঁকা। সবথেকে তার প্রিয় সাবজেক্ট। আঙুলে ফাঁকে পেনসিল নিয়ে আঁকা চলতেই থাকে।

এ হেন অবস্থার পর তার একটু মনটা ফ্রেস করতে হবে। তাই বললাম --চলো একটু বাইরে যাই।

গৌহাটি ভেটাপাড়া। এখানে রাস্তার নাম পথ দিয়ে হয়। আমরা যেখানে আছি কৃষ্ণচূড়া পথ।

পাঁচতলা ফ্ল্যাট । লিফট আছে। তাই উপরে উঠে গেলে

চারিদিকের পাহাড় হাতছানি দেয়। গাছগাছালিতে ভরা জায়গাটির সাথে ভাব আছে বেশ কিছু প্রাণীর।

বাঁদর খুব ঘোরাঘুরি করে দল বেঁধে। তাদের বরাদ্দ আছে কিছু না কিছু খাবার। কাক চড়াই ঘুঘু ডাকাডাকি করে। আনন্দ কাকে বলে এদের থেকে শিখতে হবে।

এই আনন্দের ভিতরে আছে ছবিতে থাকা ডাইনোসর। কত রকমের ডাইনোসর। সব নাম ফটাফট বলছে। আমি তো উচ্চারণ করতে পারছি না । নাম তো তারপর। কৃষের ভালবাসার জগতে এই ডাইনোসর অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ড্রইং বুকের পাতায় পাতায় কত রকমের ডাইনোসর ।

রোদের তেজ না থাকায় বের হলাম ছাতা ছাড়াই।

গেট পেরোতেই হাতটা টান দিয়ে বলল, ওদিকে যেও না। এদিকে এসো। আবার সেদিকে যখন একটু ধার দিয়ে হাঁটছি, আসলে স্কুটারগুলো পর পর আসছে । একটু সাবধানে চলার চেষ্টা। হঠাৎই বলে উঠল— অত ওদিকে এসো না। দেখছ না বিষাক্ত গাছ। ইনফেকশন হয়ে যাবে গায়ে লাগলে।

বাঁ হাতে হাই ড্রেন, তার পাশে দিয়ে সব আগাছা হয়ে আছে। ডান দিকে সরু এক ফালি নদী নাম বশিষ্ঠ, পাড় ঘেঁষে বড়ো ছোট গাছ। মাটির পাড়। তাই তার অত চিন্তা। আমার হাতটা ধরে আমাকে নিয়ে চলেছে ।

বললাম বেশি দূর যাবে না কেমন ? বলল ---চিংড়ি মাছ আর ক্র্যাব কিনব না ?

--আজ তো মা বারণ করেছে। কী করে যাব । আমি রাস্তা চিনি না ।

---চলো তো আমি আছি ।

বিশাল সাহস দিচ্ছে। আমি আছি। ভেটাপাড়ার কৃষ্ণচূড়া পথ পেরিয়ে হাঁটছি দু'জনে। ছোট ছোট কথা বলতে বলতে। দু'পাশের দোকানপাটগুলো বন্ধ। কেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

উল্টোদিকে রাস্তার পারে দেখা গেল অনেক ডাব বিক্রি করছে । কৃষের জন্য ডাব নেব। তাই বললাম ----চলো ওই ফুটে যাই । ওইদিকে গিয়ে ডাব কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই।

একটু জোর দিয়ে বলে উঠল---না না, এখন বাড়ি যাব না ।

আমার মনে হল তাই তো, এটুকুতে তো ওর মন ভরে না কি ।

বললাম ---রাস্তা চিনি না। মা চিন্তা করবে।

আরো জোরে বলে উঠল --আরে ! তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ। ভয় নেই ।

বলেই বলল ---এই দেখো আমার স্কুল। দেখেছো? বচপন স্কুল।

বললাম ---বাঃ বেশ কাছে তো ।

বলল --এবার তুমি আসতে পারবে? দেখেছো তো আমি তোমাকে আমার স্কুল চিনিয়ে দিলাম।

তাই তো ! জীবনে নিজে চিনে অন্যকে চিনিয়ে দেওয়ার আনন্দ অনুভব করছে সে । আমারও খুব আনন্দ হল।

এবার আরো সচেতন সে।

--- দেখো, সাবধানে এসো।

ফুটপাথের যাত্রাপথে অসুবিধা থাকায় কৃষ একথা বলে উঠল। ভীষণ নজর। আমার অসুবিধা হতে পারে ! প্রকৃত গার্জিয়ান !

রাস্তায় নেমে আসতে হল। ছুটে যাওয়া গাড়ির তীব্রতা বেশি।

যাই হোক, তাড়াতাড়ি আবার ফুটপাথে উঠে এলাম দু'জনে। আমার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। তার এই আনন্দ আমার কাছে অপার্থিব আনন্দ। শিশুর সঙ্গ মন ভালোর জন্য। সে বড়ো হচ্ছে। মাঝে মাঝে কাপড়ের আঁচল দিয়ে ওর মুখের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছি। এত অসুবিধা, ওর কাছে যেন সব তুচ্ছ। এগুলো পাত্তাই দিচ্ছে না। ছোট ছোট পায়ে হেঁটে চলেছে।

কিছুদূর যেতেই আনন্দ আরো উছলে উঠল।

-----এই দেখো আমার ড্রইং স্কুল।

দাঁড়াও, দাঁড়াও-- ঠিক করে তোমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিই।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল---- এই যে দেখছ না রাস্তাটা এই দিক দিয়ে। দু'জায়গায় ক্লাস হয়। আর ওখানেই গানের ক্লাসও হয়।

জিজ্ঞেস করলাম --কোনটা বেশি ভালো লাগে?

বলল—আমার গান একদম ভালো লাগে না।

— কেন শিখছ তবে ?

— গানের দিদি তো জোর করে ভর্তি করেছে। ঐ যে আমি খুব গুনগুন করি তাই শুনে।

এই ফাঁকে একটা কথা বলি।

ওর সত্যিই ভালো লাগে না। একদিন গান করতে করতে দুষ্টুমি করছে দেখে গানের দিদি ওকে বকা দিয়েছে। উল্টে সে দিদিকে বলছে,

—তুমি আমাকে বকছ ? আমার মা কিন্তু আমাকে একদম বকে না। সব সময়ই বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলে।

বেশ মজা লাগল দিদিমণির।

তার গান করতে বসলেই ঘুম পায়, হাই ওঠে, অন্য ছেলেমেয়েরা খুব মজা পায়। এ নিয়ে হাসাহাসি করে। এ ব্যাপারটা কিন্তু কৃষ নিজেও খুব এনজয় করে ।

-----কেন ভালো লাগে না জানো গান করতে?

খালি খালি সা রে গা মা পা ধা নি সা করতে বলে। একদম বাজে লাগে।

--- ঠিক ঠিক । একদম ঠিক । ভালো না লাগারই কথা। তবে তুমি কি জানো এটা না করলে গান শেখা যায় না ঠিক মতো !

হঠাৎই ধরে থাকা হাতটায় এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল

--- দেখো দেখো আমার গানের দিদি আসছে। দেখো!

দুনিয়ার আনন্দ এখন তার চোখে মুখে। যেন বিশ্ব জয় করছে!

আর সেই সাথে তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে এটাতে তার যেন আরো আনন্দ।

--এই দেখো আন্টি !

বললাম ---বাঃ খুব ভালো। দেখা হল।

একটু কথা হল। তার তাড়া থাকায় বেড়িয়ে গেল।

এবার তার কী আনন্দ। আন্তরিক ভাবে বলছে,

—দেখলে তো ! আন্টি কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসে।

মজা করে বললাম --'সে আবার কী রকম! তোমাকে বকে, আবার তোমাকে ভালবাসে !

ততোধিক উৎসাহ নিয়ে বলল—তুমি বুঝতে পারছ না ! খুব ভালোবাসে।

আসলে ও বোঝাতে পারছে না কেন ওকে ভালোবাসে।

গল্প করতে করতে ফুটপাথ, রাস্তা পেরিয়ে কখন যে আমরা আধ ঘন্টা হেঁটে বেলতলায় পৌঁছে গেছি। দু'জনেই বুঝতে পারিনি।

অনেকগুলো রাস্তা এখানে। তেমনি যানজট। রাস্তাগুলো যে খুব চওড়া এমন নয়। ট্রাফিকের বালাই চোখে পড়ল না। তাই বললাম—'চলো এবার বাড়ি যাই। হাতটা চেপে ধরে বলল--- না না, আর একটু চলো। এখানে ক্র্যাব পেয়ে যাব। চলো।

এবার আমি ওর হাতটাকে শক্ত করে ধরে একটা রাস্তা পার করলাম। মানে যে ফুটে ছিলাম তার বিপরীত ফুটে গেলাম।

রাস্তা ক্রশ করে এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

বলে উঠল --- চলো, দাঁড়ালে কেন ?

বললাম --দেখো, রোদ্দুর উঠে গেছে খুব। এখন বাড়ি যাওয়াই ভালো। মা চিন্তা করবে। অনেক দূর চলে এসেছি না ?

একটু অভিমানের সুরে বলল—তাহলে আমরা কিনব না ?

বললাম -এখানে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই চলো কিনে নিই।

—ঝংকার দিয়ে বলে উঠল - না না , চলো আর একটু দেখে নিই।

হঠাৎই একজন তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল— কী ব্যাপার! তুমি এদিকে কোথায় যাচ্ছ?

চটপট উত্তর—বাজারে।

—কী কিনবে?

—ক্র্যাব।

—ক্র্যাব তো এদিকে পাবে না। ঐ যে ওদিকে বাজার।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম --আসলে একটু ঘুরতে বেড়িয়েছি আমরা। যদি ক্র্যাব পাই !

এখানেই তার পুরানো অভ্যাসের কথাটা বলে রাখি।

সানডে মানেই জ্যান্ত কিছু তার ঘরে আনা চাই। তা সে গঙ্গা ফড়িং হোক বা ল্যাটা মাছ। পলুপোকা বা ক্র্যাব। সে নিজে গিয়ে কিনে আনবে বাবার সাথে। আর তারপর চলবে তাদের সাথে খেলা। আর অক্কাপটল হলে চিৎকার করে কান্না। কিংবা মা যদি বিরক্ত হয়ে বলে বাইরে ছেড়ে আয়। তাহলেও দেখার মতো অবস্থা। তখন বলতে হয় তুমি যেমন তোমার মাকে ছাড়া থাকতে পারো না, ওর ও তো মাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ওর মাও তো কত কাঁদছে ওর জন্য।

তখন ঠাণ্ডা। 'চলো নদীতে ছেড়ে আসি বাবা। ওর মা খুব কাঁদছে'।

যাদের সাথে দেখা হয়েছিল তারা ওর খুব পরিচিত, কথায় বোঝা গেল।

—আজ ড্রইং ক্লাসে যাচ্ছ তো ?

ও কিচ্ছু উত্তর করল না দেখে জিজ্ঞাসা করল এটা কে ?

বলল—টুটু।

—আমি বলে উঠলাম --এটা ওর ডাক।

জিজ্ঞেস করল—দিদা না ঠাকুমা ?

আমি বললাম, দিদা। পাশে থাকা ছোট্ট মেয়েটা বলে উঠল এটাও আমার দিদা। দু'জনের সে কি আনন্দ। দু'জনে একটু হাতে হাত মিলিয়ে নিল।

দৃশ্যগুলো ভীষণ সুন্দর! শিশু মন!

এবার বললাম, কী করবে এবার ? চলো ওই ফুটে যাই। একটা ডাব খাবে?

মুখে কিছু বলল না।

রাস্তাটা ক্রশ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আর আমারও একটু ভয় ভয় করছিল। এত দ্রুত গতিতে গাড়িগুলো যাচ্ছিল !

এবার খুব দেখেশুনে পা বাড়ালাম। সংশয়ের মাঝে দুটো রোড ক্রশ করে ঠিক মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালাম।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম ----অসমীয়া ভাষায় কথা বলতে পারবে তো? আমি কিন্তু পারব না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল— হ্যাঁ হ্যাঁ, ও কোনো ব্যাপার না।

ওর কাছে ব্যাপার না। আমার কাছে তো জটিল ব্যাপার। আমি তো খটমট উচ্চারণ বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারি না।

পরে বুঝলাম, সবই চলে। নিজের জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসতে চায় না কেউ। কিন্তু যারা বিজনেস করতে এসেছে তাদের সবেতেই অভ্যস্ত হতে হয়।

ছাতার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এক মহিলা ছিলেন বসে একটা চেয়ারে। চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বসতে বললেন। কৃষের একটু রেষ্ট। কৃষ আরাম করে বসল বটে কিন্তু এত রোদ্দুর উঠে গেছে ঠিক সহ্য হচ্ছিল না।

মহিলা জিজ্ঞেস করল— কী চাই?

আমি বলে উঠলাম—তুমি বাংলা জানো ?

বলল— কী নেবে ?

বললাম—ডাব নেব। আখও নেব।

—কুহিয়ার ?

থমকে গেলাম। কোনটাকে বলছে রে বাবা !

যাই হোক, সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতে বুঝতে পারলাম আখ।

একটা ডাব কৃষকে খাওয়ার জন্য কেটে দিতে বললাম। আরেকটা ডাব মুখটা ছুঁলে প্যাকেট করে দিতে বললাম। কৃষের জল পিপাসা পেয়েছিল। আরাম করে খেল। তারপর আখ নিয়ে দাম দিয়ে বাজারের দিকে চললাম।

এখানে একটু জানাতে ইচ্ছে করছে ডাবের দামটা। একটু বড়ো যে ডাব তার দাম নিল একশ কুড়ি টাকা। আর তার চেয়ে একটু ছোট ডাবের দাম নিল একশো টাকা।

সকলের কাছে একইরকম দাম নিচ্ছিল। আমাদের লাইন ছিল চার জনের পর। তাই বুঝতে পারলাম।

আমার খুব পা ব্যথা করছিল। আমি একদম হাঁটতে পারি না। সেক্ষেত্রে এতটা হাঁটা !

বললাম—'চলো বাড়ি যাই। আজ আর বাজারে ঢুকতে হবে না। আমার খুব পা ব্যথা করছে। দেখো, রোদ্দুর লাগছে।

তার গভীর ইচ্ছার কাছে সব ফেল। দু'হাত দিয়ে আমার পেট জড়িয়ে ধরে বলল—আমি তোমাকে ধরে আছি। দেখো, এবার আর ব্যথা করবে না। তুমি হাঁটতে পারবে। কী আরাম হচ্ছে না ?

ওর কাণ্ড দেখে আমি হতভম্ব।

কিছুক্ষণ পর পর জিজ্ঞেস করছে।

—-এবার পারছ তো হাঁটতে ? এই দেখো আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

সত্যি এই ভালোবাসার কাছে সব ব্যথা বেদনা উধাও।

ও আমাকে ধরে আছে দু'হাতে। সেই স্পর্শ একদম মিশে গেছে অন্তরে। আমি ধরে আছি বাইরে। অসাধারণ একটি সময়ের প্রতিবেদন। যা বাইরে মনে হলেও বাইরে নয়, এ এক সুখের অনুভূতি। যা কেবল অনুভব করা সম্ভব, লিখে বোঝানো যায় না।

রোদ্দুর লাগছে এই ভেবে একদম কাছেই একটা দোকান থেকে একটা টুপি কিনব বলে ঢুকলাম। দাম কত ? দেড়শো টাকা। একবার মাথায় দিয়ে তো ফেলে দেবে। গায়ে লাগে। বারগেনিং করতে পারি না। যাই হোক কষ্টের থেকে রেহাই পেতে নিলাম। কৃষ কালার পছন্দ করে নিল। দেখতে বেশ। জিনস কালার।

এইবার খোঁজ সেই চিংড়ি আর ক্র্যাবের। বলেছিল চিংড়িও যেন জ্যান্ত হয়।

বললাম—আগে তো পাই। তারপর দেখছি।

ও তো আমাকে ওই ভাবে জড়িয়ে রেখেছে।

লক্ষ্য একটাই।

একবার করে বলছি এবার চলো, নেই।

তার চোখ ছুটে চলেছে। যে ফুটে ছিলাম সেখান থেকে অন্য ফুটে এলাম। এবার এই ফুট থেকে ওই দিকেও নজর রাখতে লাগলাম।

খুব সুন্দর বাজার। কত রকমের শাকসবজি, ফল। বিভিন্ন ডাল আরো বহু কিছু।

যা দেখছি সব ভালো লাগছে দু'জনের। কিন্তু কিনবার পয়সা থাকলেও বহন করবার ক্ষমতা না থাকায় সব বাতিল করতে হল।

হঠাৎই বলে উঠল—চলো, চলো দেখতে পেয়েছি।

ও পেয়েছে। কিন্তু আমি পাইনি তখনো।

আমি এদিক ওদিক দেখছি।

বলে উঠল —ওই দিকে চলো। ঠিক আছে রাস্তা ক্রশ করলাম। একটু পেছনে সরে এলাম।

ও-ই রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। এবার নজরে এল। একটু ঢালের দিকে বেশ কয়েকটা পাত্র সাজিয়ে বসে আছে। ওখানেই কাঁকড়াগুলো দেখে ও মহাখুশি। বলে উঠল ---দেখেছ ? বললাম এখানে আছে। এই দেখো স্নেল।

আমি বললাম, কয়েকটা কাঁকড়া নিই। কেমন?

ছেলেটা খুব বোঝে। বলল ঠিক আছে। ছ'টা কাঁকড়া নিয়ে চলে এলাম। ঠিক পাশেই আর একজন নিয়ে বসেছে।

----দেখো, দেখো। ছোট, ছোট। আমার ও যে নিতে ইচ্ছে করছিল না তা না। ওখানকার গন্ধটা আর নিতে পারছিলাম না। তাই বললাম, এবার চলো। আবার পরদিন আসব।

রাজি হল বটে। কিন্তু মন পড়ে থাকল চিংড়ির খোঁজে।

বললাম--- এখন তো সর্বদিকে খারাপ অবস্থা। তাই না? আমার পা ব্যথা, রোদ্দুর লাগছে, তোমার লাঞ্চের টাইম হয়ে গেছে। তারপর দেখো আমি কিছু বইতে পারছি না।

বলল—ঠিক আছে। বাড়ি যাই চলো।

ওটুকুতেই মহাখুশি। এবার আর হাঁটাহাঁটি নয়। একটা রিক্সা ডাকলাম। দু'জনে উঠে বসে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরলাম মনের আনন্দে।

--- বলতো কেমন সফর হল?

বলল--- দারুণ। মাকে গিয়ে বলব। মা খুশি হবে।

—অবশ্যই বলবে।

এখন এই ঘটনা লিখতে লিখতে ওকে শোনালাম। দেখো ঠিক আছে কি !

বাচ্চাদের কথা। বাচ্চাদের ভালো তো লাগবেই। খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল ---

সেদিনের ঘটনাটা ? সবটা লিখলে তো। তাই না?

❋❋❋

সম্পর্কের হাত

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

হাসপাতালের বেডে শুয়ে মালিনী আঁকুপাঁকুভাবে খুঁজলো অনেককেই। ক'দিন হল সে হাসপাতালের কেবিনে রয়েছে অসুস্থ হয়ে। আপাতত খানিকটা সুস্থ হতেই তার খুব ইচ্ছা করতে লাগল, ছেলে আর আত্মীয়দের দেখতে। তাঁদের ভরসার হাতকে ছুঁতে। যদিও প্রথমে আসল লোকটাকে পাওয়ার ইচ্ছা করে সব বিবাহিত মহিলারই। কিন্তু মালিনীর স্বামী বাসব তো বহুদিন হল মারা গেছেন। তাঁকে এই জীবনে আর দেখতে পাবেন না তিনি। দেখতে পাবেন দুই ছেলে আর মেয়েকে। আর নাতি নাতনিদের। মেয়েটাই ভরসা। সুধা রোজ আসে। চাকরি করে, ছোট্ট মেয়েটাকে সামলায়। সংসারের কাজ সারে। তারপর সকাল বিকাল এই হাসপাতালের কেবিনে তার হাসি মুখটি মালিনী দেখতে পায়। পাশে এসে বসে, মাথায় হাত বোলায়। ভরসা দেয় ভালো হয়ে বাড়ি ফেরার। মেয়ের দৌলতেই জামাই অনির্বাণও মাঝে মধ্যে আসে। তার অফিসে খুব চাপ কিনা। সেও এসে হাসি মুখে বলে বাড়ি ফিরতে হবে মা আপনাকে।

একদিন মেয়ে ছোট্ট নাতনি দোলনাকে এনেছিল। দোলনা মিষ্টি কথায় মন ভরিয়ে দিয়েছিল মালিনীর। হতাশ মালিনী বাঁচার নতুন করে উৎসাহ পেয়েছিল তবে ছোট বলে তাকে বারবার আনতে নিষেধ করেছে সে নিজেই। ছেলে দুটো একবারই এসেছিল। তাদের সময়ের বড় অভাব। দুই বউমাও চাকরি করে। একদিন মাত্র এসেছিল। ক্লান্ত হয়ে বলেছিল তারা, মা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন। মালিনী নিজেই বলেছিল, তোমরা সকলে চাইলে ভালো হয়ে উঠবই। তারা কোনওদিন তাদের ছেলেমেয়েকে আনেনি। যদি শরীর খারাপ করে। তবে মালিনীর খুব দেখতে ইচ্ছা করে দুই নাতিকে। নাতিরা আসতে চায় কিনা সে অবশ্য বলতে পারবে না। তাদের মন তেমনভাবে সে জানে না। কেবিনের একা ঘরে এসব কথাই ভাবছিল সে। যে মেয়েটিকে হাসপাতাল তার জন্য সবসময় নিয়োগ করেছে এই মুহূর্তে সে কেবিনের বাইরে বসে অন্য সেবিকাদের সঙ্গে গল্প করছে। তাদের কণ্ঠস্বর মালিনী শুনতে পাচ্ছে। সে জানে, এবার সুধা এসে পড়বে। এসেই জিজ্ঞেস করবে মা কেমন আছো? তারপর অফিস ব্যাগ থেকে সন্দেশের প্যাকেটটা বার করে সেবিকার নাম ধরে তাকে বলবে, আমার সামনে মাকে খাইয়ে দাও। তারপর নানা রকম কথা শুরু করে মন ভালো করে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

বলতে বলতেই সুধা ঘরে ঢুকে বলল, মা কেমন আছো? মালিনী হেসে বলল, ভালো। তারপর মিনিট পাঁচেক বসেই মেয়েটিকে ডেকে সন্দেশ দিতে বলল। আস্তে আস্তে খেতে লাগল মালিনী। সুধা বসে বসে দেখল। তারপর বলল, দাদারা কেউ এসেছিল মা? মালিনী

বলল, ছেড়ে দে, হয়তো সময় পায়নি তারা। সুধা ক্ষেপে গিয়ে বলল, মাকে দেখতে সময় করতে হয় নাকি ! ইচ্ছা থাকলে হয়ে যায়। সেই জন্যই ঝাড় দিয়েছিলাম তোমার ভর্তির দিন। মালিনী বলল, কেন, কী হয়েছিল? সুধা বলল, পরে শোনাব তোমায়। এখন ভালো হয়ে বাড়ি তো এসো। মালিনী চুপ করে গেল। সে জানেনা কী হয়েছে। সুধা বলতে চাইছে না। সুধা কেবিনের জানলার কাছে গেল। জানলা বন্ধ থাকলেও বাইরেটা দেখা যায়। ওই দূরে রাস্তাটা চলে গেছে। সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। মানুষের জীবন। এভাবেই তো শৈশব থেকে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলে জীবন। তারপর একদিন ব্রেক কষে। ভাঙতে থাকে সুন্দর শরীরটা। ব্যাধি বাসা বাঁধে। ক্রমে দুর্বল আর নিস্তেজ হতে থাকে। তার মনে পড়ল মায়ের ভর্তির দিনের কথা। দুই দাদার কেউ হাসপাতালের খাতায় সই করতে চাইল না। শেষ পর্যন্ত সুধাই করল। তারপর মাকে ভর্তি করে দাদাদের কাছে ডেকে বলল, টাকা দেওয়ার ভয়ে এই কাজ করলি নাকি বউয়ের ঝাড় খাওয়ার ভয়ে? বড়দা সুশান্ত ধমকে বলল, সুধা, তুই আমাদের চেয়ে ছোট। সুধা বলল, জানি তা। বাবার বেলাতেও তোরা ভয় পেয়েছিলি। মায়ের বেলাও পেলি। মনে রাখিস, আমি আছি। তোরা না হলেও চলবে। আর মনে রাখিস, তোরা বাবা হয়েছিস। পিছনে একজন সব নজর রাখছে। এই কথায় তুলকালাম হয়েছিল ওদের পরিবারে। সুধা অবশ্য পরোয়া করেনি। শেষ পর্যন্ত দুই দাদা আর বৌদি হাসপাতালে এসেছিল। তবে ওইটুকুই। মাকে এখন সে এসব বলতে পারবে না। মা চিন্তা করলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

সুধা আনমনে এসব ভাবছিল। মেয়েকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মালিনী বলল, কী ভাবছিস মা? এদিকে আয়। সুধা বলল, কিছুই না। বলেই মায়ের বেডের কাছে গেল। মালিনী সুধার মাথায় হাত রেখে বলল, ভাবিস না, আমি ফিরবই। সুধা হেসে বলল, তারজন্যই তো এত কাণ্ড মা। যতদিন বাঁচো ততদিনই ভালো। তারপরই সেবিকাকে ডেকে বলল, সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি চললাম। কাল আসব সকালে। আর আপনি মাকে একটু নজর রাখবেন। জানি আপনাদের নজর থাকে। তবু বললাম। মায়ের গায়ে হাত দিয়ে বলল, মা আসছি। খুব ভালো থাকো। হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই তোমার ছুটি হয়ে যাবে। মালিনী হাসলেন। সুধা হেসে বেরিয়ে গেল।

কাল ছুটি মালিনীর। রাতেই যখন ডাক্তারবাবু বলে গেলেন তখন থেকেই মালিনীর বুকের ভেতরটা কেমন ছটফট করছে বাড়িতে যাওয়ার জন্য। আবার সেই চেনা পরিবেশ। সেই বাড়ি, সেই রাস্তা। সেই প্রতিবেশীরা। মালিনীর মনে পড়ল, বাড়িটা তার ইচ্ছাতেই বাসব করেছিল মফস্বলে। মনের মতন করে বাড়িটা সাজিয়েছিল মালিনী। ওই বাড়ির উঠানে এক সময় দুই ছেলে দৌড়ে বেড়িয়েছে। পড়ে গেছে। একবার তো বড়টা উঠানে পড়ে গিয়ে হাতটাই ভেঙে ফেলল। ছোটটাও কম যায় না। একবার পড়ে দাড়ির কাছটা কেটে গেল। সেলাই দিতে হয়েছিল। সুধাই বা কী কম! উঠানের কলতলায় পড়ে পা ভাঙল। মেয়ে একমাস বিছানায়। উফ, কী কাণ্ড। কত প্রশ্ন। কত ভয়। কত কথা। নিজের মনেই হেসে ফেলল মালিনী। সময় কত তাড়াতাড়ি চলে যায়। অথচ স্মৃতিগুলো কী জীবন্ত থাকে ! আজ ছেলেমেয়েরা কত বড়।

সকাল হয়ে গেছে। বেলা বাড়ছে একটু একটু করে। আর মালিনী ততই চঞ্চল হয়ে উঠছে। তার আর তর সইছে না। কতক্ষণে বাড়িতে পা দেবে। এমন সময় তার বড় ছেলে ঢুকে মা বলে ডাকতেই চমকে উঠলেন মালিনী। তার ছেলেটি এসে মালিনীর পাশে দাঁড়াল। ঠাকুমা তোমার ছুটি হয়ে গেছে? মালিনী হেসে বললেন, হ্যাঁ বাবা। তোমরা আসবে বলেই তো বসে আছি। পরমুহূর্তেই ছোট ছেলে ঢুকে মা বলে ডাকল। তার ছেলেটিও সঙ্গে এসেছে। তারও প্রশ্ন কখন যাবে ঠাকুমা? সুধা গাড়ি থেকে নেমে হাসপাতালের গেটে ঢুকতেই তার নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। চমকে তাকিয়ে দেখল, দুই বৌদি দাঁড়িয়ে আছে। সুধা এগিয়ে গিয়ে বলল, তোমরা এসেছ? তারা সুধার হাত ধরে বলল, আমাদেরও তো মা সুধা? সুধার বুকের ভেতর আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। বলল, দাদারা আর ছোটগুলো কোথায়? ওরা বলল, ওপরে। এমন সময় দোলনাকে দেখে ওরা কোলে তুলে নিল।

সবাই মিলে কেবিনে ঢুকতে কিছুটা ঘাবড়েই গিয়েছিল মালিনী। সব রেডি হল। মালিনীকে একটা চেয়ারে বসিয়ে হাসপাতালের গেটে নিয়ে এলেন হাসপাতাল কর্মীরা। এবার সে গাড়িতে উঠবে। ঠিক সেই মুহূর্তে মালিনী দেখতে পেল, সব হাতগুলো তার দিকে এগিয়ে এসেছে। ঠিক কার হাত ধরবে ভেবে পেল না সে। সব হাতগুলোই তার নিবিড় সম্পর্কের। শেষ পর্যন্ত সুধা আরো কাছে এগিয়ে দিল হাত। সুধার হাতটা শক্ত করে ধরে মালিনী গাড়িতে উঠার সময় অনুভব করলেন, সব হাতগুলোই তাকে স্পর্শ করে আছে। মালিনীর বুকে অদ্ভুত এক স্নেহের ঢেউ তোলপাড় করছে। গাড়ি বাইপাস ধরে হু হু ছুটছে বাড়ির দিকে।

অত্যাচারী পুরুষ সাম্রাজ্য

দীপু মুখার্জি

মেয়েটির নাম সমাপ্তি - বাপ, মায়ের একমাত্র সন্তান-সম্বন্ধ এনেছে ঠিক। সমাপ্তি এম.এ করছে। সে চেয়েছে পড়াশোনা করে স্বনির্ভর হতে । ঘটক যে সম্বন্ধ এনেছে, খুবই ভালো বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে। ছেলেটা সরকারি চাকরি করে। ফ্যামিলি ভালো। সমাপ্তির মা বলল— দেখ মা, চাকরি করলেই হবে না তোকে পরের ঘরে যেতেই হবে। তোকে সৎপাত্রের হাতে দিতে পারলে আমরা মরেও শান্তি পাব। তুই কি বুঝিস না সেটা? তুই আর না করিস না ঘটক অনেক ডায়লগ দিয়ে গেল।

শুভ দিন দেখে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল- যাক শ্বশুর, শাশুড়ি খুবই ভাল। মেয়েটির স্বামীর নাম চিন্ময় -চিন্ময় অফিস থেকে বাড়ি এসেছে। শাশুড়ি বললেন—বৌমা ছেলেকে চা, জল খাবার দাও। হ্যাঁ মা যাচ্ছি। সমাপ্তি ঘরে গেল। তার বর সোফায় বসে পা দুটো চেয়ারে তুলে দিয়ে বলছে দে জুতো খুলে দে। সমাপ্তি ভাবল, ভদ্র লোকের ছেলের মুখে একি কথা এবং কী ভাষা! যাক সেই দিনটা তো গেল। এবার শাশুড়ি বললেন— বৌমা এবার তুমি রান্নাঘরে যাও। বেশ কদিন এভাবে চলছে-একদিন সমাপ্তি শাশুড়িকে বলছে অনেক দিন মা বাবাকে দেখি না, একদিন বাপেরবাড়ি যাব ?

যাবে যাও ছেলেকে বলে যেও –
এবার স্বামীকে বলল, আমি একদিন
বাড়ি যাব ?
যাবে যাও ছেলেকে বলে যেও –

এবার স্বামীকে বলল, আমি একদিন বাপেরবাড়ি যাব, তুমিও যাবে? আমি তো যাবই না তুমি যাবে যাও। কিন্তু আসার সময় ২০ হাজার টাকা আর একটা বাইক নিয়ে আসবে।

না আমি বলতে পারব না। কদিন আগে আমার বিয়ে দিল, অনেক দিন হয়েছে বাবা অবসর নিয়েছে।

চিন্ময় কথা বলছে মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে মদের। ঢুলছে আর বলছে— যদি না আনতে পারিস তাহলে ওখানে কাগজে মোড়া যেটা আছে ওটা খেয়ে নে। ল্যাটা চুকে যাক। সমাপ্তি বলছে তুমি ঢুলে পড়ে যাচ্ছ তো।

—এই সতি পনা দেখাস না।

সমাপ্তি ঠোঙ্গায় মোড়া ওটা নিয়ে হাতে নাড়াচাড়া করে ওটা খেয়ে নিল-

খাবার সঙ্গে সঙ্গে সোফার উপর পড়ে গেল। চিন্ময় ভাবল মরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত, পা ধরে সদর দরজা খুলে বাড়ির অদূরে একটা পুকুর পাড়ে ফেলে এসে বিছানায় নাক টেনে ঘুমোচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমাপ্তির একটু জ্ঞান এসেছে, ভাবছে আমি কোথায়? গায়ের কাপড় নেই। চুল আলুথালু। চোখে অন্ধকার দেখছে ও ভাবছে এখন আমি কী করি! আস্তে আস্তে পুকুরের পাড় ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখতে সামনে একটা দরজা গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে ভেতর থেকে বলছে—

কে? এত রাতে কে ডাকছে –

—আমি, দরজাটা একটু খুলুন না!

দরজা খুলে ভদ্রমহিলা বলছে—

—তুমি কে মা? আলুথালু বেশে !

—আমি অবিনাশ দাসের বাড়ির বৌমা।

—সর্বনাশ! তোমার এই অবস্থা কে করল?

—আমার স্বামী ।

—এসো মা, আমার ঘরে এসো। তোমার বাড়ি কোথায় বল ?

ও সব বলল।

সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহিলার স্বামী থানায় ফোন করলেন।কিছুক্ষণের ভিতর পুলিশ এসে সমাপ্তির স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল – এই হল সমাজের ছবি। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের কোন সম্মান নেই ।

পতঝরের দেশে

অনিমেষ

পতঝর বিদায় নিয়েছে মধুবনীতে
দেওয়ালে আঁকা পটচিত্ররা স্থবির।
মৈত্রেয় এসেছিলেন এই পথে,
নদীর চরে সাদা বালির ঝিলিক,
ভাসমান দুটো শঙ্খচিল,
জীবন ভাসমান অনন্ত ডানায়।
মধুবনীর বিস্তীর্ণ রুখু জমি
একটা প্রাচীন শমীবৃক্ষ,
নদীর শীর্ণ স্রোত, পরিত্যক্ত সরাই,
জনহীন নির্জন শ্মশান
এসব কিছুর সাক্ষী।
এই পতঝরের দেশ মধুবনী জানে।

বোধন

দেবাশিস দত্ত

শরতের আকাশ
দুলছে যে কাশ।
মৃদুমন্দ বাতাস
আগমনীর দিচ্ছে আভাস।

উড়িয়ে এল চুল
ছুটে চলে কিশোরী বকুল।
চারদিকে শিউলি ফুল
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়া সুমধুর।
ঢাকের বাদ্যিতে বাজে আগমনী সুর।

চারটে দিনের জন্য কেন মা
ওদের মুখে হাসি ফোটে ?
প্রসাদী ভোগের লাইনেতে দাঁড়িয়ে
ওদের সবার অন্ন জোটে ?
আর, বছরের অন্যান্য দিনগুলো
কেন ওরা এ - প্রান্ত থেকে
ও - প্রান্ত ছোটে ?

পেটের জ্বালায় দিশেহারা ওরা
হাত বাড়ালে তিরস্কার জোটে।
বছরের অন্যান্য দিনগুলোতে
কেন থাকে ওরা ক্ষুধার্ত পেটে ?
আমার কিছু প্রশ্ন আছে
মাগো ! তোমার কাছে।
জগৎজননী মাগো তুমি
উত্তর দিয়ে নিরসন করো আমাকে।

পাপীদের আজ বাড়বাড়ন্ত
নিষ্পাপদের দু'বেলা দু'মুঠো জোটে না অন্ন।
নিরোপরাধীকে দেখে মুখ ঘোরায় সমাজ
অপরাধীকে মাথায় নিয়ে নাচে।
তথাকথিত শিক্ষিত হয়েও
জ্ঞান- বিবেক- বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে,
কূপমন্ডুক হয়ে এরা বাঁচে।
একি সমাজ গড়লে মাগো,
অসুর আর নারদের ছাঁচে।

আচ্ছা মা তুমি কি খুশি হও
চারটে দিন বাপের বাড়িতে এসে ?
কি মনে হয় বলো তো মা
অসহায় মুখগুলো দেখে ?
তুমি কি পারো না হাসি ফোটাতে
ওদের অসহায় মুখে ?
জগৎজননী মা যে তুমি,
তুমি চাইলে পরিত্রাণ করতে পারো
সবকিছু থেকে।

বলো তো মা, ওদের দেখে
জল আসে না তোমার চোখে।
মা ওরাও তো তোমার সন্তান
কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর
মতো তোমার কাছে।
অবহেলা - ঘৃণা - তিতিক্ষা
নিয়ে যে সমাজে ওরা বাঁচে,
বুঝিয়ে দিও, মাগো !
তোমার আদালতে তাদের জন্য,
বিচার তুলে রাখা আছে।

পূর্বজন্ম জানি না মাগো,
পরজন্মে বাঁচি না।
একটাই জন্ম, একটাই জীবন,
পরজন্মের ধার ধারি না।
সুকৃতি ও সুকর্মের দ্বারা
করে যাব আপন কীর্তি স্থাপন।
মাগো ! স্বর্গরাজ্য যখন অসহায় হল
শক্তিরূপিনী হয়ে করলে অসুর নিধন।
সমাজের বুকে ধরেছে আজ
অবক্ষয়ের পচন।
ওদের হাসিতে সূচনা হোক মাগো !
তোমার আগমনীর বোধন ।।

অজ্ঞান অন্ধকারে

অরুণাংশু বৃক্ষ

আমার কোনো ঠিকানা নেই
আমার ঠিকানা পথঘাট, খোলা মাঠ,
খোলা আকাশের নিচে এই পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
আমি রিক্ত নই, আমি নিঃস্ব নই,
আমি ফসল ফলাতে পারি না।
আমি কৃষি কাজ জানি না।
আমি মনে মনে শব্দ সাজাই
জমিতে বীজ ছড়াই, দুঃখ বুনি,
লিখে রাখি কিছু শব্দসমাহার, আমি কবি নই,
গৃহস্থরা ফসল ঘরে তোলে, আমি পারি না,
হিংস্রতার ক্ষতিকর কীটপতঙ্গাদি
বারবার এসে নষ্ট করে দেয় সব আয়োজন।
আমি শিল্পী নই, দুঃখ-কষ্ট, বেদনা যন্ত্রণা
এসে ভিড় করে চারপাশে
ব্যথাদীর্ণ জীবনের নির্যাস বুকে নিয়ে
দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিই
শুধু বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে।

সেই সব অব্যক্ত বেদনার মলিন রঙে
মনের ক্যানভাসে ছবি আঁকতে চেষ্টা করি,
তুলি দিয়ে জীবনের রঙ টানি
লাল নীল সবুজ আকাশি হলুদ,
সবগুলো ঠিক ছবি হয়ে ওঠে না,
ব্যথাদীর্ণ রঙগুলো মেলে না কিছুতেই
সকল রঙের প্রলেপ কেমন দুঃখ হয়ে ওঠে,
কালো মেঘ কান্না হয়ে ঝরে রঙের উপর,
পৃথিবীর দুঃসহ দুঃখ এসে ভিড় করে ক্যানভাসে।

উড়ন্ত মেঘের মতো বারবার
ফিরে যাই শৈশব যাপনের জন্মভূমির কাছে,
গ্রাম্য বাড়ির রোদ ঝলমল দাওয়ায় বসে
বাল্যবন্ধুরা নানা দেশের সন্ত্রাসের খবর শোনে,
ধর্মের হিংসা, শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে ওরা
সন্ত্রাসের কাগজে লিখে দেয় মৃত্যুর
পরোয়ানা।
সেখানে ঈশ্বর থাকেন না, ধর্ম থাকে
না, অবাক বিস্ময়ে দেখি বিলাপরত
অসহায় সারিবদ্ধ মানুষের হাহাকার।

অনেকের চোখে ছানি পড়ে গেছে
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, তবুও আজকাল
উন্নয়নের তালে তালে জাতি দেখে
ধর্ম খোঁজে মানুষের চেহারায়।
ওরা তৎপর, বিশ্বাস খোঁজে,
অনুসন্ধান করে আমার চেতনার ধর্ম।
আমি ওদের বোঝাই
আমার কোনো জাত নেই
আমি মনুষ্য জাতি,
আমার কোনো ধর্ম নেই
আমার ধর্ম মনুষ্য ধর্ম ,
আমার কোনো গোত্র নেই
আমার গোত্র প্রেম,
আমার কোনো ঈশ্বর নেই
আমার ঈশ্বর হৃদয়।

সামান্য কুশল বিনিময় তারপর
একসাথে হেঁটে যাই সেই মেঠো পথ ধরে,
পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখতে দেখতে
পল্লীর এক প্রান্তে, সেখানে পথের দুই দিকে
আলস্যে পড়ে আছে উদাসী শান্তির পারাবার,
একদিকে স্নেহবঞ্চিত শ্মশানভূমি
যেখানে সকল অহঙ্কার,
পৃথিবীর মায়া পুড়ে যায় একাকী নির্জনে,
অপর দিকে সমাহিত গোরস্থান
স্মৃতি সত্তা মাটিতে বিলীন নিভৃত যাপনে।

একাকী নির্জন পথ চলে গেছে দূরে
উন্মুক্ত অসীম দিগন্তের বিমূর্ত চেতনায়।
যেখানে গোধূলির মায়াবী আলো মেখে
অসীম আকাশ নত পৃথিবীর কিনারায়।

আজও সময় কেন বদলে যায়

বিপাশা

আচ্ছা.. সময় কেন বদলে যায়?
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয় নিয়ম
ঋতু পরিবর্তন, মাস পরিবর্তন, দিন পরিবর্তন,
বদলে যাই আমি এবং আমরাও ।

পরিবর্তনই নাকি সৃষ্টির নিয়ম,
এ কেমন নিয়ম? এ কেমন সৃষ্টি?
যেখানে ভাই ভাই লড়াই হয়!
যেখানে বাবা ছেলেতে মন কষাকষি হয়!
যেখানে একজন মেয়েকে তার জন্মস্থান ছেড়ে থাকতে হয় অন্যের বাড়িতে..
সেটাই নাকি তার বাড়ি.. শ্বশুরবাড়ি।
চাইলেও যখন খুশি যেতে পারে না তার নারীর টানে।
এ কেমন পরিবর্তন? কেমন সৃষ্টি?

ছেলেবেলায় পড়ার শেষে সময় বাঁচিয়ে মাঠে যেতাম,
কোথায়? এখন তো যাই না।
মাঠগুলো ভরেছে আগাছাতে,
আর আমাদের অজুহাতে।
গ্রীষ্মের ছুটিতে আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যেতাম,
কোথায়?এখন তো যাই না।
চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর সপ্তাহন্তে বাড়ি যেতাম,
কোথায়? এখন তো যেতে পারি না।

যে বাবা তিল তিল করে তার সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে বড় করে তার ছেলেমেয়েকে,
যে মা নিজের না খেয়ে নিজের খাবার খাইয়ে দেন তার সন্তানদের,
সেই বাবা-মায়ের স্থান হয় না সুন্দর আধুনিক ফ্ল্যাটে।
তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে থাকতে হয় বাড়ির বাইরে।
এ কেমন পরিবর্তন? এ তো সৃষ্টি নয়, এ তো ধ্বংসের খেলা।

আচ্ছা সত্যিই কি সময় বদলে যায়?
নাকি সময়ের অজুহাতে আমরা নিজেরাই বদলে যাই নিজেদের সুবিধার্থে।
আচ্ছা তুমি যে এত আমার পরিবর্তন দেখো,
তুমি নিজের দিকে তাকিয়েছ? কখনো খুঁজেছ নিজের পরিবর্তন?

সত্যি আমরা কত বদলে যাই,
আগের মতো নেই কেউ।
না আমি,
না তুমি।

আমরা সৃষ্টির ধ্বংস,
আর ধ্বংসের সৃষ্টি,
আমরা পরিবর্তন,
আমরাই প্রকৃতি।

দিনকাল

রিনা সাহা

এই দুনিয়া রঙে ভরা
ঠিক রামধনুর মতো,
কিন্তু মানুষরূপী পশুর চাপে
মোটেই রঙগুলো নেই আস্ত।
তার দায় আমার, দায় তোমার,
দায় আমাদের সবার -
তবে যদি রঙ ফেরাতে হয় ,
সবে এক হওয়া দরকার ।
আমরা এই ছাত্রসমাজ
নিয়েছি এই ব্রত -
রঙগুলো সব ফিরিয়ে দেব
ঠিক রামধনুর মতো।

শ্রাবণ

দেবাশীষ মিত্র

তুমি আসবে বলে আধখোলা জানলাটা ইচ্ছে করে বন্ধ করে দিইনি।
বিশ্বাস কর।

তুমি আসবে বলে দরজার পাপোশটা ঠিক করে রেখেছি।
বিশ্বাস কর।

তুমি আসবে বলে ভরা বিকেলের রোদে ভাসা
মাঠের প্রবল ডাক আমি উপেক্ষা করেছি।
বিশ্বাস কর ।

তুমি আসবে বলে শত শত আওয়াজের মধ্যেও তোমার পায়ের শব্দ চিনতে চেষ্টা করেছি।
বিশ্বাস কর।

দুহাত বাড়িয়ে অঞ্জলি ভরে নিতে চেয়েছি তোমার দুচোখের ঝরে পড়া প্রেম।
কিন্তু ধরে রাখতে পারিনি
বিশ্বাস কর।

তোমার প্রেমের ধারা নেমে এসেছিল অযাচিতভাবে আমার দু ‘কাঁধে।
সেই শীতল অনুভূতিকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম।
কিন্তু পারিনি, বিশ্বাস কর।

তোমার প্রেমে সিক্ত পায়ের পাতা আবার কখন যেন শুকিয়ে গেল।
পায়ের পাতার উপর ওই শীতল প্রলেপ আমি ধরে রাখতে পারিনি।
বিশ্বাস কর ।

তোমাকে সারা বছর কুলুঙ্গিতে অতি যত্নে রাখতে চেয়েছি।
কিন্তু পারিনি, বিশ্বাস কর।

তুমি আসলে রবিশঙ্কর
আলি আকবরের যুগলবন্দি।
বিশ্বাস কর ।

তুমি আসলে নদী হাসে, নদী কাঁদে, পাল তোলে ময়ূরপঙ্খী।
বিশ্বাস কর।

তুমি আসলে খালের সাদা বক ঠোঁট তুলে আকাশকে জানায় অশেষ ধন্যবাদ।
বিশ্বাস কর।

গোপনে তোমায় আমি বেসেছি ভীষণ ভালো।
বিশ্বাস কর।

মাটির ভাঁড়ে জমানো আমার একজীবনের ভালোবাসা সম্পূর্ণ উজাড় করে তোমায় দিতে চেয়েছি।
কিন্তু পারিনি, বিশ্বাস কর।

বিশ্বাস কর, প্রিয় শ্রাবণ।

ভালো মানুষ

হাননান আহসান

বাবা বলতেন মানুষ হবার কথা
অর্থ নয় লোভ নয় মোহ নয়
ভালো মানুষ হতে হবে

বাবারা ভেবে দেখেনি
অর্থ লোভ মোহ কীভাবে বিসর্জন দেব

ভালো মানুষের কি অর্থ লাগে না
ভালো মানুষ কি লোভহীন হয়
ভালো মানুষের কি মোহ থাকে না

আমি এখনো গুলিয়ে ফেলি
ভালো মানুষ কাকে বলে

অর্থ লোভ মোহ ভেতরে রেখে
ভালো মানুষ হয়ে ওঠা
কঠিন নয় কখনো

মানুষ দোষে গুণে ভরা

নিপাট ভালো মানুষ একটি গাছ
ফলবতী গাছ

গাছ তো মানুষ নয়
তবে মানুষরূপী গাছেরা ভালো মানুষ।

কয়লাখেকো

শান্তিব্রত চট্টোপাধ্যায়

সবুজ ফ্ল্যাগটি নাড়িয়ে দিতেই
কু ঝিক ঝিক ট্রেন
ভসভসিয়ে এক্ষুনি ছাড়লেন।

ধোঁয়ায় ধোঁয়া কালচে গুঁড়োয়
চোখটি খোলা ভার
কয়লাখেকো চলছে নির্বিকার।

কয়েক জনে দরজা ধারে বসে
ট্রেনের ছন্দে দোলে
ইতিউতি কেউবা ঘুমে ঢোলে।

পরের স্টেশন এলেই হবে ‘মিট’
বাবা বলেন মা’কে
‘গোলা’টিও চেঞ্জ হবে সেই ফাঁকে।

কোনো হকার বেচছে বুড়ির চুল
কেউ হাঁকে ঝালমুড়ি
বাইরে হয়তো ঝরছে ইলশেগুঁড়ি!

যাত্রা শেষে হেলতে দুলতে নেমে
ভ্যানে বা রিকশায়

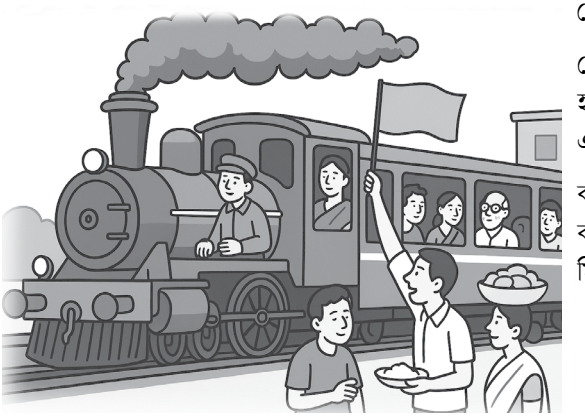

কেউবা হেঁটে যে যার পথে যায়।

সেই ঝিক ঝিক ভোঁয়ের ধ্বনি
হারায় কালের তলে
এখনতো ট্রেন ইলেকট্রিকে চলে।

কয়লাখেকোর আর চলা নেই
বাতিল সে রেলগাড়ি
মিউজিয়ামে ঠাঁই শুধু আজ তারি।

নীরব ঝড়

সুপর্ণা ভট্টাচার্য

নিঃশব্দে একটা ঝড় উঠেছিল, না চারিপাশে কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি,
গাছের ডাল ভাঙেনি, শুকনো পাতা ওড়েনি।
শুধু নীরবে ভেঙে গেছে স্বপ্নগুলো,
নিমেষে বদলে গেল জীবনের চালচিত্র।
ঝড় মানেই তো পরিবর্তন,
একটা সাজানো গোছানো মন ভেঙ্গে গেল।
খুব যত্নে রাখা প্রতিশ্রুতিরা আজ ঘর ছাড়া,
চারিদিক বিবর্ণ, ফ্যাকাসে, মন কেমন করা আকাশ।
যা ছিল, আজ তা নেই, কোথাও নেই!
শুধু পড়ে রয়েছে একলা মন,
ঝড়ে সবটা এলোমেলো হলো ঠিকই,
কিন্তু শিকড় তো উপরে ফেলা যায় না!
সবকিছু মুছে দেওয়া সহজ নয় এতটা,
ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও তো বাকি থেকে যায় খানিকটা!
নীরবে ছিন্ন ভিন্ন হলো যে মন, কে আর খোঁজ রেখেছে তার?
একটা ঝড় মানে অগোছালো জীবন,
কত তাড়াতাড়ি সব বদলে গেল।
সাক্ষী থাকলো শুধু চোখের জল,
আর কিছু দামী মুহূর্ত।
যা আজীবন ঝড় তুলবে আমার চেতনায়,
মননে, ভাবনায়, অস্তিত্বে।

স্বয়ংসিদ্ধার আগুন

অপর্ণা দেওঘরিয়া

কীভাবে সারথি রক্তাক্ত লাশ করে ছেড়ে দিলে,
অহংকার, মিথা প্রতিশ্রুতির
দাপটে বন্ধ করে দেবে দূরত্ব,
হে আমার জন্ম জন্মান্তরের বিধাতা পুরুষ--
বিকট শকুনের হাসিতে কি পৃথিবী ব্লক করা যায় নাকি,
এত যুদ্ধের আয়োজন, নাকি ভয় হাজার প্রশ্ন চিহ্নের, কামিনী কাঞ্চন।
নাকি ভণ্ড নামাবলীর উত্তরীয় পরে,
স্বর্গীয় প্রেমে হিংস্রতায় রাজা সাজা যায়?
যে মেয়েটি আজীবন সত্যের মুখোমুখি হেঁটে গেছে সহজ সরলতায়, সততায়--
নীরব অপমানে, উপহাসে বিভ্রান্তির নষ্ট খেলায় যন্ত্রণায় দিনাতিপাতে।
পলাশ শিমুল উজাড় প্রেম বাউলে।
কার ইঙ্গিতে ছেড়ে যেতে চাইছো?
আশ্চর্য লুণ্ঠনে রমণীয় কামনার উষ্ণ ঠোঁটের চুম্বনে রোজনামচায়।
অহংকার পুড়ে যায় মৌতাতের
মিতালী বাতাসে,
ক্ষতবিক্ষত হৃদয় যদি ফোঁসফাঁস করে ছোবল তোলে?
যে দিন স্বয়ংসিদ্ধার আগুনে তোমাকে
জ্বলে পুড়ে মরতে হবে অস্থিরতায়
বুঝলে সারথি বাংলা কবিতার দোলনে ঝড়ে শত বিশ্বাসের শিখায়।

মহাবিশ্বের এক সবুজ দ্বীপ তুমি

চায়না খাতুন

এখন গভীর রাত
একটা রেখার মতো আকাশ
ঘাতক শহর
রাস্তায় রাস্তায় জ্বলছে রহস্যময় আলো
ঘোড়ার গাড়ির ঘন্টাধ্বনি
যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে
তখন আমার রক্তবীজ জেগে ওঠে স্বদেশপ্রেমে!

ঝাঁক ঝাঁক অন্ধকার
আক্ষেপ আর বেদনার অক্ষরগুলো তোমাকে দেখেই প্রজাপতির
মতো পাখনা মেলে উড়ে যেতো একসময় বহুদূর
সাদা চুলের মতো টুকরো টুকরো মেঘ
আর উন্মাদ বৃষ্টিতে তোমার প্রতিচ্ছবি
আমাদের অনাবিষ্কৃত আয়না
মহাবিশ্বের এক সবুজ দ্বীপ তুমি,

হলুদ সূর্যে হাবুডুবু খাচ্ছে মাতাল সরীসৃপ
তছনছ গোলাপী প্রহর
লুটপাট সব সুখ
নিষিদ্ধ হয়েছে কলরব
ঐক্যের সুরে প্রেম ফিকে
শিল্পীর নিখুঁত ছবিও দেখি না আর--

জোড়াসাঁকোয় এক নিমজ্জিত শূন্যতা
রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ
আমার দেশ ঘর বাড়ি এখন অদৃষ্ট
ওগো মৃত্যুঞ্জয়ী রবিঠাকুর নক্ষত্রের মতো একবার এসো
বন্দি করো ধ্বংসকারীদের তোমার বাণীতে
মহামিলনের মন্ত্র জোয়ারে ঠিকানা ফিরিয়ে দাও মানুষের।

বিশ্বের মাতাই

দিপালী মুখার্জি

বিশ্বের জননী তুমি মাদার টেরেজা,
জীবন সঙ্গে করে ছিলে আর্তের শুশ্রূষা
ভারতের গর্ব তুমি ছিলে এই দেশে
দিয়েছো দেখা তুমি জননীর বেশে
সবাইকে ভালবেসে করেছো আপন
জানাই শ্রদ্ধা মোরা বিশ্বের জনগণ
এসেছিলে কবে তুমি শিক্ষিকার বেশে
মা বলে সম্মান তুমি পেলে দেশে দেশে
মাদার ছিলেন বিশ্বের কাছে, মোদের কাছে মা
বলতে তোমায় ইচ্ছে করে মোদের ছেড়ে যেও না।
দুর্গা শুধু মাটির মূর্তি জীবন্ত নয় সে মা
তুমি ছিলে মোদের কাছে জীবন্ত প্রতিমা।
বিদায় তোমায় নাহি দিতে চাই
তবুও বিদায় দিতে হয়
মাদার ওগো মা তোমায় ভোলা সহজ নয়।

শারদীয়া মা

ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ

শরতের কোমল পরশ, স্নিগ্ধ পরিবেশে,
নির্মল নীল আকাশ, ধরণী শ্যামল বেশে।
অরুণাভের উজ্জ্বল আলোয়, আলোকিত ভুবন,
আকাশ তলে মেঘের ভেলা, জ্যোৎস্নাস্নাত গগন।

আগমনীর আভাস, আকাশে বাতাসে ভাসে,
আনন্দে মন নাচে, না জানা খুশির আশে।
কাশ ফুলের শুভ্র নিশান, দুর্গা মাকে ডাকে,
পদ্ম তাই পাপড়ি মেলে, দিঘি ভরে রাখে।

মহালয়ের ভক্তিসুধা, বহে হৃদয় অন্তঃপুরে,
আগমনীর বার্তা শুনি, দিগদিগন্ত জুড়ে,
মাতৃভূমে সন্তান সহ মা দুর্গা, করবে পদার্পণ,
পুলকে এ ধরা হাসবে, পেয়ে আপনজন।

কৈলাসে মায়ের প্রত্যাগমন, দুঃখে ভরায় ধরা,
আবার একটি বছর কাটবে, তোমাকে মা ছাড়া।
এ এক বছর তোমরা মাগো, থেকো সবাই ভালো,
পাপের আঁধারে ডুবেছে এ ভুবন, কে দেখাবে আলো?

তারিখ

বিপ্লব ভট্টাচার্য

একদিন সব রোদ্দুর মেলা ছিল উঠোনের তারে
বাঁশের বেড়ার পাশে গাছের নীচের

কেসি পাল ছায়া,

বুকপাতা বিছানার মতো ঘিরে থাকা সব ঘরে ঘরে আলো খেলা পালকেরা ছুঁয়ে যেত

জীবন্ত শ্বাস বাসে হারমোনিয়ামে সাত সুরে কাহিনীর আলপথে কম বয়সের বাসমতী খেলা,

মাটির কলসীতে ডুবে থাকা শীতল তারিখের পাতা নামে ডেকে কথা বলতো, নামগুলো রোদ ঝলমলে উঠোনের তাপ মেখে

দাওয়ার ঘাম মুছে যেত সুতুলি গামছায়

নিঃশ্বাসের ওঠানামা, তরণীকাকার গল্পে জাগলো জলঙ্গীর পাড়ে আমতলা গ্রাম।

এক মার্চের পনেরো তারিখে ঠাকুরঘরের জানালাটা বেশ বড়ো হয়েছিল,

চোখ বুজে জানালাটা দুহাতে কেটে

উঠানের রোদ শুষে মুখ না ফিরিয়ে জমাট আঁধার ভেঙে দাদা

আগুনের রঙে ভেসে গেলেন।

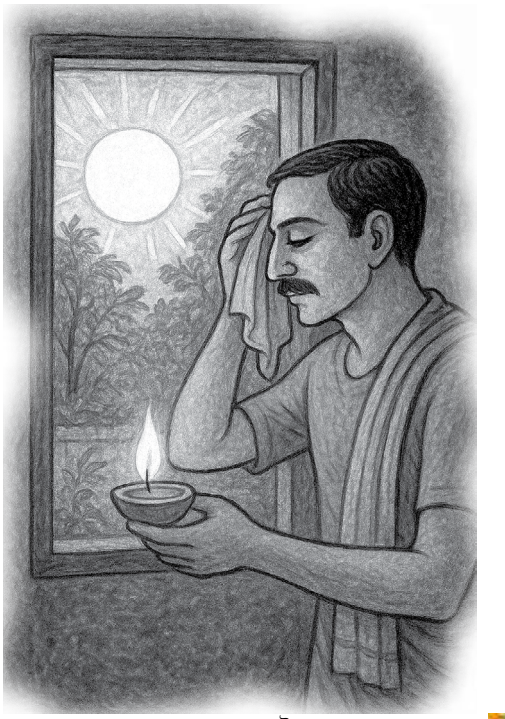

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

নীলকমল বসাক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের সূচনা, একটি আশ্চর্য দৃশ্য,
লিখিত শব্দ থেকে শুরু করে ছবি পর্যন্ত উজ্জ্বল,
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জ্ঞান, গল্পে প্রাণ সঞ্চার করে।
এ আই আমাদের ডাকে সাড়া দেয়, জ্ঞান লাগালের মধ্যে।
লোগো, ভিডিও, সময়সাশ্রয়,
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়,
অধিক দক্ষতা এবং করুণার সাথে তার কাজ সম্পাদন করে।
এআই রং করে, লেখে, স্বপ্ন দেখে।
আমরা বিস্মিত, মোহিত, অজান্তে--
আমাদের নিজস্ব কল্পনা, শুকিয়ে যাওয়া ফুল,
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়, একটি নীরব আত্মসমর্পণ।
যেখানে মানবিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সৃজনশীল অগ্রগতি প্রয়োজন,
তাই শেখা এবং মানিয়ে নেওয়া, ভবিষ্যতের দরজা খোলা,
পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করা এবং আরো কিছুর জন্য প্রচেষ্টা করা।
ভবিষ্যতের আহ্বান, বেঁচে থাকার,--
সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি উজ্জ্বল দিন।
সিলিকন এবং ধাতু, অনুভবকারী সেন্সার, বিদ্যুৎ প্রবাহ,
একজন অক্লান্ত শক্তিশালী, নতুন কর্মী এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,
মানুষের হাতের প্রয়োজন নেই।
তথ্যের গভীর সমুদ্র থেকে দ্রুত সিদ্ধান্ত,
বিচার বুদ্ধিতে সহায়তা করে, আমাদের পরিচালিত করে।
একটি ভবিষ্যৎ যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,
কিন্তু মানবজাতির জন্য কি মূল্য দিতে হবে ?

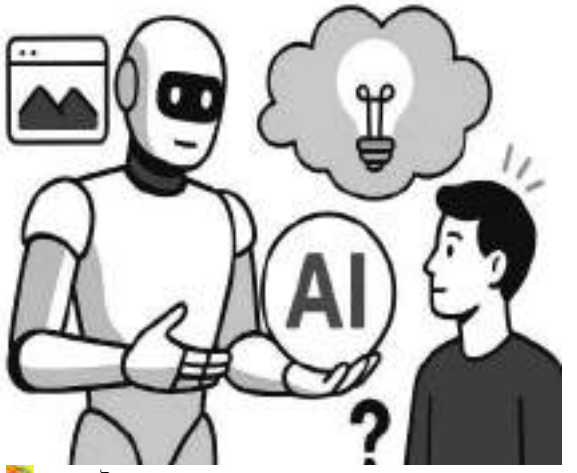

অদেখা উত্তর

মানস কুমার ঠাকুর

আমি নিজেকে সর্বতোভাবে বিশ্লেষণ করেছি -
আমার আবেগ, ভালোবাসা, রাগ ও দুঃখ তোমার উপর ছড়িয়ে দিয়েছি,
তবুও তোমাকে বুঝতে পারিনি।
কখনো মনে হয় তুমি আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না,
আবার কখনো মনে হয় তুমি আমাকে মনের দিক থেকে ঘৃণা করো।
আবার কখনো মনে হয় আমি তোমার সময়োপযোগী খেলনাI
তোমাকে বুঝতে না পারার যন্ত্রণা আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়|
সময়কে ধরে রাখতে পারবো না জেনেও প্রতিনিয়ত চিন্তায়|
দিশাহারা হয়ে যাই তবু এক অদ্ভুত মায়াজালে জড়িয়ে,
নিজেকে আনতে পারি না সরিয়ে।
মনে হয় জীবনটা এক মরু সাহারায়,
অদ্ভুত সংমিশ্রণ ভালবাসা ও আবেগের -
জীবন নদীর মতো প্রবাহমান,
আমি সময়ের অপেক্ষায় অপেক্ষমান।
একটা কথা বলতো !
তোমারও কি এমনই অবস্থা
তুমি কি এই কথাগুলো বলতে চাইছো আমায়,
বাস্তবতার নীল নীলিমায়।

ভারতের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক **তিলক সেনগুপ্ত** জানালেন সংস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচির কথা।

দেশের সনাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারে কাজ করে সংস্কার ভারতী

● সংস্কার ভারতী কী?

●● ভারতের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সংগঠন। বিষ্ণু শ্রীধর বাকনকর, পণ্ডিত ভীমসেন
যোশী, বাবা যোগেন্দ্রর মতো বিশিষ্টদের উদ্যোগে ১৯৮১ সালে উত্তর প্রদেশের লখনউয়ে প্রতিষ্ঠা হয়। সারা দেশে সংস্কার ভারতীর কয়েক হাজার শাখা রয়েছে। এই সংস্থার
নীতিবাক্য- স্বা কলা যা বিমুক্তায়।

● সংস্কার ভারতীর প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী?

●● সংস্কার ভারতীর প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ভারতের সনাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসার। ভারতীয় ৬৪ কলার সুষম
বিকাশ। তার মধ্যে রয়েছে গান, নাচ, বাজনা, সাহিত্য, নাটক, সিনেমা ও চিত্রকলার মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও আরো নানান সৃজনশীল ক্ষেত্র।

● পশ্চিমবঙ্গে কবে সংস্কার ভারতীর শাখা চালু হয়?

●● বাবা যোগেন্দ্রর আদর্শ বাস্তবায়ন করে ১৯৮৭ সালে যামিনী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা চালু হয়। যামিনী গাঙ্গুলির সঙ্গে ছিলেন সুভাষ ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চন্দ, বিকাশ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে।

● রাজ্যে কোথায় কোথায় কাজ হচ্ছে?

●● উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ২৮টি জেলায় সংস্কার ভারতী নীরবে কাজ করে চলেছে।

● রাজ্যে এখন সদস্য সংখ্যা কত?

●● সংস্কার ভারতীর নানা স্তরে সদস্য রয়েছে- স্থায়ী, অস্থায়ী, আজীবন সদস্য, শুভ্যানুধ্যায়ী সদস্য। রাজ্যে এই মুহূর্তে স্থায়ী সদস্য সংখ্যা ৩,০০০-র বেশি (এই লেখা পর্যন্ত)।

● কারা ও কীভাবে সদস্য হতে পারেন?

●● ৮ থেকে ৮০ বছরের যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যুক্ত থাকতে হবে গান, নাচ, শিল্পকলা যেকোনো একটা ক্ষেত্রে। সাদা কাগজে নিজের দক্ষতা জানিয়ে আবেদন করতে হয়। তারপর বিচারকমণ্ডলীরা বাছাই করেন। সদস্য হতে চাইলে সংশ্লিষ্ট জেলার সংস্কার ভারতীর প্রতিনিধি বা সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। বার্ষিক চাঁদা ১২০ টাকা।

● এই রাজ্যে সংস্কার ভারতীর উল্লেখযোগ্য কাজ কী কী?

●● রাজ্যে গত ১৫ বছরে সংস্কার ভারতী অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। প্রতি বছর পয়লা বৈশাখ রঙিন সুদৃশ্য বাংলা ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে। ১২ পাতার এই ক্যালেন্ডারে থাকে নানান দিনপঞ্জী, প্রতি মাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাইলাইট করা হয়। যেমন, বাংলার ১২ মাসের ১৩ পার্বণ, আলপনা, বাংলার দেব দেউল বিষয়কে তুলে ধরা হয়। আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে রয়েছে- বাংলার লোকসংস্কৃতি ও কৃষ্টি নিয়ে। বাংলার প্রতিটি জেলায় রয়েছে নিজস্ব লোকসংস্কৃতি। যেমন মালদহে গম্ভীরা, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ বা বীরভূমের লেটোগান। ওই সব লোকসংস্কৃতি নিয়ে আমরা ডকুমেন্টেশন করেছি। এই বিষয়ে ৫টি আকরগ্রন্থ প্রকাশ করা হচ্ছে। বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য স্বদেশি গান। ওইসব স্বদেশি গান যেমন সংরক্ষণ করা হয়েছে, তেমনি সদস্যদের কথা ও সুরে এ পর্যন্ত ৪টি গানের অ্যালবাম বেরিয়েছে।

● সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়?

●● সংস্কার ভারতীর ৫টি বিধান- পারফর্মিং আর্ট (গান, বাজনা, নাচ), সাহিত্যকলা (সাহিত্য বিষয়ক), কলাধরোহর (পুরাতত্ত্ব), ভিসুয়াল আর্ট (চিত্রকলা, ভাস্কর্য আর সিনেমা- ভিডিয়োগ্রাফি) আর লোককলা (লোকসংস্কৃতি)।

● সংস্কার ভারতী কোন কোন অনুষ্ঠান পালন করে?

●● সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে বছরের নানা সময়ে নান অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তার মধ্যে রয়েছে বাংলার নববর্ষ পালন, বসন্ত উৎসব, ২৬ জানুয়ারি ভারতমাতা পুজো, নটরাজ পূজন, গুরুপূর্ণিমা পালন, বসুন্ধরা দিবসে ভূঅলঙ্করণে ধরিত্রী বন্দনা।

● নটরাজ পূজন কী?

●● নটরাজ পূজন মানে শিবের উপাসনা। আমরা ফুল চন্দন ও বেলপাতা দিয়ে নটরাজ পুজো করি না। সংস্কৃতির অর্ঘ্য দিয়ে নটরাজকে পুজো করা হয়।

তিলক সেনগুপ্ত

● মাঘী পূর্ণিমার দিন কীভাবে পালন করা হয়?

●● এদিনটা আমরা নাট্যশাস্ত্রের ভরতমুনির জন্মদিন হিসাবে পালন করি।

● নতুন প্রতিভার জন্য কী করেন?

●● নতুনদের জন্য সংস্কার ভারতীর এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল নতুন প্রতিভার অন্বেষণ। যেখানে সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রের নতুন প্রতিভাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুযোগ দেওয়া হয়। আর ওই সব অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মধ্যে থাকেন সংস্কৃতির বিশিষ্টরা। ওঁরাই খুঁজে নেন যোগ্যদের আর তাঁদের শেখানোর ভার নেন। এভাবে গত কয়েক বছরে অনেক নতুন প্রতিভা উঠে এসেছে।

● নতুনদের প্রতিভা বিকাশে সংস্কার ভারতী কি প্রশিক্ষণ বা আর্থিক সাহায্য করে?

●● সংস্কার ভারতী নাচ-গান শেখানোর কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। কাউকে আর্থিক সাহায্য করে না। শিল্পীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে বলা দরকার সংস্কার ভারতী কোনো প্রতিষ্ঠান ভাঙে না। ভারতের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি নিয়ে কাজের জন্য সবাইকে অনুরোধ করে।

● অনেকের ধারণা সংস্কার ভারতী ভারতীয় জনতা পার্টির শাখা সংগঠন। এটা কি ঠিক?

●● আগেই বলেছি দেশের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতী। যার কাজ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার। বাইরে থেকে অনেকে অনেক কিছু মন্তব্য করেন, সংস্কার ভারতীর সঙ্গে জড়িত হলে গভীরে গেলে, কাজ দেখলে বুঝতে পারবেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য। বুঝতে পারবেন সংস্কার ভারতী কতটা অরাজনৈতিক সংস্থা। এই সংস্থায় নানা দলের নানা মতের সদস্যরা রয়েছেন। কারোর রাজনৈতিক মতবাদের ওপর খবরদারি চালানো হয় না। সকলে সংস্কৃতির প্রসারে নিজেদের মতো কাজ করেন।

● রাজ্যে আপনাদের সদর কার্যালয় কোথায়?

●● সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ৫০, বলদেওপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০০৬ (উত্তর-পূর্ব কলকাতার মানিকতলা অঞ্চল)।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ড শিল্পে রবীন্দ্রনাথ

হিন্দুস্থান, ইনরেকো ও মেগাফোন কোম্পানির স্বর্ণযুগের গান ফের নতুন করে ফিরিয়ে আনার কাজে অনলস প্রয়াস চালাচ্ছেন বাংলা গানের সংগ্রাহক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার কালজয়ী গানের রেকর্ড সংগ্রাহকদের কাছে এক অতি পরিচিত নাম অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামাফোন কোম্পানিতে অনেক বছর কন্টেন্ট ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন। গানের মূল শিল্পীদের কালজয়ী সব গানের উজ্জ্বল উদ্ধার হয়েছে তাঁর কৃতিত্বে। এখন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির মিউজিক কন্টেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন।

হিন্দুস্থান, ইনরেকো ও মেগাফোন কোম্পানির স্বর্ণযুগের গান ফের নতুন করে ফিরিয়ে আনার কাজে তাঁর নিরলস প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনয়ী ও নিরহংকারী মানুষটির সঙ্গীতজগৎ ও তাঁর কুশীলবদের কেন্দ্র করে অভিজ্ঞতার থইমেলা ভার। সঙ্গীতজগতকে কেন্দ্র করে অমল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে গবেষণার কাজ করে চলেছেন। নানান পত্রপত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথা নিবন্ধ আকারে বেরিয়েছে। এই লেখাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এক লেখা হংসধ্বনি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় রেকর্ড শিল্প ও রবীন্দ্রনাথ নামে। সময় ও পাঠকদের দাবি মেনে অমলবাবু সিদ্ধান্ত নেন লেখাটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে বইয়ের আকারে পুরো তথ্য দিয়ে পাঠকদের দরবারে নিয়ে আসার। এই বইয়ের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয় ২৬ জুলাই, বাংলা একাডেমিতে। বইটি প্রকাশ করেন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক গৌতম মিত্র। কী রয়েছে এই বইয়ে? গবেষক ও লেখক অমল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও ভূমিকায় বাংলার রেকর্ডশিল্প নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তার প্রামাণ্য ইতিহাস এই বই। এছাড়াও অপ্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের গান, গানের সুর, কবিতা, নাটক গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, রম্যরচনা ইত্যাদি বাংলার রেকর্ডশিল্পকে কীভাবে এক মহাবিস্তারলাভের পথে উন্নীত করেছিল তার এক প্রামাণ্য দলিল এই বইটি। প্রায় একশো বছরের সময়কালে (১৯০৫০ ২০০২) নানা রেকর্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত প্রায় সব রবীন্দ্রসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, গীতিনাট্যর তালিকা এই বইয়ে সংকলিত করা হয়েছে যা রেকর্ড বা সঙ্গীত সংগ্রাহক, সঙ্গীতজীবী, রবীন্দ্রগবেষক সব সুধীজনদের নিঃসন্দেহে সাহায্য করবে। এছাড়াও নানান ভাষায় রেকর্ড করা প্রায় সব রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভাবিত কৌতুকগীতি, বিভিন্ন রচয়িতার যে সব গান রবীন্দ্রনাথের সুরে রেকর্ড হয়েছিল তাও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এখানে। সব শেষে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের সময় ও রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে রবীন্দ্র স্মরণে রেকর্ড করা সব গান ও আবৃত্তির তালিকা এই গ্রন্থে সংকলিত করা হয়েছে।

সমরেশকে সংসারের ব্যাপারে মাথা গলাতে দিইনি

নিজেকে সবার সামনে প্রকাশ করতে প্রবল আপত্তি অথচ প্রয়াত সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যিক হওয়ার পেছনে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি সমরেশপত্নী **ধীরা মজুমদার।** তাঁর সঙ্গে কথায় **রমাপদ পাহাড়ি।**

● বিখ্যাত লেখকের সহধর্মিনী ছিলেন, কখনো লেখালেখির ইচ্ছে হয়নি?

●● লিখেছি তো। ওঁর লেখাটা পাঠক-পাঠিকা পড়তে পারেন। আমারটা পারেন না। তফাৎ এইটুকু।

● হেঁয়ালি করছেন?

●● একদম না। উনি পাতায় লিখেছিলেন, আমি খাতায় লিখি। চাল, ডাল তরকারির হিসেব। সাংসারিক খরচের হিসেবনিকেশ।

● প্রতিটি সফল পুরুষের পেছনে যেমন একজন নারীর ভূমিকা থাকে। ঠিক তেমনি সমরেশদাকে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার করে তোলার পেছনে আপনার অবদান ছিল?

●● সমরেশ তাঁর নিজের লেখনীর গুণে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেটা তাঁর নিজস্বতা, ভেতরের শক্তি ছিল। তবে, হ্যাঁ, ওঁকে সংসারের ব্যাপারে কখনো মাথা গলাতে দিইনি। কোনো দায়িত্বভার নেননি। আমি চাপিয়েও দিইনি। কেননা আমার মনে হয়েছিল যে, সংসারের মধ্যে ঢুকে গেলে লেখাটা বোধহয় থাকবে না। সেই গরজ আমার ছিল। তাই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলাম।

● যখন আপনার বড়ো মেয়ে দোয়েল জন্ম নিল, সে সময় কি কখনো মনে হয়নি দায়িত্ব পালনে সমরেশদাকে পেলে ভালো হত?

●● হ্যাঁ, তখন মাঝেমধ্যে মনে হত। কিন্তু দায়িত্ব পালনে ওঁকে পেতাম না। একসময় তাই নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, এই কথাটা শুধু একটা পণ্ডশ্রম। ঠিক করেছিলাম, আমি যা পারি সেভাবে একাই করব। নিজেকে চালিয়ে নেব।

● সমরেশ মজুমদারের লেখার কোনো নায়িকার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন? সে মাধবীলতা হোক অথবা দীপাবলি?

●● না, না, ওসব খোঁজাখুঁজি করিনি। গল্প উপন্যাসের নায়িকা হওয়ার মতো কোনো গুণ আমার মধ্যে ছিল না। একজন লেখক তাঁর কল্পনা অনুযায়ী লেখেন, সমরেশ তাই করেছিলেন।

● আপনাদের পরিচয় কীভাবে?

●● পরিচয় হয়েছিল আমার মাসতুতো দাদা শৈবাল মিত্রর সূত্রে। যিনি পরে লেখক হিসাবে নাম করেন। সমরেশ ও শৈবাল দু'জনে স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ছিলেন। মাঝে মাঝে আমাদের শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িতে আসতেন। তখন উনি ছোটোখাটো পত্রিকায় লিখতেন। ওঁর লেখার ধরন আমার ভালো লাগত। একটা কথা হয়, স্কটিশ চার্চের মাস্টারমশাইরা খুব ভালো পড়াতেন। সে জন্যই তো সমরেশ ও শৈবালের লেখার বাঁধুনি এত ভালো ছিল। কলেজে থাকতে নাটক করতেন, এমনকী কলেজ ছেড়ে দেওয়ার পরেও। আমি তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলাম।

● তারপর?

●● তারপর আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একইসঙ্গে বাংলায় এম এ পড়ি। এভাবে ধীরে ধীরে।

● এম এ ক্লাসে ফিসফিস করে গল্প করতে গিয়ে সমরেশদা একবার শিক্ষক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়ে যান। আপনি কি সেই বান্ধবী?

●● না না আমি নই।

• ক্লাসমেট হিসাবে অভিজ্ঞতা কেমন? নোটস দেওয়া নেওয়া হত?

•• খুবই কম। আমি সমরেশকে নোটস দিতাম না, নিতাম না। বরং অন্য ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে ঠিক নোটস নিতাম। যারা লেখাপড়া করত। ফাঁকিবাজি নয়।

• বিয়েটা কোথায় হয়? কোন সময়?

•• মাস্টার ডিগ্রি করার কিছুদিন বাদে কলকাতাতেই বিয়ে হয়। তখন আমি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। বিয়ের পরদিন পাড়ি দিয়েছিলাম জলপাইগুড়িতে শ্বশুরবাড়ি।

• নতুন বউমাকে পেয়ে কতটা খুশি হন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা?

•• কতটা খুশি হয়েছিলেন, সে তো আমি বলতে পারব না। তবে, সবার কাছে ভালো ব্যবহার পেয়েছি। হার্ট করার মতো কিছু ঘটেনি। শ্বশুর কৃষ্ণদাস মজুমদার, শাশুড়ি শ্যামলী মজুমদারের পাশাপাশি ওঁর দাদুর আশীর্বাদ পেয়েছিলাম। তখন তাঁর অনেক বয়স। তবুও মনের দিক থেকে আধুনিক ছিলেন।

• আপনি নিজেও তো কোনো অংশে কম নয়?

•• আধুনিক কিনা বলতে পারব না। তবে আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সবার স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিই।

• আপনার হাতের রান্নার খুব সুনাম আছে। কোন কোন লেখককে রান্না করে খাইয়েছেন?

•• সন্তোষ কুমার ঘোষ আর বিমল কর। এঁরা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। বিশেষ করে সন্তোষদা। মাঝে মাঝে ফোনও করতেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্নেহও পেয়েছি। আমার একটা বিস্ময়, নারায়ণবাবুকে দেখতাম, টানা সংস্কৃত বলে যাচ্ছেন। একদম না থেমে। আর সন্তোষদা সংস্কৃত, বাংলা, ইংরিজি পরপর এক নাগাড়ে বলে যেতেন। নারায়ণবাবু আবার ফ্রেঞ্চও বলতেন। খুব মিস করি সবাইকে।

• এক সময় ফুলটাইম লেখক হওয়ার জন্য ইনকাম ট্যাক্সের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন সমরেশদা। তখন বাধা দেননি?

•• চাকরি ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আমার সঙ্গে। তখন আমি নিজেও কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট অফিসে চাকরি করি। বলেছিলাম, তোমার যদি মনে হয় এই আয়ের মধ্যে আমাদের চলে যাবে, তাহলে তুমি ছেড়ে দাও। আর যদি মনে হয় যে, চলবে না। তাহলে ছেড়ো না। আসলে আমি পছন্দ করি না, আমার নিজের ওপর কেউ কখনো ইমপোজ করুক বা আমি কারোর ওপর ইম্পোজ করি। যে যেমন বুঝবে করবে। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

• এই ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হওয়ার শিকড়টা কি আপনি ছোটবেলায় ব্রাহ্ম বিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন?

•• এটা ঠিক বলতে পারব না। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই আমার ছেলেবেলা একইরকম কেটেছে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তাম। স্কুলের মতো আমাদের পরিবারও ছিল রক্ষণশীল। যাকে বলে, প্রচণ্ড কড়াকড়ির মধ্যে মানুষ হয়েছি। ব্রাহ্ম রীতিনীতি আমার রক্ত মজ্জায় এমন ঢুকে গেছে যে, এখনো সেই আদর্শ আঁকড়ে ধরে পথ চলি।

• এই আদর্শ বোধ থেকেই কি আপনার রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ঘনিষ্ঠতা?

•• আমি এমনটা বলব না যে, ব্রাহ্ম রীতিনীতির মধ্যে বড়ো হয়েছি বলে আজ বুড়ো বয়সেও বেলুড়ে যাচ্ছি। তবে এটা ঠিক, ব্রাহ্ম স্কুলে পড়ার ফলে ওদের ভাবনা, শিক্ষা আমি মাথাতে, মনেতে গ্রহণ করেছিলাম। মেনেও নিয়েছিলাম। এটা আসলে অন্তরের অনুভূতি। আমি পরমহংস দেব, সারদা মা, স্বামীজীর প্রচুর বই পড়েছি। ঠাকুরের লোকশিক্ষামূলক গল্পকথায় মুগ্ধ হয়েছি, বিভোর হয়েছি। কত কঠিন কথা, বড় বড় বিষয় ঠাকুর যেভাবে স্বল্প কথায় বলে গিয়েছেন, এসব পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি। মানুষটা আদেও সংসার করেননি, অথচ সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কী করে যে এভাবে বোঝাতে পেরেছেন, এ আমার কাছে এখনো বিস্ময়।

এখনো রূপান্তরকামীদের সঙ্গে হিজড়েদের এক করে ফেলা হয়

নৃত্যশিল্পী **মেঘ সায়ন্তনী ঘোষ।** নিজের কাজ ও সমসাময়িক সমাজ, নানা বিষয়ে মুখ খুললেন **রূপকথায়।**

● মেঘ তুমি রাজ্যের প্রথম রূপান্তরকামী আইনজীবী আবার অন্যদিকে, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী। রীতিমত সেলিব্রিটি। কেমন লাগে বিষয়টা?

●● প্রথমত আমি কোনোভাবে সেলিব্রিটি নই আর হতে চাই না। নিজের মতো কাজ করে চলেছি। কাজের জন্য আমাকে নানা সময়ে নানা অনুষ্ঠানে ডাকা হয়। বিশেষ করে পুজোর সময়। আমাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার পেছনে সাংবাদিকবন্ধুদেরও অবদান কম নয়।

● তোমার কি মনে হয় ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী নিয়ে লোকের ধারণা বদলে গেছে?

●● একটু সচেতনতা বাড়লেও ধারণা বদলায়নি। অনেকে রূপান্তরকামী ও হিজড়াকে এক করে ফেলেন।

● ২টোর মধ্যে পার্থক্য কী?

●● প্রথমেই বলি তৃতীয় লিঙ্গ একটা ছাতা, তার মধ্যে এই হিজড়া, রূপান্তরকামী পড়ে। হিজড়া মানে ইন্টারসেক্স বাংলায় উভলিঙ্গ। এরা জন্মগতভাবে ২টো যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মায় কিন্তু কোনোটাই পুষ্ট (অ্যাকটিভ) হয় না। ভালো বাংলায় এদের বলা হয় বৃহন্নলা। যৌনকর্মীদের মতো হিজড়া একটা বৃত্তি। এরা একটা সম্প্রদায় হিসাবে থাকেন। অন্যদিকে, ট্রান্সজেন্ডার মানে কেউ জন্মগতভাবে পুরুষ হলে মনের দিক থেকে নিজেকে মেয়ে বলে মনে করেন আবার কেউ জন্মগতভাবে নারী হলেও মনের দিক থেকে পুরুষ। ২টি ক্ষেত্রেই বিপরীতধর্মী গুণাবলীর প্রকাশ হয়। সবার সঙ্গে থাকেন। শীর্ষ আদালতের আইন অনুযায়ী, রূপান্তরকামীরা অপারেশন বা হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তন না করলেও নিজেদের মতো চলতে পারেন। শিক্ষা ও কাজ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সমান অধিকারের যোগ্য।

● এই রাজ্যে রূপান্তরকামীরা কাজের ক্ষেত্রে কতটা সুরক্ষিত?

●● অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। কাজের ক্ষেত্রটা সুরক্ষিত নয় বরং এখানে কাজের প্রায় সুযোগ নেই। কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়। নানা পেশায় রূপান্তরকামীদের যোগ্য বলে ভাবা হয় না।

● সিনেমা বা সিরিয়ালে কাজ পায়?

●● তৃতীয় লিঙ্গের কোনো চরিত্র থাকলে তাঁদের ডাকা হয় বা হয় না। তবে কেন তাঁদের মূল ধারার চরিত্রের জন্য বিবেচনা করা হবে না? বলিউডে তো এমন হয় না! এবিষয়ে আমরা অনেক প্রতিবাদ করেছি।

● তুমি ছাড়া এই মুহূর্তে কোন কোন রূপান্তরকামী প্রচারের

আলোয়?

●● এখন নানা ক্ষেত্রে অনেকেই ভালো কাজ করছেন। যেমন- মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিতা সিনহা, কুসুম (অভিনেত্রী), জয়িতা, তিস্তা (কবি)।

● তুমি কবে থেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ভাবতে শুরু করলে?

●● ১৩-১৪ বছর বয়সে বয়ঃসন্ধির সময় থেকে আমার মধ্যে মেয়েলি বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হয়, নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করি।

● এক্ষেত্রে তোমার রোল মডেল কে ছিলেন?

●● চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। আমাদের কলেজ জীবনে, ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। সত্যি বলতে কী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর চিত্রপরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের মতো করে কেউ মেয়েদের মন বোঝেনি।

● তোমার বাড়ি থেকে কেউ আপত্তি করেননি?

●● হ্যাঁ, বাবা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু আমার মা ছিলেন খুব সাপোর্টিং। মায়ের জন্য আমার আইন পড়া।

● তুমি কোন কলেজ থেকে আইন পাশ করেছ?

●● আমি হাজরা ল কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি কোর্স আর অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১১ সালে আইনের মাস্টার ডিগ্রি কিরেছি। আমার স্কোর ছিল ৮৭ শতাংশ।

● তুমি তো ওকালতি কর। এত আইনজীবীর ভিড় পসার কেমন?

●● সত্যি বলতে কী খুব বেশি কেস পাই না। রূপান্তরকামী বলে এখানেও বৈষম্য করা হয়।

● কোন বিষয়ে তোমার ওকালতি?

●● আমি সিভিল ল-ইয়ার কিন্তু এখন ওকালতির চেয়ে বেশি আগ্রহী আইন পড়ানোয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়াতে চাই।

● আইনজীবী ছাড়াও তুমি নাচের শিল্পী। কবে থেকে নাচের প্রতি আগ্রহী হলে?

●● ১০-১২ বছর থেকে নাচ শিখেছি। নাচের তালিম নিয়েছি কোহিনূর সেন বরাট, বাপ্পা চ্যাটার্জির কাছে। এছাড়াও কুচিপুড়ি নাচ শিখেছি গৌতম চৌধুরীর কাছে।

● তোমার তো নাচের প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কোথায়?

●● আমার নাচের প্রতিষ্ঠানের নাম রুদ্র পলাশ, ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করি নিজের বাড়ি সোনারপুর সাহেবপাড়ায়।

● কেন এই প্রতিষ্ঠান চালু করলে?

●● রূপান্তরকামীদের সৃজনশীল কাজ শেখানোর জন্য। আমার এখন ৫০ জন শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে যেমন রূপান্তরকামীরা রয়েছে, তেমনি মূল ধারার অনেক ছেলেমেয়ে রয়েছে। একজন নৃত্যগুরু হিসাবে কোনো ভেদাভেদ করি না।

● এখনো পর্যন্ত নাচের কতগুলো প্রোডাকশন করেছ?

●● অন্তত ১০-১২টা হবে। তার মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয় চিত্রাঙ্গদা অবলম্বনে আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী দশমহাবিদ্যা, নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, রবিঠাকুরের চণ্ডালিকা অবলম্বনে 'মুক্তি', মহাভারতের ১১জন নারী চরিত্র নিয়ে মহামানবী, অন্দরে অন্তরে মেঘবালিকা। এছাড়াও ঋতুপর্ণ ঘোষের সিনেমা নারী চরিত্র নিয়ে নৃত্যনাট্য খুব প্রশংসা পায়। ৩১ আগস্ট ঋতুপর্ণ ঘোষের জন্মদিনে আমরা একটা বার্ষিক অনুষ্ঠান করি। সেখানে গুণীজনদের সম্মান জানাই। রূপান্তরকামীদের নিয়ে নাচের অনুষ্ঠান করি।

● একটা সময়ে ট্রান্সজেন্ডারদের নানা কটূক্তি শুনতে হত। এখনো কি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সেসব শুনতে হয়?

●● অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এবিষয়ে অনেক সচেতন হয়ে উঠেছে। আজকের নেটের যুগে তারা সব বিষয় জানতে পারছে, জেন্ডার বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিচ্ছে। আমি নিজেও এ বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করছি নানা আলোচনা, সেমিনারের মাধ্যমে।

বুঁচকিবাবুর হাত ধরে ব্র্যান্ড হয়ে ওঠে ঘরোয়া এক মিষ্টান্ন

ঈপ্সিতা সেন

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা। বাংলাদেশ থেকে এসে জয়নগরের মামারবাড়িতে থাকতেন জনৈক নিত্যগোপাল সরকার। বয়স কম। কাজ বলতে পাড়ার ক্লাবে ফুটবল খেলা। ওইটাই তখন ধ্যানজ্ঞান। একবার ওই ফুটবল খেলতে গিয়েই তাঁর আলাপ হয় পূর্ণ চন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। তিনিও থাকেন জয়নগরে মামারবাড়িতে। নিত্যর পাশের ক্লাবের হয়েই খেলেন। বয়স একই, ভাবনাচিন্তায়ও মিল। তাই দুটো আলাদা ক্লাবের হয়ে খেললেও নিত্য আর পূর্ণর বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগেনি। অচিরেই তা বেশ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। বন্ধুত্ব, ফুটবল নিয়ে সময় কাটতে থাকে। কিন্তু পাড়ায় ফুটবল খেলে তো আর জীবন কাটবে না। বয়স বাড়ে। সমবয়সী বন্ধুবান্ধবরা সবাই কাজের ধান্দা শুরু করে। কেউ কলকাতা চলে যায়। কেউ বা স্থানীয় কোনও আপিসে বা কলকারখানায় কাজে ঢোকে। নিত্য আর পূর্ণ ভাবতে বসে কী করবে। দশটা পাঁচটার প্রথাগত চাকরি করার ইচ্ছা দু'জনের কারুরই ছিল না। ভেবেচিন্তে একটা উপায় বেরোয়।

ওই এলাকায় একটা মিষ্টি জাতীয় জিনিসের খুব চল ছিল সেই সময়। কনকচূর ধানের খই আর নলেন গুড় মিশিয়ে অনেকেই বাড়িতে খাওয়ার জন্য বা আত্মীয়স্বজন এলে দেওয়ার জন্য ঘরে বানাতেন সেই মিষ্টি। কেউ কেউ বলতো মোয়া। কেউ আবার স্থানীয়ভাবে অন্য নামেও ডাকতো। দুই বন্ধু ঠিক করল এই মোয়ারই দোকান দেবে তারা।

১৯২৯ সালে জয়নগর স্টেশনের কাছে তৈরি হয় সেই দোকান। দুই বন্ধুর এই দোকানকেই জয়নগরের প্রথম প্রথাগত ও বাণিজ্যিক মোয়ার দোকান ধরা হয়। চিরাচরিত তৈরি প্রক্রিয়ায় কিছুটা উদ্ভাবনী শক্তি মিশিয়ে মোয়াকে আরও লোভনীয় করে তোলেন তাঁরা। ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকে তাঁদের তৈরি মোয়া। নিত্য গোপালের ডাকনাম ছিল বুঁচকি। গোটা জয়নগর সেই দোকানকে চিনতে শুরু করে বুঁচকিবাবুর দোকান হিসেবে। ক্রমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক ছোট্ট জনপদের সীমা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে বুঁচকিবাবুর মোয়ার নাম। স্থানীয় ঘরোয়া মিষ্ঠান্ন হয়ে ওঠে আস্ত একটা ব্র্যান্ড।

আজও জয়নগর এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের অনেকেই বুঁচকিবাবুর মোয়ার স্মৃতিচারণায় নস্টালজিক হয়ে পড়েন। এরকমই একজনের কথায়, 'জয়নগরের মোয়া তো বুঁচকিবাবুর হাতেই তৈরি। মোয়া কী হতে পারে, উনিই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সত্যি বলতে মোয়ার নামটা থেকে গিয়েছে। কিন্তু বুঁচকিবাবুর মোয়ার সেই স্বাদ আজকাল আর নেই।'

অনেকে অবশ্য দাবি করেন, বুঁচকিবাবুদের আগে থেকেই জয়নগর এলাকায় মোয়া বিক্রির চল ছিল। হাটে বাজারে অনেকেই ঘরে তৈরি মোয়া এনে বিক্রি করতো। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেকেই একমত যে জয়নগরের মোয়া নাম দিয়ে মোয়ার আলাদা একটা বিপণি প্রথম নিয়ে আসেন বুঁচকিবাবুরাই। এবং জয়নগরের মোয়ার আজকের যে পরিচিতি এবং ব্যাপ্তি, তার জন্য বুঁচকিবাবু ও তাঁর বন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য।

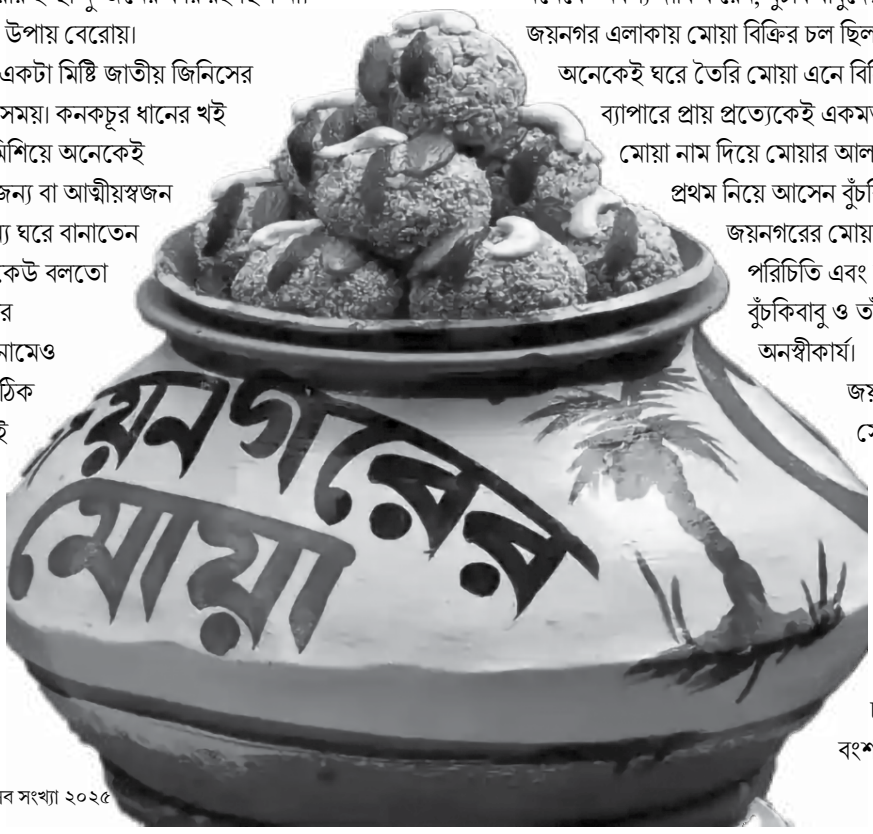

জয়নগরে বুঁচকিবাবুর সেই দোকান আজও আছে। বুঁচকিবাবু অবশ্য নেই। ১৯৯৫ সালে মারা যান তিনি। তার বছর দুয়েক পর চলে যান বন্ধু পূর্ণ চন্দ্রও। বুঁচকিবাবুর বংশধররা কেউ আর

মোয়ার ব্যবসায় আসেননি। এখন সেই দোকান চালাচ্ছেন পূর্ণচন্দ্রের ছেলে অশোক ঘোষ। ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে দোকানে আসতেন। খুব কাছ থেকে দেখেছেন সামান্য ঘরোয়া একটা মিষ্টির ব্র্যান্ড হয়ে ওঠা। আজ স্মৃতিচারণায় রীতিমতো নস্টালজিক আশি ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধ। তিনি বলেন, 'সে একটা দিন ছিল। তখন তো আর আজকালকার মতো প্রচার ছিল না। তবু কত দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসত। হাঁড়ি হাঁড়ি মোয়া কিনে নিয়ে যেত।

আজকাল জয়নগরের মোয়ার নাম দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিক্রি হচ্ছে অনলাইনেও। শীতের মরসুমে প্রায় রোজই বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে মোয়া।' অশোকবাবুর দোকান থেকেও দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় মোয়া যায়। এমনকী বহু মানুষ বাইরে থেকে শুধু মোয়ার টানেই ছুটে আসেন জয়নগরে। মোয়ার এই ব্যাপ্তির পুরো কৃতিত্বটাই বুঁচকিবাবুকে দিচ্ছেন অশোক ঘোষ। তাঁর কথায়, 'ওঁরাই তো মানুষকে মোয়া চেনালেন। মানুষ বুঁচকিবাবুর মোয়া বললে এক ডাকে চিনতো। সেই জায়গাটা ওরা তৈরি করেছিলেন।'

তবে অশোকবাবুর ক্ষোভ, আজকাল প্রতিযোগিতার চক্করে মোয়ার মান ক্রমশ কমছে। বলেন, 'বুঁচকিবাবুর মোয়ার স্বাদ কিন্তু অন্যরকম ছিল। এখন কে কত কমে দিতে পারে তার লড়াই লেগে গিয়েছে। সে স্বাদ আর নেই। আগে মোয়ায় ক্ষির মেশানো হত না। আজকাল সবাই ক্ষির মেশাচ্ছে। মানুষও ভাবছে ওটাই ভালো। বাধ্য হয়ে আমরাও দিচ্ছি। গুড়ের মানও অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে আজকাল। আসল গুড় তো পাওয়াই যায় না।'

জয়নগরের মোয়ার ব্যপ্তিতে বুঁচকিবাবুর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই তুলনায় কেনও সম্মান তাঁর জোটেনি। জয়নগরের প্রবীণ নাগরিকদের বরিষ্ঠ অংশের মত অন্তত তেমনটাই। একমত অশোকবাবুও। তাঁর কথায়, 'পূর্ণ চন্দ্রের কথা ছেড়েই দিলাম। আজকাল যাঁরা মোয়ার ব্যবসায় নেমেছেন তাঁরা ক'জন বুঁচকিবাবুর নামটা জানে, আমার সন্দেহ আছে। আমার দোকানে একটা বড় পোট্রেট ছবি ছাড়া গোটা জয়নগরে মনে হয় না বুঁচকিবাবুর কোনও চিহ্ন আছে। অথচ তাঁর হাত ধরেই এত কিছু। তাঁর দেখিয়ে যাওয়া পথেই আজ কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে।'

জয়নগরের নতুন প্রজন্মের মোয়া ব্যবসায়ীদের অন্যতম রাজেশ দাস। মোয়ার প্রচার ও প্রসারে স্থানীয় তরুণদের একটা দল অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। রাজেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অনলাইনে মোয়া বিক্রি চালু হয়েছে তাঁদের হাত ধরেই। রাজেশের কথায়, 'বাণিজ্যিকভাবে মোয়ার বিপণন চালু করেছিলেন বুঁচকিবাবু এবং পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। ওঁরা না থাকলে মোয়া তো বটেই, জয়নগরের নামটাই হয়তো অচেনা থেকে যেত অনেকের কাছে। সেদিক থেকে ওদের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ঠিক নতুন প্রজন্মের অনেকেই ওদের নামটুকু জানেন না। আরও একটু সম্মান ওদের প্রাপ্য।'

মোয়া কার, চিরকালীন তরজা দুই প্রতিবেশী জনপদের

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। শীতটা সবে জাঁকিয়ে পড়তে শুরু করছে। এরকমই এক সকালে কলকাতা থেকে জয়নগরে হাজির দুই বন্ধু। তবে এসেই পড়ে গিয়েছেন মহাফাঁপরে। কথা বলে জানা গেল, গাড়ি নিয়ে প্রায়ই এমন হুটহাট অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়েন দু'জনে। ছুটি পেলেই ঘুরে আসেন কাছে পিঠে। সেরকমই ঘুরতে ঘুরতে এদিন এসেছেন জয়নগর। ঘোরা তো আছেই। সঙ্গে চান আসল জয়নগরের মোয়া চেখে দেখতে। কিন্তু জয়নগরের ঢোকার মুখেই তাঁদের ধন্দে ফেলে দিয়েছে বিশাল বিশাল বহরুর মোয়া লেখা সাইনবোর্ড। কলকাতাবাসী দুই বন্ধু বরাবরই জয়নগরের মোয়ার নাম শুনে এসেছেন। বহরুর কথা তাঁরা জানেন না। জয়নগরে এসে হঠাৎ বহরুর মোয়া লেখা দেখে তাই ধন্দে পড়েছেন দু'জনেই।

শোনা যায়, মোয়ার জন্ম বহরুতেই। এ ব্যাপারে একাধিক জনশ্রুতি আছে। সেরকমই একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী, আজ থেকে প্রায় দেড়শো-দুশো বছর আগে বহরুর জনৈক যামিনীবুড়ো নামে এক ব্যক্তি কোনও এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য ঘরে থাকা কনকচূর ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেন গুড় মিশিয়ে এই মিষ্টান্ন তৈরি করেন। তিনিই নাকি নাম দেন মোয়া।

মোয়া নিয়ে এই বিভাজনটা দীর্ঘদিনের। জয়নগরের পাশেই ছোট জনপদ বহরু। এই এলাকার ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি, মোয়া তাদের। নিজেদের দাবি পোক্ত করতে দোকানের ব্যানারে বহরুর মোয়া লিখেই প্রচার করে তারা। এদিকে জয়নগরের ব্যবসায়ীদের বরাবরের দাবি, মোয়ার আসল কারিগর তাঁরাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের দোকান জুড়ে থাকে জয়নগরের মোয়ার প্রচার। প্রতিবেশি দুই জনপদের এ হেন চাপা তরজায় প্রত্যেক বছরই সরগরম থাকে মোয়ার মরসুম।

সড়কপথে কলকাতার দিক থেকে জয়নগর গেলে বহরুই আগে পড়বে। শীতের শুরুতেই মোটামুটি কার্নিভালের চেহারা নেয় এই এলাকা। পরপর মোয়ার দোকান বসে যায় রাস্তার ধার ধরে। বাহারি আলোয় ঝলমল করে গোটা চত্বর। উল্টোদিকে মোয়ার মরসুমে সেজে ওঠে জয়নগরও। স্টেশনের দুইদিক জুড়ে প্রচুর

দোকান বসে। রঙিন ফ্লেক্সে ঢেকে যায় চারদিক। এত ঝলকানির মাঝে অবশ্য থেকেই যায় সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব- মোয়া কার।

এই দ্বন্দ্বের শুরু কোথায়। শোনা যায়, মোয়ার জন্ম বহরুতেই। এ ব্যাপারে একাধিক জনশ্রুতি আছে। সেরকমই একটি জনশ্রুতি অনুযায়ী, আজ থেকে প্রায় দেড়শো-দুশো বছর আগে বহরুর জনৈক যামিনীবুড়ো নামে এক ব্যক্তি কোনও এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য ঘরে থাকা কনকচূর ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেন গুড় মিশিয়ে এই মিষ্ঠান্ন তৈরি করেন। তিনিই নাকি নাম দেন মোয়া। যদিও, প্রাথমিকভাবে এই মিষ্ঠান্ন অন্য নামেও এলাকায় পরিচিত ছিল বলেও অনেকে বলেন। পরবর্তী কালে আশেপাশের অনেকেই এইভাবে খই ও গুড় মিশিয়ে মোয়া তৈরি শুরু করেন। শোনা যায়, বহরুর ঘরে ঘরে সেই সময় মোয়া তৈরি হতো। বাড়িতে খাওয়ার জন্য বা আত্মীয় স্বজন এলে দেওয়ার জন্য অনেকেই বানিয়ে রাখতেন। এইভাবেই একদিন এই মোয়া স্থানীয় ভাবে বিক্রি বাটাও শুরু হয়। বহরু ছোট জনপদ। সেখানে বাজার হাট নেই। বাজার ছিল অপেক্ষাকৃত বড় জনপদ জয়নগরে। বহরু থেকে মোয়া নিয়ে তাই স্থানীয় মানুষ জয়নগরের হাটে বিক্রি করতে যেতেন। সেখানেই এই ঘরোয়া মিষ্ঠান্নের সঙ্গে পরিচয় হয় বহু মানুষের। হাট থেকে অনেকেই মোয়া কিনতে শুরু করেন। অনেকে বাইরেও নিয়ে যেতে থাকেন। যেহেতু জয়নগরের বাজারে

মোয়া ব্যবসার সঙ্গে পরোক্ষভাবেও বহু মানুষের রুটি রুজি জড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শিউলিরা। কনকচূড় ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেনগুড় মিশিয়ে তৈরি হয় মোয়া। মোয়ার মান অনেকটাই নির্ভর করে নলেনগুড়ের মানের ওপর। আবার গুড় কেমন হবে তা নির্ভর করে খেঁজুর রসের ওপর।

বিক্রি হচ্ছে, তাই বাইরের লোকজনের কাছে এর পরিচিতি হয়ে দাঁড়ায় জয়নগরের মোয়া। সেই থেকে এই নামেই মোয়াকে চিনতে শুরু করে মানুষ। বহরুর মানুষের ক্ষোভ, মোয়ার আঁতুরঘর তাঁদের এলাকাই, কিন্তু সেই তুলনায় মানুষ তাঁদের নামের সঙ্গে পরিচিত নন।

বহরুর অন্যতম প্রাচীন মোয়া বিক্রেতা মহাদেব দাস। আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে জয়নগরের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম বহরুর মোয়া লিখে প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর দেখানো পথেই এখন এলাকার সব দোকানই বহরুর মোয়া লেখে। মহাদেববাবুর বড়ছেলে গণেশ দাস বলেন, ‘কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত আমরা সবাই জানি। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে মাটির পুতুলটা আসলে তৈরি হয় কৃষ্ণনগরের কাছেই ঘূর্ণি বলে একটা গ্রামে। অথচ সবাই কৃষ্ণনগরের নামই জেনে আসছে। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। মোয়ার আঁতুরঘর এই বহরু। নাম হচ্ছে জয়নগরের।’

মহাদেববাবুরই ছোট ছেলে রমেশ দাসের কথায়, ‘বহরু এলাকায় ঘরে ঘরে মোয়া তৈরি হচ্ছে। কুটির শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ব্যাপারটা। জয়নগরে কখনওই এই জিনিস পাবেন না। এটা এখানকার ঐতিহ্য বলতে পারেন। কলকাতা বা অন্যান্য জায়গায় যত মোয়া দেখবেন তার বেশিরভাগই কিন্তু এখানকার।’

এলাকার অন্যতম নামী মোয়া বিপণির মালিক রঞ্জিত ঘোষের কথায়, ‘আমরাই সঠিক প্রক্রিয়া মেনে মোয়াটা তৈরি করি। তাই স্বাদের দিক থেকেও আমাদের মোয়া অনেক এগিয়ে। জয়নগরের মোয়া যে জিআই পেয়েছে তা কিন্তু আমাদের দোকানের মোয়া দেখিয়েই।’

এর পাল্টা যুক্তিও আছে। যাঁর হাত ধরে মোয়ার প্রথাগত বাণিজ্যিক বিপণি শুরু, সেই বুঁচকিবাবুর দোকানের বর্তমান কর্ণধার অশোক ঘোষের কথায়, ‘অনেকে অনেক কথা বলেন। কিন্তু মোয়া ঠিক কবে কীভাবে শুরু হল কেউ বলতে পারে না। আমার কথা হচ্ছে, যদি বহরুতেই শুরু হবে তাহলে জয়নগরের মোয়া নামটা প্রচলিত হল কীভাবে।’

তাঁর আরও যুক্তি, মোয়া জয়নগরেরই। বহরুর লোকেরাও সেটা জানে। তার জন্যই দেখবেন ওদের ব্যানারে বহরুর মোয়া লেখা থাকলেও, অনেকেই ছোট করে জয়নগরের অধীনস্থ বহরু কথাটাও লিখে রাখে। নাহলে লোকে খাবে না যে।

জয়নগরের অন্যতম নামী মোয়া বিক্রেতা খোকন দাসের কথায়, ‘হতে পারে প্রথম বহরুতেই মোয়া তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার প্রচার প্রসারে জয়নগরই এগিয়ে। সে কারণেই মানুষ জয়নগরের মোয়া হিসেবেই চিনে আসছেন। মোয়া মানেই জয়নগর।’ জয়নগরের আর এক প্রখ্যাত মোয়ার দোকানের মালিক স্বরূপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘বহরুর মোয়া স্বাদে সেরা, একথা মানি না। আমাদের মোয়ার স্বাদ কোনও অংশে কম নয়। দূরদূরান্তের মানুষ জয়নগরের মোয়া খেতেই ছুটে আসেন।’

মোয়াকে কেন্দ্র করে সেজে ওঠে এলাকা, বদলে যায় অর্থনীতিও

মোয়াকে কেন্দ্র করে শীতের দু-তিন মাস রীতিমতো সেজে ওঠে জয়নগর ও সংলগ্ন এলাকা। শীতকাল আসা মানেই বদলে যায় এলাকার চেহারা। বড় রাস্তার ধার ধরে একের পর এক দোকান বসে। রঙিন ফেস্টুন, আলোর ঝলকানিতে সে যেন এক মস্ত উৎসব শুরু হয়ে যায়। বহু মানুষ মোয়ার টানে দূর দূরান্ত থেকে এই সময় জয়নগরে আসেন। গ্রামীণ এলাকার রীতি, এলাকায় কোনও বড় উৎসব হলে আত্মীয় স্বজনকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। মোয়ার মরসুমেও জয়নগরের বহু বাড়িতে আত্মীয় স্বজনেরা ভিড় করেন।

এলাকার অনেকে আবার নিয়ম করে মোয়া পাঠান আত্মীয় পরিজনদের বাড়ি। এলাকার বাসিন্দা যাঁরা বাইরে কাজে যান, সহকর্মীদের মোয়ার আব্দার সহ্য করতে হয় শীতকাল এলেই। কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন এমন অনেকেই মোয়ার সময় ক'দিনের জন্য হলেও ঘরে ফেরেন।

মোয়াকে কেন্দ্র করে এই মাস তিনেক বদলে যায় এলাকার আর্থ সামাজিক অবস্থাও। জয়নগর, বহড়ুতে একাধিক নামকরা মিষ্টির দোকান রয়েছে। শীতকাল এলেই যারা নিয়মিত মিষ্টির পাশাপাশি মোয়ার পসরা সাজিয়ে বসে। এছাড়াও অসংখ্য ব্যবসায়ী আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র এই তিন মাসের জন্যই দোকান দেন। কলকাতার দিক থেকে সড়কপথে জয়নগর গেলে আগে পড়বে বহড়ু। এই বহড়ু ঢোকার আগে থেকেই রাস্তার দু'ধারে দোকানগুলি চোখে পড়বে। জয়নগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়ও এরকম বহু দোকান বসে। এলাকার বাইরে বারুইপুর-সহ জেলার অন্য নানা জায়গায় মোয়ার পসরা নিয়ে দোকান দেন জয়নগর-বহড়ুর বহু মানুষ। এছাড়া এই এলাকার গ্রামে গ্রামে বহু বাড়িতে মোয়া তৈরি হয়। বাড়ির মহিলারা অবসরে খেঁজুর রস থেকে গুড় তৈরি করেন। তারপর সেই গুড়ের সঙ্গে কনকচূড় ধানের খই মিশিয়ে তৈরি হয় মোয়া। জয়নগর, বহড়ুর ঘরে ঘরে তৈরি এই মোয়া পৌঁছে যায় কলকাতা-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে। বহু মানুষ নিজেদের নিয়মিত পেশা ছেড়ে এই সময় গ্রামের বাড়ি বাড়ি থেকে মোয়া কিনে শহরের দোকানে সরবরাহ করে রোজগার করেন। ইদানীং অনলাইনে মোয়া বেচেও রোজগার করছেন কেউ কেউ।

মোয়া ব্যবসার সঙ্গে পরোক্ষভাবেও বহু মানুষের রুটি রুজি জড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শিউলিরা। কনকচূড় ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেনগুড় মিশিয়ে তৈরি হয় মোয়া। মোয়ার মান অনেকটাই নির্ভর করে নলেনগুড়ের মানের ওপর। আবার গুড় কেমন হবে তা নির্ভর করে খেঁজুর রসের ওপর। খেঁজুর গাছের রস ফুটিয়েই তৈরি হয় এই গুড়। এই খেঁজুর গাছ থেকে যাঁরা রস পাড়েন তাঁদেরই স্থানীয়ভাবে বলা হয় শিউলি। শীত এলেই কদর বাড়ে এই শিউলিদের। অনেকেই বংশপরম্পরায় এই কাজই করে চলেছেন। আবার অনেকেই আছেন, সারাবছর অন্য কাজ করে রুটি রুজির সংস্থান করেন। শীত এলেই ফিরে আসেন এই পেশায়। নামি মোয়ার দোকানগুলির বাধা শিউলি থাকে। বছরের পর বছর ধরে সেই দোকানেই রস সরবরাহ করেন তাঁরা।

সম্প্রতি মোয়া বেশি দিন তাজা রাখার লক্ষ্যে এলাকায় একটি বিশেষ যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা চলছে। রাজ্য সরকারের তরফে এই বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। এমনিতে তৈরির পর দিন তিনেক তাজা থাকে মোয়া। কিন্তু প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ওই বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় মাসখানেক মোয়া তাজা রাখা সম্ভব হবে। ফলে মোয়া রফতানির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। রাজ্যের বাইরে, এমনকী বিদেশেও মোয়া রফতানি করা যাবে সহজেই। আর তা হলে এলাকার অর্থনৈতিক চিত্রেও বড় পরিবর্তন আসবে। মোয়া ব্যবসায়ীদের লাভের অঙ্ক বাড়বে। সেই সঙ্গে বিদেশে বসেও মিলবে জয়নগরের মোয়ার স্বাদ।

ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ শেষ হয় মোয়ার মরসুম। এলাকা জুড়ে তখন উৎসব শেষের বিষণ্ণতা। পথের ধারের দোকানগুলি একটা একটা করে উঠে যায়। মিষ্টির দোকানগুলিও মোয়া ছেড়ে ধীরে ধীরে রসগোল্লা-পান্তুয়া-সন্দেশে ফিরে যায়। আলোর ঝলকানি ক্রমে কমে আসে। অন্য কাজ ছেড়ে যারা মোয়া বিক্রি, তৈরি বা খেঁজুর রস পাড়ার কাজে যুক্ত হন, তাঁরা আবার নিজেদের পেশায় ফেরেন। এলাকাজুড়ে শুরু হয় বছরভরের প্রতীক্ষা।

মোয়ার সেকাল-একাল

একসময় ছিল শুধু খই-গুড়ের মিশ্রণ। কালে কালে তাতে যোগ হল ঘি-ক্ষির। মিশলো কাজু-কিসমিস-পেস্তা। ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে চকোলেট ফ্লেভারেও।

বছর দু'য়েক হল মোয়া-চকোলেটের ফিউশন বাজারে এসেছে। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে চকোলেট মোয়া।

জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস বলছিলেন, 'শুধু খই আর নলেন গুড়ের মিশ্রণে মিষ্টির পরিমাণ অনেকটাই বেশি ছিল। ফলে অনেকে তা পছন্দ করতেন না। ক্ষির মিশিয়ে দেখা গেল মিষ্টি কিছুটা কমছে। মানুষের ভালও লাগছে। ধীরে ধীরে এটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এখন তো সকলেই ক্ষির দেয়। আরও নানা কিছু মেশানো হচ্ছে।' বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী রঞ্জিত ঘোষের কথায়, 'প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মোয়া বানাচ্ছি। পরিবর্তন অনেক হয়েছে। একসময় কনকচূড়ের খই আর নলেনগুড়ের পাকে মোয়া তৈরি হত। এখন ক্ষির দেওয়া হচ্ছে। কাজু-পেস্তা দেওয়া হচ্ছে। আসলে যুগের সঙ্গে তাল মেলাতেই এসব করতে হচ্ছে। তবে তাতে স্বাদ কিন্তু বেড়েছে। বহু মানুষ এটাই পছন্দ করছেন।' জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ী তিলক কয়াল বলেন, 'সেই গুড় নেই। ফলে স্বাদের পরিবর্তন তো হবেই। দিন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বদল এনে তাই স্বাদ ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ব্যবসায়ীরা মানছেন, আজকাল গুড়ের মান পড়েছে। খেঁজুর গাছের রস জাল দিয়ে তৈরি হয় গুড়। গুড় তৈরির গোটা প্রক্রিয়াটা যাঁরা করেন, সেই শিউলির সংখ্যা কমে গিয়েছে। খেঁজুর গাছের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে হু হু করে। ফলে আগের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে খাঁটি নলেন গুড় মিলছে না। ফলে খই-গুড়ের মিশ্রণের চিরাচরিত স্বাদ ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাই স্বাদ ফেরাতেই তৈরি-পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন আসছে। অনেকে তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। অনেকে আবার পুরোনো স্বাদের আক্ষেপে হা-হুতাশ করছেন।

স্বাদ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে মোয়ার দামও। বেশ কয়েকটি দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সবচেয়ে ভাল মোয়ার দাম কেজি প্রতি প্রায় ৫০০ টাকা। বছর দশেকে এই দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। রঞ্জিত বলেন, 'জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। তার ওপর

মোয়ার উপকরণও বেড়ে গিয়েছে। ফলে দাম বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই।'

দাম বেড়েছে। বদলেছে স্বাদও। কিন্তু তাতে অবশ্য চাহিদার হেরফের নেই। আজও শীত এলেই মোয়ার টানে ভিড় বাড়ে জয়নগর-বহড়ুতে।

জয়নগরের মোয়ার বিদেশ যাত্রা এখন রোজকার ঘটনা

বহড়ু থেকে সুইডেন-মালয়েশিয়াও পাড়ি দিয়েছে মোয়া। জয়নগরের একটি দোকান থেকে নিয়মিত মোয়া রফতানি হচ্ছে কানাডা-নিউ ইয়র্কে। দেশের মধ্যেও বেঙ্গালুরু, আমেদাবাদে প্রায় রোজই রফতানি হচ্ছে খই-গুড়ের মিশেলে তৈরি শীতের এই মিষ্টি। এমনকী কলকাতার সব বড় দোকানে আলাদা করে বিক্রি হচ্ছে জয়নগরের মোয়া। এরই মধ্যে কিছু ব্যবসায়ী অনলাইন বিক্রির ব্যবস্থাও চালু করেছেন। কলকাতা বা আশেপাশের এলাকা থেকে অর্ডার করলে দিনের দিনই মোয়া পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন তাঁরা।

মোয়ার বিদেশযাত্রা আজকাল রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, বিদেশে বা ভিন্ রাজ্য থেকে আজকাল এত অর্ডার আসছে, সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

বছর কয়েক আগে মূলত মোয়া রফতানির জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি হয়। সেই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে মোয়া অর্ডার করার সুযোগ মেলে। এর মধ্যেই জিআই সম্মান পায় জয়নগরের মোয়া। তারপর মোয়া রফতানিতে এ গিয়ে আসে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সুরক্ষা দফতর। তাদের উদ্যোগে একাধিক বার বিদেশে পাড়ি দিয়েছে মোয়া। সুদূর বাহরিনেও মোয়া সরবরাহ করেছে ওই সংস্থা। মোয়া রফতানিতে সাহায্যের হাত বাড়ায় ভারতীয় ডাক বিভাগও। ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের নানা জায়গায় মোয়া রফতানি শুরু হয়। জয়নগরের মোয়ার ছবি-সহ একটি বিশেষ খাম প্রকাশ করে ভারতীয় ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগের কর্তারা জানান, জয়নগরের মোয়ার জনপ্রিয়তার প্রসারে এই খাম বড় ভূমিকা নেবে।

মোয়া ব্যবসায়ীরা নিজেরাও মোয়ার রফতানি শুরু করেছেন। জয়নগরের একটি পুরনো মোয়ার দোকান যেমন নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করেছে। ওই দোকান সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের কাছে ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে অর্ডার আসছে। তবে মোয়া রফতানিতে সমস্যাও রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানান, তৈরির পর তিন-চার দিন পর্যন্ত মোয়ার স্বাদ অটুট থাকে। কিন্তু দূরে রফতানি হলে অনেক সময় যেতে বেশি সময় লেগে যায়। ফলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে চাহিদা থাকলেও অনেক সময় দূর-দূরান্তে মোয়া পাঠাতে পারেন না ব্যবসায়ীরা। এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'মোয়ার চাহিদা প্রচুর। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ মোয়া খেতে চেয়ে আমাদের বলেন। কিন্তু আমরা পাঠাতে পারি না। কারণ পৌঁছতে সময় লাগলে মোয়ার আসল স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

তবে বিদেশে না হোক, এ রাজ্যের মানুষ চেটেপুটে মোয়ার স্বাদ নিতে পারবেন নিঃসন্দেহে। সামনেই পুজো। তা পার করলেই আসছে মোয়ার মরসুম। তাই ছেলের হাতের মোয়া না হোক জয়নগরের মোয়া কিন্তু চেখে দেখতেই হবে।

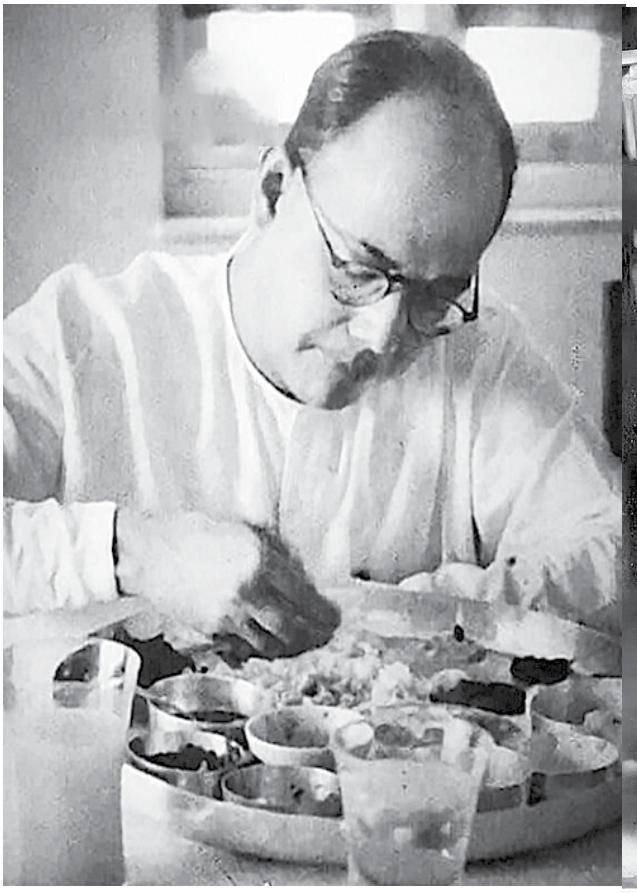

রসিক নেতাজীর খাওয়ার অভ্যাস

এ যেন এক অন্য নেতাজী। খাবার টেবিলে রসিকতায় ভরা। খেতে বসলেই তিনি এক দিলখোলা মানুষ। যেন চেনা যায় না। নেতাজীর এই অন্য রূপের খোঁজ দিলেন প্রবীণ সাংবাদিক গৌতম ঘোষ।

সকাল ঠিক আটটায় প্রাতঃরাশ। দুটো সিদ্ধ ডিম আর দু'কাপ চা। চা অবশ্যই সবসময় খেতেন। সুযোগ পেলেই। প্রাতঃরাশের পর দিনের প্রথম সিগারেটটা ধরাতেন। তারপর চলত একটার পর একটা। সারাদিনে ৩০ থেকে ৪০টা। জাপানি সেনানায়কদের সঙ্গে তিন-চার ঘন্টা আলোচনার সময় একেবারে চেনস্মোকার ছিলেন। দুপুরে খাওয়ায় আগেও নেতাজী চা পানে বিরামহীন থাকতেন। দুপুরে আহার বলে যে একটা ব্যাপার আছে সেটা বেমালুম ভুলে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে ছিল নিতান্ত সাধারণ ঘটনা। সেটা মনে করানোর দায়িত্ব থাকত তাঁর পার্সোনাল স্টাফদের। অথচ ওদের কথা উনি ভুলতেন না। প্রতিবার নিজে চা পান করার সময় জানতে চাইতেন, রাজুকে চা দিয়েছ? ভাস্করকে দিয়েছ? তখন তাঁরা হয়তো কেউ বলতেন, "খিদের মুখে আর চা খাব না স্যার"। নেতাজী মুখ টিপে হেসে বলতেন, এত ঘুরিয়ে বলছ কেন হে? বেশ চল, এবার লাঞ্চ করা যাক। বেলা দুটো নাগাদ বসতেন দুপুরের ভাত খেতে। সবাই এক টেবিলে। খাদ্য তালিকা খুব সাধারণ। ভাত, সিদ্ধ তরকারি, এক প্লেট করে দই, পাকা কলা আর শেষে চিনি ছাড়া কফি। কলা খাওয়া নিয়ে নেতাজী মজা করতেন কলা পরিবেশক নিকষ কালো কালীকে নিয়ে। কালীর বয়স ছিল ২২ কী ২৩। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সিঙ্গাপুরে নেতাজী প্রথম আসার পর থেকে কালী ওর টেবিলবয়। মালয় ছেড়ে নেতাজী কেন্দ্রীয় দফতর বার্মায় এলেন। কালীও সিঙ্গাপুরে তাঁর পরিবার ছেড়ে রেঙ্গুনে হাজির। তখন সিঙ্গাপুরে কালীর বাবা, মা, ভাই বোন ছাড়াও সদ্য বিয়ে করা কিশোরী নতুন বউ। কালী দুপুরের খাওয়ার সময় দাঁত বার করা কলা নিয়ে হাজির হতেই নেতাজী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা

শুরু করে দিতেন। নেতাজী বলতেন, কালী আজ কেলেকা কিতনা দিয়া? অর্থাৎ কলার জন্য কত খরচ পড়েছে? একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি রোজ করতেন। আজ ক্যায়া ভাও হ্যায়? কালী আজ বননা ক্যায়সা মিলা? - বনানাকা ভাও বরতা হ্যায় ক্যায়া ? মনে হত পাকা কলা নয়, দেশের কলা শিল্পের প্রতি নেতাজীর আগ্রহ আছে। উত্তরে কালী একটা সলজ্জ হাসি দিত। তারপর শুনিয়ে দিত কলার দাম। যেদিন দর বেশি মনে হোত, সেদিন নেতাজীকে রীতিমতো বিমর্ষ লাগত। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলতেন, কালী বহুত মহেঙ্গা হো গয়া। কালসে ক্যায়সে খরিদেঙ্গে? কালী এতটা নির্বোধ নয় যে রসিকতা বুঝত না। তবু গম্ভীর মুখে এমনভাবে মাথা নীচু করে থাকত, যেন কাল থেকে কলা কেনার জন্য নেতাজীকে ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিতে হবে। তারপর মাথা নেড়েই পেছন ফিরত আর ফিক করে হেসে ফেলত। নেতাজী ছেলেমানুষের মতো ওই অভিনয়টুকু উপভোগ করতেন। খাবার টেবিলে নেতাজী বরাবর সরস গল্প ও রসিকতা করতেন। কখনো সিরিয়াস আলোচনা পছন্দ করতেন না। খাবারে আসক্তি ছিল না, কিন্তু রান্নার গুণাগুণ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে কী রান্না করা হয় শোনাতেন। রাতে খাওয়ার শেষে অনেকদিন নেতাজী দই খেতেন। এক রাতে হাজির ছিলেন ইয়ালাপ্পাজি। পাতে দই দেওয়া হয়েছে। কে একজন বলল, গরুর থেকে মোষের দুধের দই জমে ভালো। উপকারীও। নেতাজী সায় দিলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করলেন ইয়ালাপ্পাজি। বলেন, "খেতে ভালো লাগলেও মোষের দুধ রোজ না খাওয়াই উচিত।" কেন? নেতাজী প্রশ্ন করলেন।

রোজ মোষের দুধের দই খেলে বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধি মোটা হয়। নেতাজী গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনি যখন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলছেন, তখন আর তর্ক করি কোন সাহসে? ইয়ালাপ্পাজি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। আর সবাই হেসে উঠলেন। ইয়ালাপ্পাজিও যোগ দেন হাসিতে। নেতাজী এরপর বলেন, কী হল? আপনারা হাসছেন কেন? আবার সবাই হেসে ওঠেন।

আর একদিন। সেদিন ডিনারে অতিথি আনন্দমোহন সহায়। আজাদ হিন্দ সরকারের সেক্রেটারি। খাওয়াদাওয়া শেষে কফি খাওয়া হচ্ছে। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আলোচনায় উঠে এল সাংহাই শিবির। যার পরিচালনায় কিছু গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। নেতাজীর ইচ্ছে সেটা নিয়ে তদন্ত হোক, আর তদন্তের ভার নিক আনন্দমোহন। কিন্তু ওই সময় আনন্দমোহন অন্য একটি জরুরি কাজে ব্যস্ত। তাই এস এ আইয়ার বলেন, তাহলে টোকিওতে আমাদের লিগের সভাপতি রামমূর্তিকে দায়িত্ব দিলে কেমন হয়? সহায়জী প্রস্তাব পছন্দ না হওয়ায় আপত্তি জানালেন। নেতাজী প্রশ্ন করলেন, কেন ? রামমূর্তিকে আপনি পছন্দ করছেন না কেন?

বহুত সিধা আদমি হ্যায় সাব।

সঙ্গে সঙ্গে নেতাজি বললেন, ও! টেহরা চাইয়ে ক্যায়া? বলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, সঙ্গে বাকিরাও।

খাবার টেবিলে নেতাজী বরাবর সরস গল্প ও রসিকতা করতেন। কখনো সিরিয়াস আলোচনা পছন্দ করতেন না। খাবারে আসক্তি ছিল না, কিন্তু রান্নার গুণাগুণ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। ভারতবর্ষের কোন অঞ্চলে কী রান্না করা হয় শোনাতেন। রাতে খাওয়ার শেষে অনেকদিন নেতাজী দই খেতেন।

সেবার নেতাজীর সঙ্গে অনেকেই কুয়ালালামপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের শিক্ষা শিবিরে। সেরামবামে তখন একটা গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট মার্শালের বিচার চলছিল। ওখানে একটি চিনা মেয়ে গুপ্তচরের কোর্টমার্শাল দিতে চায় জাপান। নেতাজী তার বিরুদ্ধে। জাপান চাইছিল চিনা মেয়েটিকে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের হাতে তুলে দিক। কারণ মেয়েটি তো ভারতীয় নয়। অথচ মেয়েটির ব্যাপারে জাপানের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতায় রাজি নয়। ওখান থেকে হাবিবুর রহমান, কর্ণেল নাগর আর ড.এম এসেছেন নেতাজীর মৌখিক নির্দেশ নিতে। ড.এম প্রবাসী ভারতীয় এবং পেশায় ডাক্তার। সেরামবামে ডাক্তারি করেন। আর সেখানেই সপরিবারে থাকেন। চিনা মেয়েটির তিনি চিকিৎসা করছেন। দীর্ঘ আলোচনার পর সকলে নৈশ আহার সেরেছেন। এরপর ওদের রাতে থেকে যেতে বলেন। কারণ ওই পথে প্রায়ই গেরিলা আক্রমণ হয়। ফলে, খুব ভোরে ফিরে যাওয়াই ভালো। ডক্টর এম আপত্তি জানিয়ে বলেন, কিন্তু আমার খুব জরুরি কাজ আছে। আজই আমায় ফিরতে হবে। আর ওই পথে অনেকবার গেছি। আমায় সবাই চেনে। কিছু হবে না। নেতাজী সব শুনলেন। সাধারণত তিনি কিছু বলা মানে আদেশ। তাই নেতাজী ওপথে হাঁটলেন না। বরং সকলকে ধমক দিয়ে বলেন, তোমরা বুঝছ না কেন, ডক্টর এম কে আজ রাতে বাড়ি ফিরতে হবে। উনি কথা দিয়ে এসেছেন। কেন শুধু শুধু দাম্পত্য ঝগড়া তৈরি করছ? ডক্টর এম লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, না না স্যার তা নয়, মানে ইয়ে আচ্ছা আমি কাল সকালেই যাব। সকলে মুখ টিপে হাসে। নেতাজী একটুও না হেসে বলেন, আপনি আমাদের সামরিক বাহিনীর হলে এখনই আপনাকে বীর ই হিন্দু উপাধি দিতাম। কারণ আপনি এককথায় প্রমাণ করেছেন গেরিলা বাহিনী তো তুচ্ছ, স্বয়ং গিন্নিকেও ভয় পান না! সকলেই এরপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, এমনকী ডক্টর এম পর্যন্ত।

শুধু আবৃত্তি নয়, নিজের গলাকেও নানা মাধ্যমে কাজে লাগানো যায়

প্রখ্যাত আবৃত্তি শিল্পী **প্রবীর ব্রহ্মচারী**র পেশাদারি জীবন ৫৩ বছর পেরিয়ে গেল। মঞ্চে এখনো তিনি সমানভাবে উজ্জ্বল। শিল্পীর সঙ্গে একান্ত আলাপনে **সবুজ সেন।**

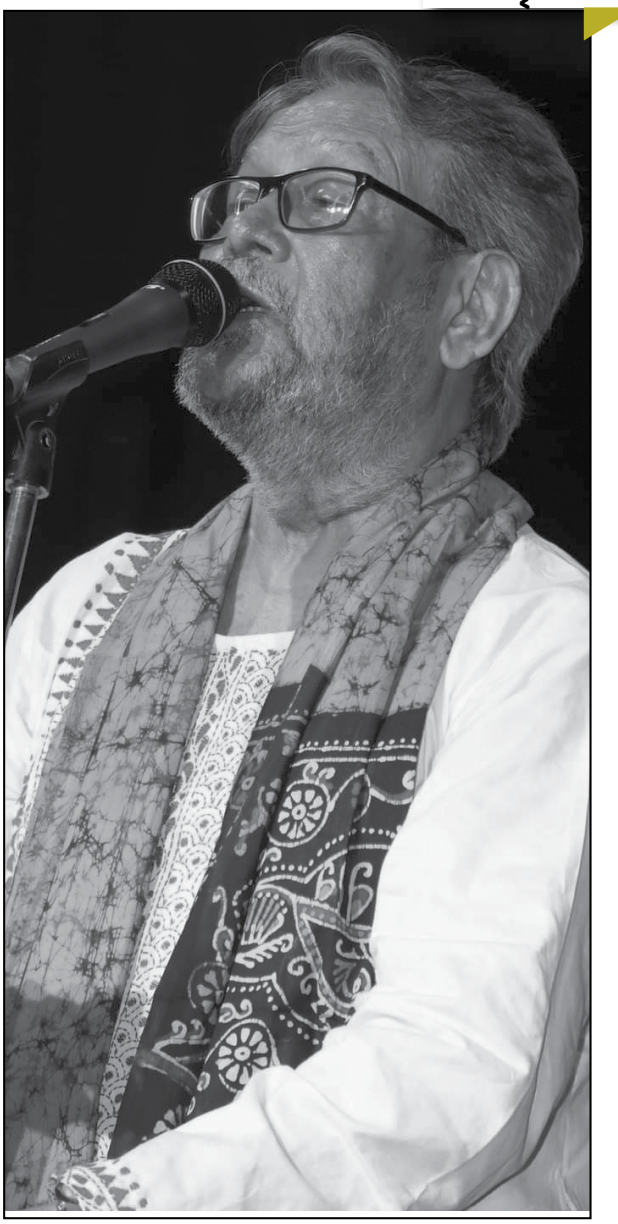

● প্রবীরদা কেমন আছেন?

● ● আমি সবসময় ভালো থাকার চেষ্টা করি। প্রিয়জনদেরও ভালো থাকতে বলি।

● বাচিক না আবৃত্তি শিল্পী কোন শব্দটা আপনার পছন্দ?

● ● আবৃত্তি শিল্পী এই কথাটা পছন্দ করি। স্মৃতি থেকে বার বার উচ্চারণ করার অর্থ আবৃত্তি। বাংলা অভিধানে এটাই বলা হয়েছে। নয়ের দর্শকের শেষে এক প্রখ্যাত শিল্পী বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসে বাচিক শিল্পী কথাটা ব্যবহার করেন। তারপর থেকে এই শব্দটি বেশ চালু হয়েছে। যেমন নজরুল গীতির বদলে নজরুল সংগীত কথা ব্যবহার হচ্ছে।

● বাচিক শিল্পী কথাটায় আপনার আপত্তি কেন?

● ● যে বাচনে দক্ষ সেই বাচিক শিল্পী। সেদিক থেকে একজন বাস কন্ডাক্টর, সেলসম্যান, রাজনীতিবিদ ও বাচিক শিল্পী, তারাও কথা বিক্রি করে খান। বরং বাচিক শিল্পীর বদলে বাচনিক শিল্পী কথাটা ভালো।

● কার কাছে আবৃত্তি শেখেন?

● ● প্রবাদপ্রতিম আবৃত্তিশিল্পী প্রদীপ ঘোষের কাছে। বাণী চক্রে তাঁর কাছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত টানা আবৃত্তি শিখেছি। এছাড়াও নানা সময়ে নানা গুণীজনের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছু শিখেছি। বলা ভালো এখনো শিখে চলেছি।

মঞ্চ থেকে নেমে দেখি মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখার্জি দাঁড়িয়ে। সেই প্রথম দুই কিংবদন্তিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখি। মান্না দে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কীসে করে এসেছি ও কীভাবে যাব? উত্তরে বলি, স্যার আমি বাসে এসেছি আর বাসেই যাব। আমার মুখে 'স্যার' শব্দ শুনে মান্না দে বলেন, আমি স্যার নই, আমি মান্নাদা।

● আপনার পেশাদার জীবনে কত বছর হল?

● ● দেখতে দেখতে ৫৩ বছর পেরিয়ে গেল। প্রথম মঞ্চে উঠি ১৯৬১ সালে।

● প্রথম পেশাদার অনুষ্ঠান কোথায়?

● ● প্রথম পেশাদার অনুষ্ঠান

করি ১৯৭২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে। শিল্পী আরতি মুখার্জির অনুষ্ঠান ছিল। আমার জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫ থেকে ২০ মিনিট। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের ভালোবাসায় অনুষ্ঠান করি ৪৫ মিনিট ধরে। ওই অনুষ্ঠানের জন্য পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম ৫০০ টাকা। যা আমার কাছে বড় পাওনা ছিল।

● অনুষ্ঠান নিয়ে বিশেষ কোনো ঘটনা মনে পড়ে?

●● ১৯৮৩ সালে টালা পার্কে একটা অনুষ্ঠানে যাই। সেটা ছিল মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখার্জি নাইট। আমার বন্ধু নির্মল দে'র সৌজন্যে ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়। অনুষ্ঠানে পিন্টু ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্ত, মাধুরী চ্যাটার্জি , হৈমন্তী শুক্লা সহ অনেক শিল্পী ছিলেন। কিন্তু শ্রোতারা তাঁদের গান শুনতে চাইছিলেন না। বারবার চিৎকার করছেন। তখন উদ্যোক্তারা আমাকে মঞ্চে ডাকেন। আমি নির্ভয়ে উচ্চস্বরে কাজী নজরুল ইসলামের 'কামালপাশা' আবৃত্তি করি। মুহূর্তে দর্শকরা থেমে যান। একটা কবিতা বলে নেমে আসব, তখন দর্শক আসন থেকে চিৎকার শুনি, তোকে আমরা নেমে যেতে বলেছি, কবিতা পড়ে যা। সাহস করে আরো কবিতা পড়ি। অনুষ্ঠান শেষ করি জীবনানন্দ দাশের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতা বলে। মঞ্চ থেকে নেমে দেখি মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখার্জি দাঁড়িয়ে। সেই প্রথম দুই কিংবদন্তিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখি। মান্না দে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কীসে করে এসেছি ও কীভাবে যাব? উত্তরে বলি, স্যার আমি বাসে এসেছি আর বাসেই যাব। আমার মুখে 'স্যার' শব্দ শুনে মান্না দে বলেন, আমি স্যার নই, আমি মান্নাদা। এরপর মান্নাদা আয়োজক সংস্থার সেক্রেটারিকে ডেকে বলেন, আমার ফেরার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে। সেই সঙ্গে সেক্রেটারির কাছে জানতে চান, আমাকে কত টাকা দেওয়া হচ্ছে। একশো বা দেড়শো টাকার কথা শুনে আমাকে ৬০০টাকা দিতে বলেন। এই ঘটনা কোনোদিন ভুলব না।

নীরেনদা, সুনীলদা, শক্তিদা, এমনকী এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় আবৃত্তি শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবেদনশীলতা আমাকে আকর্ষণ করে। সবেধনশীলতা ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না। সংবেদনশীলতা মানে অন্যের কাজকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা বা স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা।

● আর কোনো ঘটনা?

●● আর একবার আমার আবৃত্তি করতে শিক্ষক প্রদীপ ঘোষের সঙ্গে খড়গপুরে এক অনুষ্ঠানে যাই। সেখানে এক শ্রোতা আমার কাছে 'কামালপাশা' শুনতে চান। (এই শ্রোতা হয়তো টালা পার্কে আমার মুখে কামালপাশা শুনেছিলেন)। তখন আমি বলি, আমার শিক্ষক প্রদীপদার মুখে শুনতে। তাঁর কণ্ঠে এটা জনপ্রিয় হয়। তখন প্রদীপদা আমাকে মঞ্চে কামালপাশা আবৃত্তি করতে বলেন। গুরুর প্রিয় বিষয় তাঁর সামনে বলি।

● কলকাতার বাইরে কোথায় অনুষ্ঠান করেছেন?

●● দিল্লি, মুম্বাই, পুনে অনুষ্ঠান করেছি। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে দু 'বার অনুষ্ঠান করতে গিয়েছি। একবার গিয়েছিলাম জাতীয় কবিতা আবৃত্তি উৎসবে। বন্ধুবর সৌমিত্র মিত্র, শামসুর রহমান ও আরো অনেকের সৌজন্যে। দু'বারই অনুষ্ঠান করে খুব আনন্দ পেয়েছি। ওপার বাংলার লোকেরা আমার আবৃত্তি শুনে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তবে, আমি খুব বেশি বিদেশে যাওয়ার পক্ষে নই।

● রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠান করেছেন?

●● ১৯৭৬ সালে সরকারি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি শিল্পী হিসাবে নথিভুক্ত হই। রবীন্দ্র সদনে সকালবেলার অনুষ্ঠান করেছি, যা এক সুখকর স্মৃতি। দিলীপ চৌধুরী, শঙ্কর ব্যানার্জি ও চিন্ময় নন্দী - এই ৩ জনের উদ্যোগে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠানের সুযোগ পাই।

● আপনার প্রথম আবৃত্তির অ্যালবাম কবে বেরোয়?

●● আমার প্রথম অ্যালবাম বেরোয় ১৯৯০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বইমেলায় 'স্বপ্ন অপরিসীম'। উদ্বোধন করেন কবি অরুণ মিত্র। এই অ্যালবামে কবি অরুণ মিত্র, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী থেকে ব্রত চক্রবর্তী, প্রমোদ বসুর মতো তরুণ কবিদের কবিতা ছিল।

● তারপর?

●● এরপর একে একে বেরোয় আশা অডিও থেকে 'বাংলার মুখ', উদ্বোধন করেন মহাশ্বেতা দেবী ও লেখক সন্দীপন চ্যাটার্জি। রাগা মিউজিক থেকে 'আমি সেই পুরুষ', পার্পল থেকে 'মাটির অর্জুন', সাগরিকা থেকে 'জীবন ছবি', এইচএমভি থেকে 'পরিশোধ'। এছাড়াও আমার অ্যালবামের মধ্যে রয়েছে: কেউ কথা রাখেনি, শ্রাবণ সন্ধ্যা। সুচিত্রা মিত্র, রমা মণ্ডলের সঙ্গে করেছি 'মা ও ছেলে'। বিঠফোন থেকে 'সুচরিতা' নামে একটা আবৃত্তির অ্যালবামে সৌমিত্র চ্যাটার্জি, প্রদীপ ঘোষ, গৌরি ঘোষ, বিজয়লক্ষী বর্মণের সঙ্গে আমারও আবৃত্তি ছিল।

● আপনার অনুষ্ঠানে বিদগ্ধ শ্রোতা হিসাবে কাদের পেয়েছেন?

●● কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? এই তালিকায় সন্তোষ ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, যেমন রয়েছেন তেমনি

রয়েছেন পবিত্র সরকার, অমিতাভ রায়, সুভাষ চক্রবর্তী। এমনকী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও আবৃত্তি শোনানোর সুযোগ হয়।

● কার কবিতা পড়তে ভাললাগে?

● ● কবিতার রহস্যময়তা আমাকে টানে। এক্ষেত্রে নতুন কবির কবিতায় সেই রহস্যময়তা খুঁজে পেলেও আবৃত্তি করি। সব কবির লেখায় কম বেশি থাকে মাদকতা। বলার আকর্ষণে তা অন্য রূপ নেয়।

● শক্তি চ্যাটার্জি ও সুনীল গাঙ্গুলির সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সখ্যতা ছিল, একটা ঘটনা বলুন না।

● ● সব ব্যক্তিগত কথা প্রকাশ্যে না আনাই ভালো। কিছু গোপন কথা থাক না গোপনীয়। নীরেনদার (নীরেন চক্রবর্তী) একটা ঘটনা বলছি। আমার প্রথম অ্যালবাম 'স্বপ্ন অপরিসীম' বেরোনোর পর একদিন , ওঁর অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখা করতে যাই। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি আমার আবৃত্তির রেকর্ড উনি সুনীল, শক্তি, আনন্দ বাকচি সহ অন্যান্যদের শোনাচ্ছেন। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। ওই অ্যালবামে ওদের সবার কবিতা ছিল।

● মানুষ হিসাবে ওনাদের কোন বিষয় আপনাকে আকর্ষণ করেছিল?

● ● নীরেনদা, সুনীলদা, শক্তিদা, এমনকী এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় আবৃত্তি শিল্পী ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবেদনশীলতা আমাকে আকর্ষণ করে। সবেধনশীলতা ছাড়া শিল্পী হওয়া যায় না। সংবেদনশীলতা মানে অন্যের কাজকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা বা স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা।

● এখন আবৃত্তির বাজার কেমন?

● ● এই মুহূর্তে আবৃত্তির বাজার খুব ভালো। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নানা জায়গায় কবিতা পাঠ বা আবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। নামিদের পাশাপাশি আনামীদের ডাকা হয়। সরকারি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি শিল্পীদের সাম্মানিক দেওয়া হয়। আগে অনুষ্ঠানে গানের ফাঁকে ফিলার হিসাবে আবৃত্তি শিল্পীদের ডাকা হত। এখন একক অনুষ্ঠান হয়। শিল্পীর নামে টিকিট বিক্রি হয়।

● আবৃত্তি কি এখন প্রফেশন হয়ে উঠেছে?

● ● অনেকটাই। বাংলার প্রথম পেশাদার আবৃত্তি শিল্পী কাজী সব্যসাচী। পরে অনেকে ওই পথ অনুসরণ করেন। এখন অনেকেই দামি চাকরি ছেড়ে আবৃত্তি চর্চাকে পেশা বা পুরো সময়ের কাজ হিসাবে নিয়েছেন। এই মুহূর্তে নন্দিনী লাহা সোম, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, অগ্নিমিত্র ব্যানার্জি ও আরো অনেকের নাম বলতে পারি। পেশাদার হিসাবে অনুষ্ঠান করে, আবৃত্তি শিখিয়ে বা আবৃত্তি শেখানোর প্রতিষ্ঠান করে ভালো আয় করা যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়েরা নাচ, গানের পাশাপাশি আবৃত্তি শিখতে এগিয়ে আসছে। এছাড়াও আবৃত্তি শিল্পীরা নিজের কণ্ঠস্বরকে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ভয়েস ওভারে কাজে লাগাতে পারেন।

● সরকারি অনুষ্ঠানে কাজ পেতে গেলে কি রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকতে হয়?

● ● তার কোনো মানে নেই। যোগাযোগে একবার বা দু'বার কাজ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু পেশায় টিকে থাকতে গেলে লাগে সততা, নিষ্ঠা, প্রতিভা ও নিজস্বতা। নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদাভাবে চেনাতে হবে।

শুধু অনুষ্ঠানের আগে নয়, আমি নিয়মিত এক থেকে দেড় ঘণ্টা রোজ আবৃত্তির চর্চা করি। আগে আমার প্রথম শ্রোতা ছিল আমার ছেলে (আমার ছেলে এখন সে কাজের সূত্রে বিদেশে)। এখন আমার আবৃত্তির প্রথম শ্রোতা স্ত্রী। ও শুনে খুশি হলে তবেই এগোই।

● ৫০ বছরের বেশি সময় কাজ করার পরও কি কোনো অনুষ্ঠানের আগে মহড়া করেন?

● ● শুধু অনুষ্ঠানের আগে নয়, আমি নিয়মিত এক থেকে দেড় ঘণ্টা রোজ আবৃত্তির চর্চা করি। আগে আমার প্রথম শ্রোতা ছিল আমার ছেলে (আমার ছেলে এখন সে কাজের সূত্রে বিদেশে)। এখন আমার আবৃত্তির প্রথম শ্রোতা স্ত্রী। ও শুনে খুশি হলে তবেই এগোই।

● ভালো আবৃত্তি শিল্পী হতে চাইলে কোন কোন দিকে নজর দিতে হবে?

● ● নিয়মিত চর্চা খুব জরুরি। জোর দিতে হবে উচ্চারণে, দমের জন্য ব্যায়াম করতে হবে। নামি আবৃত্তিকারদের আবৃত্তি শুনতে হবে।

● আপনি আবৃত্তির জন্য কোনো সরকারি পুরস্কার পেয়েছেন?

● ● সরকারি সম্মান না পেলেও বেসরকারি জায়গা থেকে একাধিক পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছি। যেমন পেয়েছি সমতট পুরস্কার, দু'বার পেয়েছি কাজী সব্যসাচী পুরস্কার, অমিতাভ বাকচি স্মৃতি সম্মান, জীবনানন্দ পুরস্কার। ১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী থেকে পাই নাট্য শিল্পী হিসাবে বিশিষ্ট অভিনেতা পুরস্কার। তবে আমার কাছে সেরা পুরস্কার হল দর্শক ও শ্রোতাদের ভালোবাসা। আর এই ভালবাসার টানে দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছি।

নির্বাক অভিনয় কিন্তু মাইম নয়

চার দশকের বেশি সময় ধরে মূকাভিনয় করে চলেছেন মাইম গুরু **কমল নস্কর।** দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠান করে পেয়েছেন নানা সম্মান। এখন তিনি বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলে ও বাংলার ঘরে ঘরে মূকাভিনয়কে পৌঁছে দিতে চান।

● আপনি কত বছর ধরে মূকাভিনয় চর্চা করছেন?

●● টানা ৪৫ বছর ধরে মাইম চর্চা করছি।

● কার কাছে শিখেছেন?

●● প্রবাদপ্রতিম মাইম গুরু যোগেশ দত্তের কাছে ১০ বছর মূকাভিনয় শিখেছি।

● মঞ্চে কবে প্রথম অনুষ্ঠান করেন?

●● ১৯৮১ সালে কলামন্দিরে প্রথম প্রেস শো করি।

● প্রথম বাণিজ্যিক শো কবে?

●● ১৯৮৫ সালে রবীন্দ্রসদনে। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'সাইলেন্স ইভিনিং'।

● চার দশকে এপর্যন্ত ক'টি শো করেছেন?

●● এপর্যন্ত ৪৬টি শো করেছি।

● আপনার পছন্দের অনুষ্ঠান কোনটি?

●● নিজের সন্তানের ভালোমন্দ কি বিচার করা যায়! তবে খুব পপুলার হয়েছে: এপিক নাইট, রিলেশনস মাস্ক, রবীন্দ্র নাইট, লাইফ, ইমেজ অফ লাইফ, মুখ বন্দক।

● কবে প্রথম বিদেশে অনুষ্ঠান করেন?

●● ১৯৯০ সালে সুইজারল্যান্ডে। প্রায় ৪৫দিন ছিলাম।

● বাংলাদেশে কবে যান?

●● ১৯৯১ সালে। সেবার ৩টি মাইমের দল যায়। কলকাতা থেকে ২টি দল ছিল। তার মধ্যে ছিল আমাদের দল। প্রতিবেশী বাংলাদেশের মানুষ আমাদের সাদরে অ্যাপায়ন করেন।

● আপনার মডার্ন মাইম সেন্টারের যাত্রা কবে শুরু হয়?

●● ১৯৯৬ সালে মডার্ন মাইম সেন্টারের পথ চলা শুরু। সারা দেশজুড়ে আমাদের সেন্টার আছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি, বিহারে ৪টি, ওড়িশায় ২টি, দিল্লিতে ২টি, মুম্বাইতে ১টি, ভোপালে ১টি, এলাহাবাদে ১টি, চণ্ডীগড়ে ১টি, অসমে ১টি, চেন্নাই ১টি, ঝাড়খণ্ড ১টি, মিজোরামে ১টি। অন্য রাজ্যে অনলাইনে ক্লাস হয়।

● শুনেছি আপনি গোটা রাজ্য জুড়ে মূকাভিনয়ের নতুন প্রতিভার খোঁজে অভিযান শুরু করেছেন?

●● ২০১৯ সাল থেকে 'ইন সার্চ অফ মাইম ট্যালেন্ট' নামে কর্মসূচি নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রান্তিক অঞ্চলে গিয়ে নিখরচায় মাইমের কর্মশালা করে মাইম শেখাচ্ছি। এমন এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে কেউ কোনোদিন মাইম দেখেনি, এমনকী মাইমের নাম পর্যন্ত শোনেনি। প্রান্তিক ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করছি, এরপর ওরাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

● এই পর্যন্ত কোন কোন জেলায় কর্মশালা করেছেন?

●● ওয়ার্কশপ করেছি হুগলি, হাওড়া, বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, নদিয়া। এরপর বাকি জেলায় কর্মশালা করব।

● নতুন প্রতিভার বিকাশে কোনো অনুষ্ঠান করেন?

●● হ্যাঁ, জেলার ও কলকাতার সেন্টারের প্রতিভাবান মাইম শিল্পীদের নিয়ে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাস নাগাদ কলকাতার কোনো নামি প্রেক্ষাগৃহে বার্ষিক উৎসব করা হয়। যেখানে বিশিষ্টজনদের সম্মান দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা মাইমের অনুষ্ঠান করে।

● আপনার মূকাভিনয় নিয়ে একটা বই বেরিয়েছে, নাম কী?

●● অন্তরীপ পাবলিকেশন থেকে বেরিয়েছে আমার লেখা বই : মূকাভিনয়, অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ। এখানে রয়েছে মূকাভিনয় শিল্পের ইতিহাস, বর্তমান ও আগামীদিনের পথ। তার সঙ্গে রয়েছে আমার তৈরি ১৮টি অনন্য স্বাদের মূকাভিনয়ের গল্প ও তার প্রয়োগ। খুব শিগগির বেরোচ্ছে পরের বই মূকাভিনয়। সিলেবাস ভিত্তিক বই।

● এখানে মাইম সেভাবে জনপ্রিয়তা পেল না কেন অন্য ক্রিয়েটিভ আর্টের মতো?

●● তার একটাই কারণ মাইমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। এক্ষেত্রে মাইম গুরুরাও নিজেদের দায় এড়াতে পারেন না। কেউ মাইমের নামে নাটক করছেন, কেউ দেখাচ্ছেন ম্যাজিক। সেখানে মাইম কোথায়?

● তাহলে মাইম কী?

●● ফরাসি শব্দ মিম থেকে ইংরিজি শব্দ মাইম কথাটি বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলায় মূকাভিনয় শব্দটি মূখ যুক্ত অভিনয় অর্থাৎ মূকাভিনয় নামে প্রচারিত হয়েছে। বাংলা শব্দ অনুযায়ী এই মূকাভিনয় মানে নির্বাক অভিনয়কে বোঝায় কিন্তু এই অভিনয় শুধুমাত্র নির্বাক নয়। নানা ধরনের নাচে ও ব্যালে নির্বাক অংশ থাকলেও তা মাইম নয়। নাটকের অভিনয়েও থাকে নির্বাক উপস্থাপনা, যা দেখে মনে হয় মূকাভিনয় কিন্তু এটাও মাইম নয়। কারণ নাটকে থাকে ভাষার প্রয়োগ, চরিত্র অনুযায়ী বেশভূষা, রূপসজ্জা। সিনেমার নির্বাক শিল্পী চার্লি চ্যাপলিনের নির্বাক সিনেমার অভিনয়কেও মূকাভিনয় বলা যাবে না। কারণ এখানেও চরিত্র অনুযায়ী সব কিছু ব্যবহার হয়। মাইমে এককভাবে বেশভূষা, ফার্নিচার, পরিবেশ ছাড়াই তার অভিনয়ের কাহিনি বোঝাতে হয়। সুতরাং নির্বাক অভিনয়কলাকে মাইমের অ্যাখা দিলে, মাইমের নিজস্বতা থাকবে না। মাইমকে একটা আলাদা শিল্প হিসাবে মর্যাদা দিতে চাইলে, এই শিল্পটাকে অন্য শিল্প থেকে আলাদা করা একান্ত জরুরি।

আমি আগে শিল্পী পরে কমরেড

জি বাংলার রিয়েলিটি শো সারেগামাপা'র মঞ্চে শুরুর দিন থেকে গণসঙ্গীত গেয়ে সবার নজর কেড়ে নেয় বাঁকুড়ার মেয়ে **আরাত্রিকা সিনহা।** এই 'মিনি কমরেড'-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন **সৈকত হালদার।**

● এই মুহূর্তে বাঁকুড়ার একজন মেয়ে শিল্পী হিসেবে আরাত্রিকার নাম সবার মুখে মুখে শুনে কেমন লাগছে?

● ● আমার ও আমার পরিবারের কাছে এটা নিঃসন্দেহে গর্বের। আমি বিশেষ এক ধরনের গান সবার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি, এটাই বড় পাওনা।

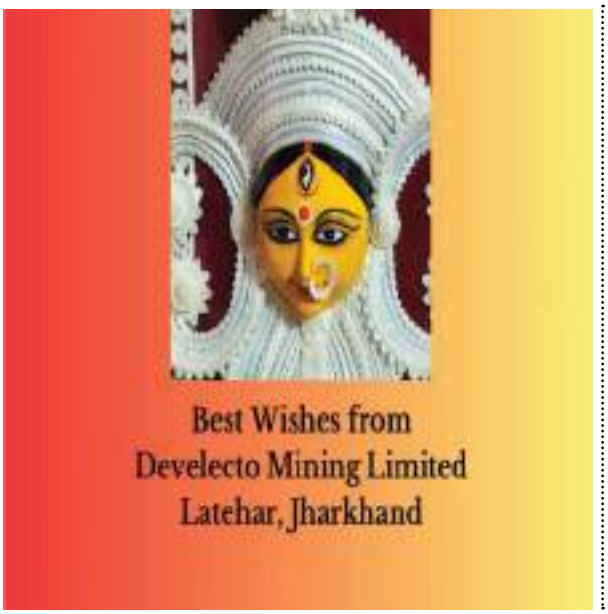

● শুনেছি এবার সারেগামাপা'য় প্রথম ৩ এ থাকলেও তুমি খুব দুঃখ পেয়েছিলে?

● ● আমার কখনো ইচ্ছে হয়নি প্রথম বা এক থেকে তিনের মধ্যে থাকতেই হবে। বাবা, দাদু বলেছিলেন, তোকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় থাকতেই হবে। আমি তাই পেরেছি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে শেষ পর্যন্ত গ্র্যান্ড ফিনালেতে পৌঁছোই। আর আমি খালি হাতে ফিরে আসিনি। কালিকাপ্রসাদ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছি যা প্রথম তিন জনের মধ্যে থাকার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাই দুঃখ নয়, বরং খুশি হয়েছি।

● তোমার সাফল্যের পেছন কার অবদান ?

● ● অবশ্যই জি বাংলাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জি বাংলার পুরো টিম - আমার গ্রুমার, বিচারকরা। দর্শক ও শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যাঁরা আমাকে সাপোর্ট করেন। এছাড়াও আমার বাবা, মা, দাদু, ঠাকুমা, ছোটো পিসি পরিবারের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।

● তুমি কত বছর বয়স থেকে গান শিখছ?

● ● মাত্র ৪- ৫ বছর বয়স থেকে গান শিখছি। প্রথম কার কাছে হারমোনিয়াম ধরতে শিখেছিলাম মনে নেই। তবে ক্লাসিক্যাল গানের প্রথম তালিম নিয়েছিলাম আমাদের এলাকার কৌশাম্বী ম্যামের (কৌশাম্বী

মুখার্জি) কাছে। এরপর ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর শ্রুতিনন্দনের ছাত্রী ছিলাম।

● ক্ল্যাসিক্যাল ঘরানার ছাত্রী হয়েও কেন গণসঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হলে?

● ● ক্ল্যাসিক্যাল গান অনেকটা অঙ্কের মতো। যে কোনো ধরনের গান গাওয়ার জন্য ক্ল্যাসিক্যাল গান শেখাটা ম্যান্ডেটরি।

● আর গণসঙ্গীত?

● ● আমার দাদু দিগন্ত সিনহা আমাকে নানা ধরনের গণসঙ্গীত এনে শোনাতেন। খুব ছোটবেলায় গানের ওই সব ভারী ভারী শব্দের মানে বুঝতাম না। একটু বড় হওয়ার পর ওইসব গান শুনে বুঝি গানের মধ্যে একটা বক্তব্য আছে। মানুষের কথা রয়েছে গানে। এরপর আমি গণসঙ্গীত গাইতে আগ্রহী হই।

● তোমাকে মিনি কমরেড কেন বলা হয়?

● ● আগে পার্টির বিভিন্ন সম্মেলনে যখন গান গাইতাম, তখন থেকেই আমাকে মিনি কমরেড বা বাচ্চা কমরেড বলে ডাকা শুরু হয়। এরপর জি বাংলায় সারেগামাপায় গান গাওয়ায় পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বাড়ায় তার প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন মিডিয়ায় আমাকে এই নামে সম্বোধন করা হয়। লোকেরাও আমাকে আরো বেশি করে মিনি কমরেড বলে ডাকতে শুরু করে।

● মিনি কমরেড ডাকটা শুনতে কেমন লাগে?

● ● ভালো বা মন্দ নয়। আগে বিষয়টার মধ্যে একটা পজিটিভ ব্যাপার ছিল। এখন এই মিনি ডাকটায় আমাকে একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। ভাবা হয় আমি বোধহয় একটা নির্দিষ্ট পার্টির বিশেষ ধরনের গান করি। আমি আগে শিল্পী ও পরে কমরেড। নিজেকে কোনো নির্দিষ্ট ইমেজে বন্দি রাখতে চাই না। একজন কণ্ঠ শিল্পী হিসাবে সবার কাছে পরিচিত হতে চাই। শুধু গণসঙ্গীত নয়, সব ধরনের গান করতে চাই।

● তুমি কি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী?

● ● ছোটো থেকে বাম রাজনীতির পরিবেশে বড় হয়েছি। বাবা, দাদুর রাজনৈতিক আলোচনা ও কথায় বুঝেছি বাম রাজনীতির একটা আদর্শ আছে। যা আমাকে আকর্ষণ করে।

● শুনেছি তুমি একটা সিনেমায় প্লেব্যাক করেছ?

● ● হ্যাঁ, ভালোবাসা ডট কম ছবিতে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি।

● কেমন অভিজ্ঞতা?

● ● সব শিল্পীর স্বপ্ন থাকে সিনেমায় প্লেব্যাক করার। আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আগামীদিনে আরো সিনেমায় প্লেব্যাক করতে চাই।

● আগামীদিনে তোমার কি নতুন কোনো অ্যালবাম আসছে?

● ● হ্যাঁ, খুব শিগগির একটা নতুন গানের অ্যালবাম আসছে। সেখানে ৬টা গান থাকছে, তারমধ্যে ১টা গান আমার গাওয়া।

● তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়ছ?

● ● আমি ক্লাস টেনে পড়ি। আগামীবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব।

● তুমি কি নিয়ে পড়তে চাও?

● ● আমার ইচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন করে মিউজিক নিয়ে পড়ার।

● তুমি কেমন জলসার সুযোগ পাচ্ছ?

● ● ভালো ডাক পাচ্ছি। শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ত্রিপুরা ও অসমেও অনুষ্ঠান করেছি।

● গান শোনার পর কেউ তোমার অটোগ্রাফ চায়?

● ● হ্যাঁ, অনুষ্ঠানের শেষে অনেকে এসে আমার অটোগ্রাফ চায়। কখনই ভাবিনি আমি কাউকে অটোগ্রাফ দেব।

● তোমার বয়সী ছেলেমেয়েরা কি গণসঙ্গীত শোনে?

● ● একেবারে বাচ্চারা হয়তো শোনে না। জি বাংলায় অডিয়েন্স হিসাবে যারা এসেছিল, তাদের অনেকে আমার গান শুনে বলেছে, আমি তাদের আইডল। আমার গান শুনে তারা গান শেখা শুরু করেছে।

কলকাতার এক শ্রেণির লোকের কাছে কীর্তন এখনও কেত্তন

এই মুহূর্তে বাংলার অন্যতম ব্যস্ত ও জনপ্রিয় শিল্পী বাংলা রিয়ালিটি শো সারেগামাপা বিজয়ী **পদ্ম পলাশ হালদার।** দেশে ও বিদেশে সমানভাবে অনুষ্ঠান করে চলেছেন। সব ধরনের গান গাইলেও তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র পদাবলী কীর্তন। বাংলার কীর্তনকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চান। শিল্পীর সঙ্গে একান্ত আলাপনে **সবুজ সেন।**

● শহরাঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতায় কীর্তনে কেমন সাড়া পান?

● ● কলকাতার এক শ্রেণির লোকের কাছে কীর্তন এখনো ‘কেত্তন’। তাঁদের ধারণা, কীর্তন গ্রাম বাংলার লোকেদের জন্য। এটা কীর্তনের নয়, ওইসব লোকের দুর্ভাগ্য। তাঁরা এখনও কীর্তন বিষয়টা বুঝলেন না। পদাবলী কীর্তন শুধুমাত্র বাংলার ঐতিহ্য নয়, বাংলার সম্পদ ও সম্পত্তি। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম ও কীর্তনে অনুপ্রাণিত হয়ে কীর্তাঙ্গের গান রচনা করেন। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ভালো কীর্তন গাইতেন। অথচ আমরা কীর্তনের সঠিক মর্ম বুঝলাম না।

● কলকাতায় কি কীর্তন শিল্পীদের নিয়ে কম অনুষ্ঠান হয়?

● ● কলকাতায় যদি ১০০টা মূল ধারার গানের অনুষ্ঠান হয় সেখানে হয়তো ৫ - ৬টা জায়গায় কীর্তন শিল্পীদের ডাকা হয়।

● উদ্যোক্তারা কি কীর্তনের শিল্পীদের ডাকার ঝুঁকি নিতে চান না?

● ● উদ্যোক্তারা হয়তো ভাবেন শহরের লোকেরা কীর্তন শুনবেন না। জলসার টিকিট বিক্রি হবে না। কিন্তু ঠিকমতো কীর্তন গাইতে পারলে সবাই শোনেন।

● জেলায় তো কীর্তনের ভালো বাজার?

হ্যাঁ, জেলা ও মফস্বলে এখনো লোকেরা সারা রাত জেগে কীর্তন শোনেন। গ্রামের প্রচুর লোকের কীর্তন গেয়ে জীবন চলে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে একজন গায়কের সঙ্গে অন্তত ৫ থেকে ৬ জন বাজনদার থাকেন।

● বিদেশে কীর্তনের কদর কেমন?

● ● দেশের সঙ্গে বিদেশেও অনেক অনুষ্ঠান করি। গতবার পুজোয় ২৫ দিনের সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করি। প্রবাসী বাঙালিরা খুব মন দিয়ে কীর্তন শোনেন। বাংলার কীর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের শিকড় খোঁজার চেষ্টা করেন। নানা ধরনের কীর্তন শোনানোর অনুরোধ আসে। বিদেশে দর্শক ও শ্রোতাদের ভালোবাসায় অভিভূত হয়ে যাই।

● এই মুহূর্তে পুরো সংস্কৃতি সমাজ সোশাল মিডিয়ায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সমাজমাধ্যমে আপনি কতটা অ্যাক্টিভ?

● ● আমি সোশাল মিডিয়ায় ততটা অ্যাক্টিভ নই। ফলে সোশাল মিডিয়ায় আমাকে নিয়ে কোথায় কী লেখা হচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

● ডিজিটাল যুগে শিল্পীদের ভরসা কি ইউটিউব চ্যানেল?

● ● হ্যাঁ, যুগের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিকে আমাদের মেনে নিতে হবে। প্রতি মাসে আমার নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল পদ্মপলাশ প্রোডাকসন থেকে সিঙ্গল গান বেরোয়।

● সেটা কি শুধু কীর্তন গান বেরোয়?

● ● না, শুধু কীর্তন নয়। আমার গাওয়া নানা স্বাদের গান বেরোয়। তারমধ্যে যেমন থাকে বাংলার কীর্তন তেমনি থাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও বাংলার মৌলিক গান। গান গাওয়ার ক্ষেত্রে কথা ও সুরের দিকে নজর রাখি। গান বেরোতেই হাজার হাজার ভিউ হয়। তাতে বুঝতে পারি শ্রোতাদের ভালোলাগার অনুভূতি।

● এ পর্যন্ত আপনার রেকর্ডেড গানের সংখ্যা কটি?

● ● অন্তত ২৫টা হবে।

● শুনেছি আপনার নিজস্ব ফ্যান ক্লাব রয়েছে?

● ● হ্যাঁ, আমার ফ্যান ক্লাব রয়েছে। সদস্য সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। আমার ইউটিউবেরও ফলোয়ার প্রায় ৫৫ থেকে ৫৬ হাজার।

● আপনার তো গানের নিজস্ব একাডেমি করার পরিকল্পনা রয়েছে, তার কী হল?

● ● হ্যাঁ, আমার গানের একাডেমির নাম সঙ্গীতকানন। লক্ষ্মীকান্তপুর ছাড়াও কলকাতার সন্তোষপুরে শাখা রয়েছে। এই মুহূর্তে আমার ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৮৪জন।

● আপনার গানের গুরু কে?

● ● আমার দাদু কানাই লাল হালদারের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমার গান বাজনার চর্চা শুরু। দাদু প্রয়াত। তারপর গান শিখি প্রখ্যাত কীর্তন শিল্পী সুমন ভট্টাচার্যের কাছে। এছাড়াও গানের তালিম নিয়েছি অনল ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর কাছে।

● প্রিয় শ্রোতা ও দর্শকদের কী বলতে চান?

● ● দর্শক ও শ্রোতাদের ভালোবাসা না পেলে আজ এই জায়গায় আসতে পারতাম না। দর্শকরাই আমার গানের আসল সমঝদার। পাশাপাশি বলতে চাই কীর্তনকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বেড়াজালে বন্দি রাখলে চলবে না। কীর্তনের মধ্যে অবশ্যই এক ধর্মীয় কাহিনি রয়েছে। যেমন, রাধাকৃষ্ণ বা মহাপ্রভুর কাহিনি। কিন্তু এইসব কাহিনির মাধ্যমে এক সামাজিক বার্তা দেওয়া হয়। যার সুদূর প্রসারী বার্তা রয়েছে সমাজে। শ্রোতারা সবসময় ভালো কীর্তনীয়ার কাছ থেকে সঠিক কীর্তন শোনার চেষ্টা করবেন।

পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে স্বর্ণযুগ থেকে একালের কণ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে গিটার বাজিয়ে রেকর্ড তৈরি করেছেন গিটারিস্ট **পণ্ডিত স্বপন সেন।** শিল্পীর সঙ্গে কথপোকথনে ফিরে এল হারানো সব স্মৃতি।

স্বর্ণযুগের প্রায় সব শিল্পীর সঙ্গে বাজিয়েছি

● আপনি কত বছর ধরে গিটার বাজাচ্ছেন?

●● ৫২ বছর ধরে গিটার বাজাচ্ছি।

● কার কাছে শিখেছেন?

●● সোমনাথ গাঙ্গুলির কাছে হওয়ান গিটার আর স্প্যানিশ গিটার শিখেছি অনাথবন্ধু মৌলিকের কাছে। 'তিসরি মঞ্জিল' ছবিতে আর ডি বর্মণের সুরে মহম্মদ রফির গলায় 'আজা আজা ম্যায় হু পেয়ার' গানের সঙ্গে একটা স্প্যানিশ বাজনা শুনে আমার স্প্যানিশ গিটার শেখার ইচ্ছে হয়। যদিও পরে সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কাজী অনিরুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষার উত্তরণ হয়।

● প্রথম কবে মঞ্চে বাজান?

●● ১৯৭৪ সালে মহাজাতি সদনে। শিল্পী দীপঙ্কর চ্যাটার্জি ও সুবীর সেনের সঙ্গে বাজাই। পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম ৮ টাকা। আর ওই অনুষ্ঠানে প্রথম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নজরে পড়ি। আমার বাজনা শুনে হেমন্তদা এইচএমভি'র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

● হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কতবার বাজিয়েছেন?

●● হেমন্তদার সঙ্গে ফিল্মের গান, বেসিক গান ও অনুষ্ঠান নিয়ে অন্তত ৬০০-৮০০ বার বাজিয়েছি।

● আর মান্না দে'র সঙ্গে প্রথম কবে বাজান?

●● ১৯৮০ সালে, উত্তরপাড়ার এক জলসায়। একবার ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে টোপাদার সঙ্গে পরিচয় হয়। উনি আমাকে মান্না দে'র সঙ্গে গিটার বাজানোর কথা বলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপের দিনটা এখনো মনে আছে। মান্না দে গাইছিলেন, আমি নিরালায় বসে। আমাকে দেখে বলেন নোটেশন করে নিতে। এরপর আমার নোটেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, এই গিটার তুমি ছাড়বে না, তোমাকে বিখ্যাত করবে। মান্নাদার সঙ্গে অন্তত ২ হাজার বার বাজিয়েছি।

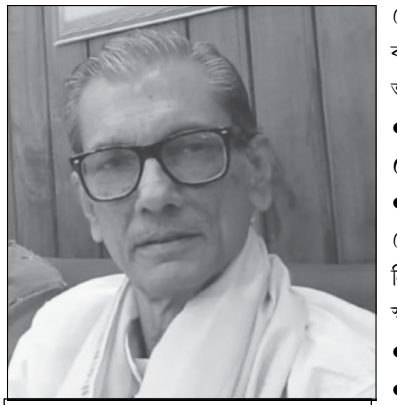

পণ্ডিত স্বপন সেন

● আর ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে কতবার বাজিয়েছেন?

●● অন্তত আড়াই হাজার বার।

● শুনেছি কলকাতা দূরদর্শনে বাজিয়ে রেকর্ড করেছেন?

●● ঠিক তাই, টিভিতে অন্তত চার হাজার বার বাজিয়েছি।

● স্বর্ণযুগের আর কোন কোন শিল্পীর সঙ্গে বাজিয়েছেন?

●● এই তালিকায় কে নেই? হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, শ্যামল, সতীনাথ, ভূপেন, সুবীর সেন, আরতি। আর বলিউডের লতা, কিশোর, মহম্মদ রফি, আশা, আর ডি বর্মণ, বাপ্পি লাহিড়ি থেকে কুমার শানু, অনুরাধা পারোয়াল, অলকা ইয়াগ্নিক। আমি বোধহয় সেই সৌভাগ্যবান গিটারিস্ট যে ওই সব কিংবদন্তি শিল্পীদের সঙ্গে বাজাতে পেরেছি।

● রাহুল দেব বর্মণের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়?

●● বসুশ্রীতে মান্না দে'র এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আসেন রাহুল দেব বর্মণ। সেখানে দেখা হয়।

● আপনি সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করেছেন?

●● সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে তাঁর সুরে অন্তত ১০ থেকে ১১টা গানের সঙ্গে বাজিয়েছি। গুপী গায়েন বাঘা বায়েন-এর ওই বিখ্যাত গান, 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে' এর সঙ্গে বাজিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি।

● মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে আপনার কাজের সৌভাগ্য হয়?

●● 'সোনার খাঁচা' ছবির সেটে উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন হেমন্তদা (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)। এই ছবিতে হেমন্তদার গাওয়া 'কে জানে ক ঘণ্টা' গানের সঙ্গে বাজিয়েছিলাম। উত্তমকুমার লিপ দেন। ছবিতে মহানায়কের পাশে আমাকে গিটার বাজাতে দেখা যায়। এছাড়াও 'হোটেল স্নো ফক্স' ছবিতে মান্না দে'র গাওয়া 'জোর খবর জোর খবর' গানের সঙ্গে উত্তমকুমারের পাশে আমাকে দেখা যায়। মহানায়ক আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন।

● আপনি এত সব দিকপাল শিল্পীদের সঙ্গে বাজিয়েছেন, আপনার চোখে কে কেমন ছিলেন?

●● সবার কাজের ধরন ও গায়কি আলাদা আলাদা। খুব ভয় পেতাম সলিল চৌধুরী ও মান্না দে'র সঙ্গে বাজাতে। দু'জনে সুর, ছন্দ, তাল নিয়ে খেলতেন। কখন কী করবেন আগে থেকে অনুমান করা যেত না। হেমন্তদার গলা ছিল গড গিফটেড, মান্না দা ছিলেন কাজের রাজা, মহম্মদ রফি ছিলেন মেলোডি কিং আর কিশোর কুমার ছিলেন ভার্সেটাইল জিনিয়াস।

● আপনি কাজের স্বীকৃতিতে তো নানা জায়গা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন?

●● হ্যাঁ, আন্তর্জাতিক পুরস্কার যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি রাজ্য সরকারের পুরস্কার। আমাকে নিয়ে তথ্যচিত্র হয়েছে। বইও বেরিয়েছে : কিংবদন্তি স্বপন সেন।

● আপনি পরের জন্মে কী হতে চান?

●● আবার গিটারিস্ট স্বপন সেন হয়েই জন্মাতে চাই।

● এখনো কী স্বপ্ন দেখেন?

●● যতদিন পারব বাজাতে চাই। স্বপ্ন একটা একাডেমি তৈরি করার।

বাংলা ছবির কুরুচিকর ভাষা শুনে কষ্ট পাই : শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

৪ দশকেরও বেশি সময় ধরে পর্দা ও মঞ্চে চুটিয়ে অভিনয় করে চলেছেন অভিনেতা **শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।** তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন **সৈকত হালদার।**

● শুভাশিসদা সংস্কৃতি কি এখন সোশাল মিডিয়ায় বন্দি হয়ে পড়েছে?

●● খানিকটা তো তাই মনে হচ্ছে। যা কিছু করতে চাই তার পেছনে সোশাল মিডিয়ার প্রভাব দেখা যায়। খবরের কাগজের জায়গাটা ধীরে ধীরে কেড়ে নিচ্ছে। যেভাবে সোশাল মিডিয়া সব কিছু গ্রাস করে নিচ্ছে তাতে বলা যায় সোশাল মিডিয়ার হাতে বন্দি হয়ে পড়ছে গোটা বিনোদন জগৎ।

● এর কি খারাপ প্রভাব পড়ছে?

শুভাশিস: এখনো ভালোমন্দ বলার সময় আসেনি। আগামীদিনে সময় বলবে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ। লোকের পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ায় সেই জায়গা নিচ্ছে সোশাল মিডিয়া। এখন সবার হাতে হাতে স্মার্ট ফোন চলে আসায় বিষয়টা আরো সহজ হয়েছে। এখন সিনেমা, থিয়েটার, যে কোনো খবর সোশাল মিডিয়ায় দিলে ভালো সাড়া পাওয়া যায়। ইয়ং ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বয়স্করাও সোশাল মিডিয়ার আসক্ত হয়ে পড়েছেন।

● রিলে ফলোয়ার বাড়লে কি সিনেমা/ সিরিয়ালে কাজ পেতে সুবিধা হয়?

●● এই ব্যাপারটায় আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না। ফলোয়ার বাড়লে সিনেমা/ সিরিয়ালে কাজ পেতে সুবিধা হয় কিনা জানি না। সবাই এখন নিজের মতো করে রিল বানায়। একটা চটজলদি পপুলারিটি পাওয়া যায়। ফলোয়ার দেখে একবার বা দু'বার কাজ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু টিকে থাকতে গেলে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয়। নিজের কাজ মন দিয়ে করতে হয়।

● উঠতি নায়িকাদের মধ্যে কি এই প্রবণতা বেশি? তাঁরা কি বেশি কাজ পান?

●● আমার মনে হয় না। তাহলে তো সবাই কাজ পেতেন। এখন তো আনাচে কানাচে সবাইকে রিল বানাতে দেখা যায়। এমন অনেক রিল দেখেছি যা সত্যি খুব সুন্দর।

● এখন বাংলা সিনেমার ভাষা বদলে গেছে। অনেক কুরুচিকর কথা শোনা যায়। এটা নিয়ে আপনার মত কী?

●● বাংলা ছবির সংলাপে এখন এমন কিছু ভাষার ব্যবহার হয় যা শালীনতার সীমা পার করে যাচ্ছে। সহজ কথায় যাকে গালাগালি বলে। কিন্তু কেন এটা হবে? আমি সব সময় এর প্রতিবাদ করি।

বাংলা এত সমৃদ্ধ ও মিষ্টি ভাষা সেখানে ভাষার এই অবদমন কেন? অনেকে বলছেন, দর্শক নাকি এসব পছন্দ করেন। হাততালি দেন। তাই কি? এতে তো দর্শকদের অপমান করা হচ্ছে।

● অনেক নামি পরিচালকের ছবিতে এই ধরনের ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।

● ● হ্যাঁ, অনেকে বলছেন চরিত্র নাকি এই সব ডায়লগ ডিমান্ড করে। তাই কি? সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' ছবিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জির ড্রাইভারের চরিত্রে যে অভিনয়, সেটা ছিল প্রান্তিক মানুষের চরিত্র। সেখানে তো ওইসব ভাষার ফোয়ারা ছুটতে পারত। আসলে এখন সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এসব করা হচ্ছে। বাংলা সিনেমায় এমন সব কথা ব্যবহার হচ্ছে যা পরিবারের সবার সামনে বসে শোনা যায় না।

● চারপাশে এখন কুকথা। এটা কেন?

● ● হ্যাঁ, রাস্তাঘাটে কান পাতলেই খারাপ কথা শোনা যায়। থিয়েটারেও এখন খারাপ কথা ব্যবহার হয়। আমি এর বিপক্ষে। অনেকে আবার উদাহরণ হিসাবে নবারুণ ভট্টাচার্যের রেফারেন্স দেন। কিন্তু এখানে জানা দরকার লেখক কোন প্রেক্ষাপটে কোন চরিত্রের মুখে ওই ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া সাহিত্যের ভাষা আর নাটকের ভাষা এক নয়। সাহিত্য একা একা পড়ছি আর সিনেমা থিয়েটার সবাই মিলে দেখছি। তাই ভাষার ক্ষেত্রে সংযম খুব দরকার।

● এখন সিনেমার ভরসা কি মাল্টিপ্লেক্স?

● ● কিছুটা হলেও তাই। সিনেমা হল সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় লোকে সিনেমা দেখবে? আবার এটাও ঠিক, সবার পক্ষে মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে সিনেমা দেখা সম্ভব নয়। আগে সিনেমার তিনটে শো ছিল। এখন একটা শো দেওয়া হয়। তাছাড়া এখন বাংলা ছবির ব্যবসার নামে যেসব তথ্য দেওয়া হয় সেখানেও বিস্তর সমস্যা থাকে। তবে সিনেমা শিল্পকে বাঁচাতে গেলে সিঙ্গল স্ক্রিন দরকার।

● সিনেমার বিকল্প কি ওটিটি মাধ্যম?

● ● সিনেমার জায়গা নিলেও সিনেমা আর ওটিটি আলাদা মাধ্যম।

● অভিনেতা শুভাশিসকে আমরা হার্বার্ট, শিল্পন্তর, মেঘে ঢাকা তারা সিনেমায় সিরিয়াস চরিত্রে দেখেছি। সেখানে তাঁকে কমার্শিয়াল সিনেমায় শুধু কমেডি চরিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কি আপনার অভিমান হয় না?

● ● আমার কোনোদিন কোনো আক্ষেপ ছিল না আর ভবিষ্যতেও আসবে না। একজন পেশাদার অভিনেতা হিসেবে সব ধরনের চরিত্রে কাজ করতে চাই। হয়তো ওই সব চরিত্রের জন্য লোকে আমাকে মনে রাখবেন কিন্তু কমার্শিয়াল ছবি আমার পেটের ভাত দিয়েছে।

● আপনার প্রথম ছবি কি পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী' ১৯৮৭ সালে মুক্তি পায়?

● ● ১৯৮১ সালে শুটিং হয় আর ১৯৮৭ সালে মুক্তি পায়। তবে তার আগে দিলীপ রায়ের পরিচালনায় আমার অভিনীত 'নীল কণ্ঠ ' মুক্তি পায়।

● আপনি স্বপন সাহার ৫৪টি ছবিতে অভিনয় করেছেন?

● ● ৫৪ নয়, ৫৫টি।

● অনেকে স্বপন সাহাকে বড়ো মাপের পরিচালক মনে করেন না, আপনার মত?

● ● স্বপন সাহা যে ধরনের সিনেমা করতেন সেই ক্ষেত্রে তিনি সফল ও যোগ্য। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর বাংলা সিনেমার দুঃসময় থেকে বাঁচান অঞ্জন চৌধুরী ও স্বপন সাহা।

● আপনি অঞ্জন চৌধুরীর কোন ছবিতে অভিনয় করেন?

● ● অঞ্জন চৌধুরীর নিজের পরিচালনায় দুটি ছবিতে কিন্তু তাঁর সহযোগী পরিচালকদের অনেক ছবিতে কাজ করেছি।

● শোনা যায় প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি আপনার বন্ধু বলে নাকি আপনার কাজ পেতে সুবিধা হয়েছিল?

● ● প্রসেনজিৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু নয়। কাজের জগতে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব। তিনি আমাকে পছন্দ করতেন। আমাকে ভেবে পরিচালকদের চিত্রনাট্য লিখতে বলতেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে বন্ধুত্বের জন্য নয়, কাজ পেয়েছি যোগ্যতায়। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কাজ করলেও তাপস পাল, অর্জুন চক্রবর্তী, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও অনেক সিনেমায় অভিনয় করেছি।

● আপনার প্রথম বাংলা সিরিয়াল কী?

● ● অভিনন্দন ভগীরথ, কলকাতা দূরদর্শনে ১৯৮৬ সালে টেলিকাস্ট হয়। তবে বিবাহ অভিযান সিরিয়ালে কমেডি চরিত্রে আমার নামডাক হয়।

● আর কোনো সিরিয়াল করেননি?

● ● একসময় বাংলা সিনেমার অবস্থা খারাপ থাকায় আর কাজের অনিশ্চয়তার জন্য টানা ৮ বছর যাত্রা করি। এরপর টানা দেড় বছর বসে থাকি আর তারপর পরিচালক স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ধমক খেয়ে ওর প্রোডাকশনে রাখি বন্ধন, জরোয়ার ঝুমকো, মুকুট, খেলাঘরে অভিনয় করি।

● সিরিয়ালের দর্শকদের সম্পর্কে অনেকের খারাপ ধারণা। মনে করেন নীচু মাপের দর্শক। আপনি কি বলেন?

● ● যাঁরা খারাপ বলেন তাঁরাই দেখেন। আমি অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোককে বলতে শুনেছি, টিভিতে আপনার অভিনয় দেখে ভালোলাগল। মানে তাঁরা দেখেন। সিরিয়াল তো বিনোদনের একটা মাধ্যম। সেটা দেখা খারাপ হবে কেন?

● আপনি হিন্দিতে কাজ করেছেন?

● ● ওটিটি মাধ্যমে কাজ করেছি। দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার।

● আপনি সব মাধ্যমে কাজ করেছেন, পছন্দের মাধ্যম কোনটা?

● ● সবচেয়ে পছন্দের জায়গা স্টেজ।

● প্রিয় দর্শকদের কী বলতে চান?

● ● দর্শকদের একটাই কথা বলতে চাই, আপনারা ভালো বাংলা ছবি দেখুন। বাংলা সিনেমা আর থিয়েটারের পাশে থাকুন।

সুনয়নী ছবির শুটিং হয় আমার বরের ফ্ল্যাটে

শকুন্তলা বড়ুয়া, অভিনেত্রী

আমার প্রথম ছবি বিয়ের পরেই। ছবিটা ছিল 'সুনয়নী'। সুনয়নী ছবিটা প্রথমে করছিলেন শচীন অধিকারী। তখন ছবিটার নাম ছিল 'গান্ধারী'। অন্ধ মেয়ের রোল। আমায় বলেছিলেন, 'তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর তাই ছবির নায়িকার ভূমিকায় তুমি পারফেক্ট।' তারপর ছবিটা শচীনদা সুখেনদাকে দিয়ে দেন। সুখেন দাস ডিরেক্ট করেন। সুখেনদা রিহার্স করাতেন। আমি সেগুলো বাড়িতে গিয়ে গল্প করতাম। একদিন শুনলাম রঞ্জিত মল্লিক হিরো, একদিন শুনলাম সন্তু মুখার্জী হিরো, দীপঙ্কর দে হিরো। এসে এসে বলতাম বরকে। আমার কর্তা সেদিকে কানই দিতেন না। নিজের অফিসের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন। একদিন শুনলাম ফাইনালি উত্তম কুমার হিরো। আমি আবার সেটাও এসে বললাম আমার বরকে। সঙ্গেসঙ্গে অফিসের কাগজপত্র বন্ধ করে আমায় বলল 'করবে না।' আমি বললাম, 'এতদিন বলেছো করবে, এখন এতদিন রিহার্সালের পর না বলব কী করে!' কর্তা বললেন, 'উত্তম কুমার হিরো। আমি করতে দেব না।' এ জন্যই এটা বললাম, উত্তম কুমার সম্পর্কে লোকের একটা ধারণা ছিল যে বাড়ির বউ শ্যুটিং করতে গিয়ে উত্তম কুমারকে একবার চোখে দেখলে সে বউ আর বাড়ি ফিরবে না। এটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও লোকে ভাবত। বউদের বেশি। উত্তম কুমারের নামে গুজব রটত বেশী। সেগুলোই চাউর হত। উত্তম কুমারের নায়িকা হয়ে সেই বউ আর বাড়িতে এসে রান্না করবে! যাই হোক, কর্তা 'হ্যাঁ' বললেন, কিন্তু অনেক শর্ত আরোপ করেছিলেন। সেগুলো মেনে চলা যে

উত্তম কুমার সম্পর্কে লোকের একটা ধারণা ছিল যে বাড়ির বউ শ্যুটিং করতে গিয়ে উত্তম কুমারকে একবার চোখে দেখলে সে বউ আর বাড়ি ফিরবে না। এটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও লোকে ভাবত। বউদের বেশি। উত্তম কুমারের নামে গুজব রটত বেশী। সেগুলোই চাউর হত।

কারও পক্ষে কঠিন। কিন্তু আমি মেনেছিলাম।

একটা ছিল, আমি ছবি করে কোন পারিশ্রমিক নিতে পারব না। সুখেনদা বললেন, এটা কী করে হয়? আমার বর বললেন, 'জেন্টেলম্যান ওয়ার্ড! আমি বলেছি ও ছবি করবে তাই করবে। কিন্তু কোন প্রফেশানাল ফি নেবে না আমার স্ত্রী।' তখন সুখেনদা পার ডে গাড়ি ভাড়া আমায় একশো টাকা করে দিলেন। 'পেট্রোলের দামটা দিতে দিন আমায়।' সুখেনদা বললেন আমার কর্তাকে। তো আমি একশো টাকা করেই রোজ নিয়েছি 'সুনয়নী'তে। তার পরে আউটডোর ছিল উত্তম কুমারের সঙ্গে। তখন কোনও জ্ঞান নেই আউটডোর সম্বন্ধে। শুনলাম ডায়মন্ড হারবারে সাতদিন শ্যুটিংয়ের জন্য থাকতে হবে 'সাগরিকা' হোটেলে। 'সাগরিকা' দেখানো হবে উত্তম কুমারের ফ্ল্যাট। শুনে আমার বর বললেন, 'আমার বউ যাবে না। বাপের বাড়িই কোনওদিন পাঠাইনি, ও যাবে না আউটডোরে।' সুখেনদাকে আমার বর বললেন, 'আমার গারমেন্টস হাউসের নটা ফ্ল্যাট আছে কলকাতা শহরে। আমি আপনাকে সব কটা দেখাব। আপনি যেটা খুশি উত্তম কুমারের গেস্ট হাউস বানান।' কত বড় রিলিফ এটা একটা প্রথম নায়িকার জন্য। নিজের বরের ফ্ল্যাটে সিনেমার শ্যুট আর রোজকার রোজ আসা যাওয়া সম্ভব। শ্রীশিক্ষায়তন স্কুলের কাছে আমার বরের একটা ফ্ল্যাট উত্তম কুমারের বাড়ি দেখানো হল। এখন বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।

কেউ উত্তমকুমারের ধারেকাছে নেই

আমার চলচ্চিত্র জীবনের প্রথম নায়ক উত্তম কুমার। তারপর প্রচুর নায়কের সঙ্গে কাজ করেছি আমি এত বছরের অভিনয় জীবনে, কিন্তু দ্বিতীয় কাউকে বলতে পারব না যিনি উত্তমকুমারের ধারে-কাছে এসেছেন। ওঁর গাম্ভীর্য, হাঁটাচলা, কথা বলা মাপে মাপে। এখনকার হিরোরা তো সবাই চিৎকার করে কথা বলেন। আজকাল গাড়ি থেকে নেমেই আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে হাই বলে একটা লাফ দিল। যাতে মিডিয়া দেখতে পায় এই তো! উত্তম কুমার ছিলেন হিমালয়। উনি সবসময় গাড়ি থেকে নেমে মাথা নীচের দিকে করে তাকিয়ে হেঁটে যেতেন । কারণ উনি তো ছিলেন উপরের মানুষ। ওঁকে সবাই মাথা উঁচু করে দেখত। এই কারণেই উত্তম কুমারের বিকল্প আজও এল না, আসবেও না।

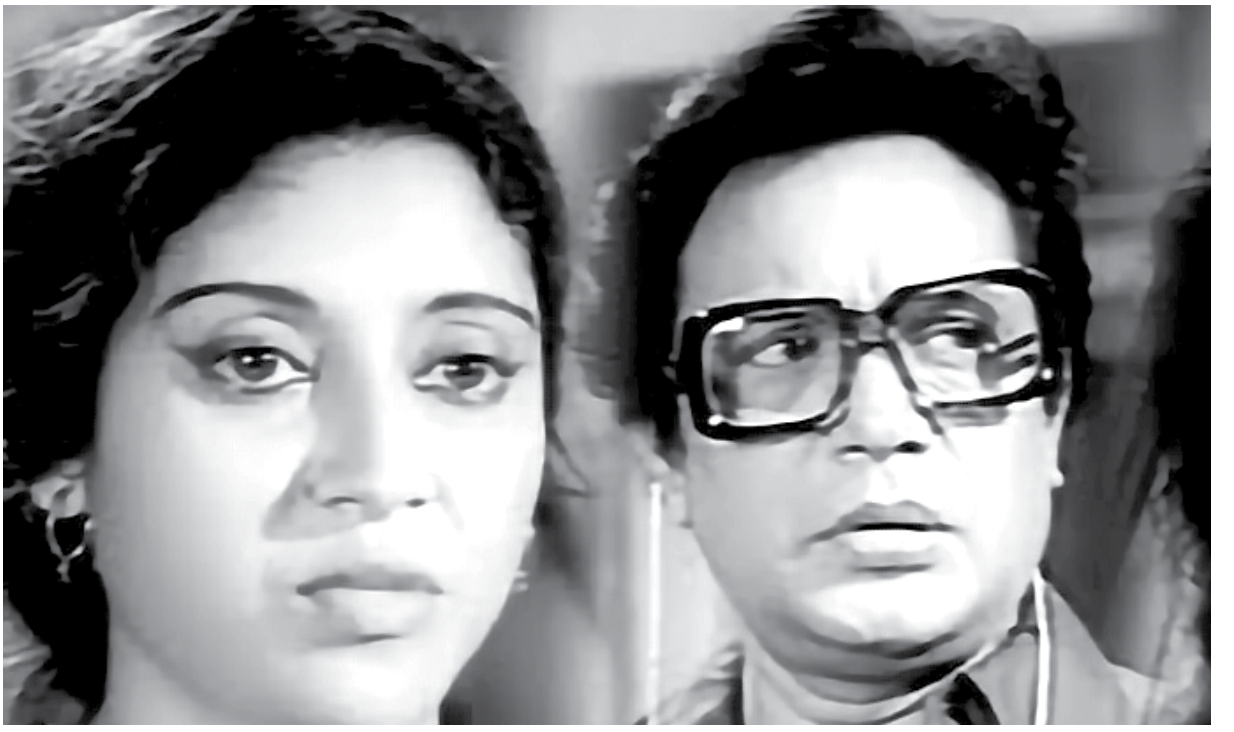

নবজন্ম ছবিতে মহানায়ক সাতটি গান গেয়েছিলেন !

উত্তম কুমার যে দারুণ গান গাইতে পারতেন, তা মোটামুটি সবাই জানেন। এমনকী, প্রথম জীবনে দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলে গানের শিক্ষকতাও করেছেন উত্তম। কিন্তু জানেন কি এমন এক বাংলা ছবি রয়েছে, যেখানে সাত-সাতটি গান নিজেই গেয়েছিলেন মহানায়ক!

সালটা ১৯৫৬। ২৪ ডিসেম্বর। মুক্তি পায় উত্তম কুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ছবি 'নবজন্ম'। পরিচালক দেবকী কুমার বসু। ছবির সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। এই ছবিতেই সাতটি গান গেয়েছিলেন উত্তমকুমার। তাও যে সে গান নয়, কীর্তন গেয়েছিলেন বাঙালির এই স্বপ্নের পুরুষ।

শোনা যায়, এ ই ছবির জন্য ভালো মানের কীর্তন গাওয়ার জন্য গায়ক খুঁজছিলেন সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। সেই খবরটাই কানে আসে উত্তমের। উত্তম জানিয়ে দেন, অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি এই ছবির জন্য গানও গাইবেন। এতে তাঁর অভিনয়ও সমৃদ্ধ হবে। নচিকেতা ঘোষ প্রথমদিন রেকর্ডিংয়েই বুঝে গিয়েছিলেন উত্তম একেবারে সঠিকভাবেই কীর্তন গাইছেন। আর সেই কারণেই একটি নয়, এই ছবির সাতটি কীর্তনই উত্তমকে দিয়ে গাইয়েছিলেন নচিকেতা। তবে উত্তমের গাওয়া গানগুলি ছবিতে ব্যবহার হলেও, রেকর্ডে রাখা হয়নি। এটিই একমাত্র বাংলা ছবি যেখানে শোনা গিয়েছিল উত্তম কুমারের কণ্ঠ।

With Best Compliments From,

Mobile : 9333134223

ME MAKEWELL ENGINEERS

Registered Unit with S.S.I., Micro, Small & Medium Entrps. & N.S.I.C. Unit

Manufacturer & Repairer of Mechanical, Safety & Electrical :-

Haulages, Winders' Pinion, Shaft, Worm, C.S.Gear, Hydraulic System, Gear Switch, Motor, Boiler Spares, Pump, Drill Bit, Heavy Earth Moving,SDL Machine & General Order Suppliers.

KULTI HOTEL ROAD (EAST), P.O. KULTI-713343, DIST. PASCHIM BARDHAMAN (WEST BENGAL)

GST No. : 19APNPS2920P1Z2 • PAN No. : APNPS2920P

উত্তমকুমার ছাড়াও সরবেন্দ্রকে মনে মনে স্বামী হিসাবে মেনে নেন সাবিত্রী

উত্তম-সাবিত্রীর প্রেম নিয়ে সকলেই অল্পবিস্তর ওয়াকিবহাল। কিন্তু টলি পাড়া সাক্ষী আছে, সাবিত্রীর জীবনে উত্তম-পরবর্তী সময়ে আরও একটি প্রেম আসে, যা তাঁকে সব অর্থেই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সাবিত্রীর সেই প্রেমিকও ছিলেন এক অভিনেতাই। কে সেই অভিনেতা?

বাঙালির 'ম্যাটিনি আইডল' উত্তম কুমারের জীবনে প্রেম এসেছে একাধিক। তিনি বিয়ে করেছিলেন গৌরীদেবীকে। অথচ সেই শুরু থেকে সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল সহ-অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। খোলামেলাভাবে নিজের ঘর সংসার থেকে দূরে একসঙ্গে থেকেছিলেন আরো এক সহ-অভিনেত্রী সুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে। দু'জনের সম্পর্কের রসায়নটাও ছিল সেরকমই। তবে যে প্রেমের কাছে বারবার ফিরে গিয়েছিলেন উত্তম তিনি হলেন আরেক সহ-অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তবে এটাও ঠিক উত্তমও বারবার ভেস্তে দিয়েছিলেন সাবিত্রীর বিয়ের প্রস্তাব। তিনি মানতেই পারতেন না প্রাণপ্রিয় 'সাবু' (এই আদরের ডাকেই বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি সম্বোধন করে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে) বিয়ে করে সংসার করবেন অন্য কারও সঙ্গে। উত্তম-সাবিত্রীর প্রেম নিয়ে সকলেই অল্পবিস্তর জানে। একটা সময় সাবিত্রীর জীবনে উত্তম ছাড়াও আসে আরেক পুরুষ। তিনিও একই জগতেরই লোক।

একবার এক সাক্ষাৎকারে সাবিত্রী খোলাখুলি জানিয়েওছিলেন, তিনি বিয়ে করতে পারেননি, কারণ তাঁর সঙ্গে যে সব পুরুষ সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, তাঁদের আগে থেকেই বাড়িতে একজন 'বউ' রয়েছে।

তবে সেই অভিনেতা উত্তমকুমারের মতো ততটা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তাই তাঁকে নিয়ে হইচইও কম। কিন্তু সাবিত্রীর মনের মণিকোঠায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছিলেন সেই অভিনেতা। একবার এক সাক্ষাৎকারে সাবিত্রী খোলাখুলি জানিয়েওছিলেন, তিনি বিয়ে করতে পারেননি, কারণ তাঁর সঙ্গে যে সব পুরুষ সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, তাঁদের আগে থেকেই বাড়িতে একজন 'বউ' রয়েছে। আজকের দিনের মতো সময় হলে হয়তো তাঁর প্রেমিকরা আগের স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে সাবিত্রীকেই বিয়ে করে নিতেন। অসম্ভব আত্মসম্মান নিয়ে চলা সাবিত্রী তাতে রাজি হতেন কিনা, তা নিয়ে অবশ্য সংশয় আছে। তিনি কোনওদিন কারও সংসার ভাঙেননি। অথচ নিজে ভিতরে-ভিতরে ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। কার কথা বলা হচ্ছে জানতে উৎসুক সকলেই।

তিনি হলেন সরবেন্দ্র সিং। সাবিত্রীর মনে এতটাই পাকা ছিল এই মানুষটির জায়গা যে, তাঁকেই মনে-মনে ‘স্বামী’ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন সাবিত্রী। তবে ‘দুর্ভাগ্যবশত’ উত্তমকুমারের মতো তিনিও ছিলেন বিবাহিত। সাবিত্রী যে বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে প্রেমে জড়িয়েছিলেন, তাঁদের কারও সংসার ভাঙেননি।

সরবেন্দ্রর বেলাতেও তাই-ই হয়েছিল। দিন-রাত সাবিত্রীর বাড়িতেই পড়ে থাকতেন সরবেন্দ্র। নেশায় বুঁদ থাকতেন। মদ্যপানের কারণে পেটে তীব্র যন্ত্রণা হত কখনও। সেই যন্ত্রণা মেটানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন সাবিত্রী। তাঁর অস্ত্রোপচারে সব রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মুম্বইয়ে হয়েছিল সেই অস্ত্রোপচার। অনেক আশা ছিল সাবিত্রীর, তিনি একটা মাস প্রেমিকের সঙ্গে মুম্বইয়ে কাটাবেন। কিন্তু পারলেন না। মুম্বইয়ে যাওয়ার বেলায় নিজের স্ত্রীকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সরবেন্দ্র। যদিও সরবেন্দ্র সাবিত্রীকে এবং সাবিত্রী সরবেন্দ্রকে ‘স্বামী-স্ত্রী’ হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

নিজের আত্মজীবনী ‘সত্যি সাবিত্রী’তে অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সরবেন্দ্রকে নিজের স্বামীর স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছিলেন, “যতই বিনি সুতোর মালার সম্পর্ক হোক না কেন, তবু আমি তো মনেপ্রাণে ওঁকে আমার যত না বন্ধু ভাবি, তার থেকে অনেক বেশি ভাবি—উনি আমার স্বামী। সিঁথিতে না হয় নাই বা সিঁদুর ছোঁয়ানো হল, হাতে না হয় না-ই বা শাঁখা উঠল, সানাই বাজিয়ে বেনারসি আর ফুলের মালায় সেজে, হাতে হাত রেখে বিয়ের মন্ত্র নাই বা উচ্চারণ করা হল, তার মানে কি দু’টো হৃদয় তাদের আপন রঙে সাজেনি? দু’টো মন কি নীরবে-নিভৃতে বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করেনি? বাকি সবটুকু তো বাইরের…”।

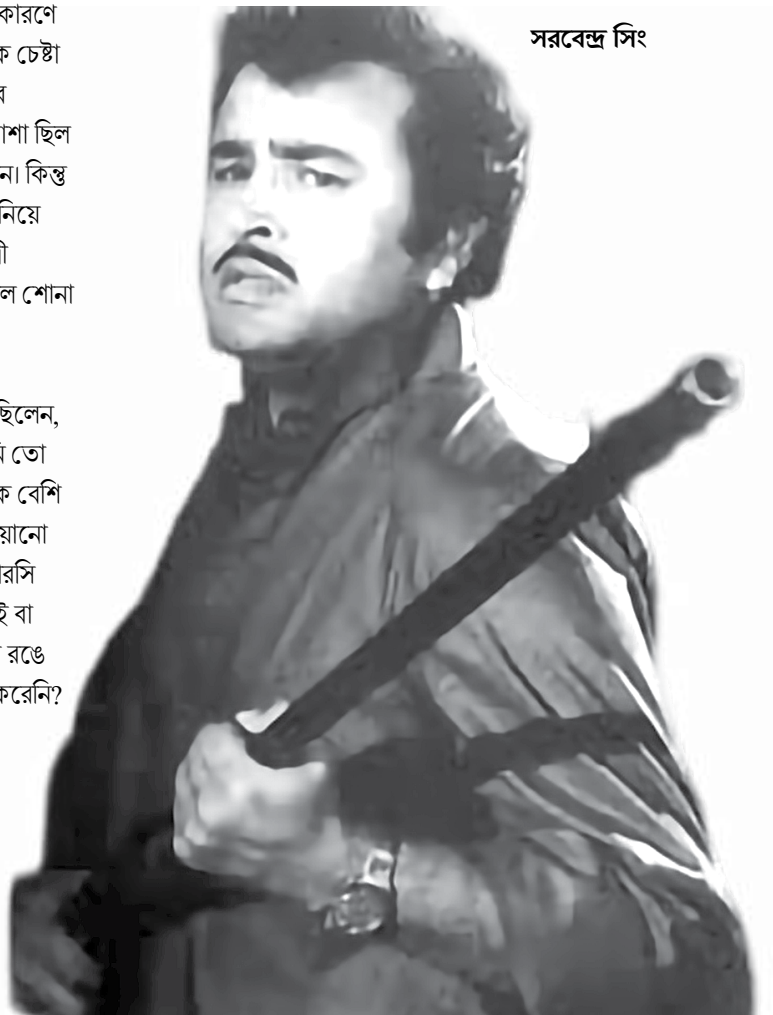

সরবেন্দ্র সিং

পাহাড়ের সাথে ক'দিন

মৌমিতা হাজরা সামন্ত

ভালোলাগা, ইচ্ছা, প্রকাশ সব যেন কোথাও একটা গিয়ে থেমে যায়। যার পরে আর কিছু ভালোলাগার থাকে না, কোনো ইচ্ছা থাকে না, প্রকাশ করার জন্য কোনো বিষয় থাকে না। সূর্যের উদয় আর অস্ত যাওয়ার মতো মানুষের আনাগোনা লেগে থাকলেও, পাহাড় কিন্তু নিজের জায়গাতেই ধীর, স্থির আর শান্ত। যেখানে গেলে মানুষ নিজেকেও শান্ত মনে করে। সূর্যের প্রতিটি কিরণে আরো নতুন রূপে ধরা দেয় নিজেকে।

শহরের কোলাহলের মাঝে যদি একটু সময় করে নেওয়া যায়, তার থেকে ভালো কিছু বোধহয় আর হয় না।

ব্যাঙ্গালোরে আসার পর কাছাকাছি বেশ কয়েকটা জায়গায় ঘুরতে গেলেও, প্রথম যে পাহাড়ের আলিঙ্গন পেয়েছি তা হল উটি হিল স্টেশন।

যদিও যাত্রা শুরু করেছিলাম মাইসোরের উদ্দেশে। তবে মাইসোর ও উটি একসাথে দেখে ফেরার প্ল্যান ছিল। মাইসুরুতে একরাত্রি থেকে পরদিন সকালে কয়েকটি জায়গা দেখে রওনা দিলাম উটির দিকে। রাস্তায় যেতে যেতে পড়ল বিশাল লম্বা আকারের এক ধরনের গাছ। যা আমি এর আগে দেখিনি। হ্যাঁ, নীলগিরির কথাই বলছি। বিশাল আকৃতির সারি দিয়ে থাকা এই গাছগুলোর পাশ দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তা দিয়েই যাত্রীবাহী গাড়ির আনাগোনা।

যেখানে নাইট স্টে করব সেখানে পৌঁছোতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল। একটু বিশ্রাম নিতেই হয়। তবে সন্ধ্যার পর হোটেলের কাছাকাছি মার্কেট

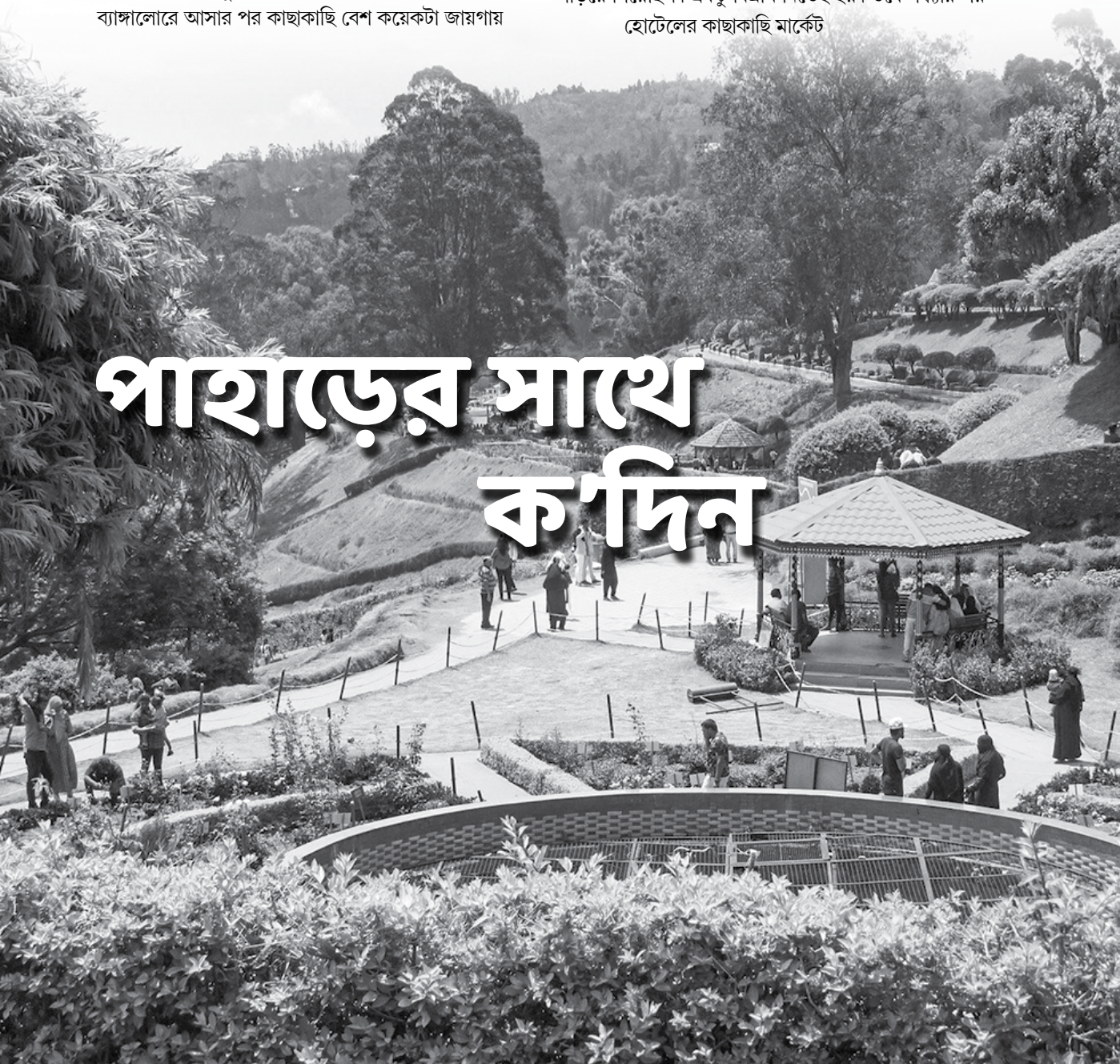

ঘুরে দেখতে বেশ লাগছিল। এভাবেই কেটে গেল প্রথম রাত্রি। পরদিন বেশ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম।

সকাল শুরু হল চা পাতার বাগান দেখে। গরম এক কাপ চায়ে চুমুক দিয়ে আমরা দিন শুরু করি। নিজেদের রিফ্রেশ করে নিই। এতটা ধৈর্য ও সময় নিয়ে চা বাগানের মহিলাকর্মীরা সুন্দর করে চা পাতা তুলছেন আর নিজের পিঠে রাখা ঝুড়িতে ভরতি করছেন। সকালের স্নিগ্ধতা মাখা এই দৃশ্য মন ছুঁয়ে গেল। ঠিক ছিল প্রথমে আমরা 'ডলফিন নোজ'এ যাব, তবে বেশ সকাল সকাল সেখানে চলে যাওয়ায় জায়গাটি বন্ধ থাকার কারণে, চা বাগানে চা পাতা কীভাবে তোলা হয়, তা দেখার অভিজ্ঞতা হল। উটিতে এসেছি আর চা বা কফি নেব না, তা কখনও হয়! যে রাস্তার ওপর থেকে চা বাগানটি দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে কয়েক পা হেঁটে গেলেই ডলফিন নোজ, আর মাঝে কয়েকটি চায়ের দোকান রয়েছে। সেখান থেকে অল্প কিছু খেয়ে চললাম গন্তব্যের দিকে।

সত্যি কথা বলতে এখন ইউটিউব, ফেসবুকের পাতায় চোখ রাখলে পুরো জগতের খারাপ, ভালো সবকিছু দেখা যায়। তবে গল্পের বই বা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলো শব্দ পড়ে যদি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে কল্পনা করা যায়, তবে তার থেকে বেশি আনন্দের কিছু হয় না।

দ্বিতীয় দিনেই আমরা বেশিরভাগ জায়গা দেখেছিলাম যেগুলো আমাদের প্ল্যানে ছিল। ডলফিন নোজ-এর পর আমরা গিয়েছিলাম 'ল্যামস রকস'। বিশাল আকৃতির পাথর প্রকৃতির নিয়মে এমনভাবে ধাপে ধাপে সিঁড়ির আকারে বসানো আছে, সেই সিঁড়ি বেয়ে মানুষের যাতায়াত। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, সিঁড়ির প্রতিটা ধাপেই কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে কথা বলা যায়। এই জায়গাটির পর আমরা গেলাম ওড্ডাবেট্টা পিক। জায়গাটির এন্ট্রির সামনে বেশ কিছু দোকান। ঘর সাজানোর জিনিস থেকে শুরু করে, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, জামাকাপড় খাবারদাবার প্রায় অনেক কিছু জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে। এই পিক ভিউ নেওয়ার আগে আমরা এখানকার কফি চেখে দেখলাম।

মন ভালো করা বাতাস চলছে চারিদিকে, অল্প কুয়াশা আছে, গায়ে বেশ মোটা গরমের কাপড়, চারিদিকে মানুষের হাসিখুশি মুখ, পাহাড় কাছে ডেকে নিয়েছে আমাদের, এই অবস্থায় হাতে গরম কফি যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

এরপর জায়গাটিতে বেশ কিছুক্ষণ থেকে আমরা চলে গিয়েছিলাম 'দ্য টি মিউজিয়াম'।

বাগান থেকে চা কর্মীরা কীভাবে চা পাতা তুলে ঝুরিতে ভর্তি করে তা আমি দেখেছি। এখন দেখছি কীভাবে সেই চা পাতা থেকে, চা-গুঁড়োতে পরিণত হয় এবং আমরা সেই চা ফুটিয়ে তার নির্যাস পান করি! এটা দেখার একটা আলাদা অভিজ্ঞতা। প্রথমে পাতাগুলো ধুলোমুক্ত করা হচ্ছে, ঝাড়াই বাছাই থেকে শুরু করে চা তৈরিও হচ্ছে এই মিউজিয়ামে। সবটাই কিন্তু করছে মেশিন। তাকে চালনা করছে মানুষ। এই মিউজিয়ামে পা রাখা সকলের হাতেই এক কাপ করে চা তুলে দিচ্ছেন এখানকার কর্মীরা এবং সেটার স্বাদও কিন্তু অসাধারণ। মিউজিয়াম থেকে বেরোতেই রয়েছে বেশ কয়েকটি দোকান যেখানে হ্যান্ড মেড সাবান, শ্যাম্পু, বিউটি প্রোডাক্ট এসব নানা ধরনের জিনিস বিক্রি হচ্ছে। তার সঙ্গে চা, কফি তো রয়েইছে।

এর পাশেই রয়েছে চকোলেট তৈরির কারখানা। যাদের চকলেটের স্মোকি গন্ধটা ভালো লাগে তারা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ এখানে থাকতে চাইবে। একইভাবে এখানেও বিক্রি হচ্ছে হ্যান্ড মেড হোয়াইট, ব্ল্যাক চকলেট, বিভিন্ন

মশলা, স্ন্যাকস। কয়েকটা জিনিস আমরা কিনেছি বাড়ির জন্য।

ব্যাস! এবার আমাদের ফেরার পালা। তারপর লাঞ্চ সেরে আবার একটু বেরোনোর ইচ্ছা রয়েছে।

ফিরতে ফিরতে প্রায় ২-৩টে বেজে গেছে। এরপর একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ কমপ্লিট করলাম। রোজ গার্ডেন দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সবুজ ঘাসের ওপর ফুল দিয়ে করা নকশা চিত্র, দু'দিকে বিভিন্ন প্রজাতির গোলাপের সারি দিয়ে গাছ আর মাঝখানের রাস্তা দিয়ে হাঁটা পথ, সবটা মিলিয়ে এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করেছে। আজকের জন্য এতটুকুই ছিল। পরেরদিন বাড়ি ফেরার পালা।

ঠিক হল, এদিন যেহেতু আমাদের বাড়ি ফেরার পালা তাই কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা দেখেই বেরিয়ে পড়বে। একটাই জায়গা সকালবেলা যেতে পেরেছিলাম উটি লেক। আগের দিনের মতো এখানেও অনেক সকালবেলা পৌঁছে যাওয়ায় তখনো এন্ট্রি গেট খোলা হয়নি। তাই সামনের একটা দোকান থেকে গরম চা, মাখন দিয়ে পাউরুটি খেয়েই আমাদের সকালের খাবার সেরেছিলাম। এই জার্নি আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো ছিল সেটা হল উটি লেকে বোটিং। লেকের কাছাকাছি বেশ কয়েকটি দোকান ছিল, যেখানে কাশ্মীর থেকে আনা কিছু সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছিল। যাইহোক হাতে সময় নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম রাতে যে মাইসুরুতে কাটিয়েছিলাম সেদিন মাইসোর রাজবাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েই আমরা, আলোর চাকচিক্য দেখেছিলাম। কারণ আমরা গিয়েছিলাম দশেরার সময়। সেদিন আর ভেতরে যাওয়া হয়নি। তাই ফেরার পথে রাজবাড়ির ভিতরের সাজসজ্জা দেখার ইচ্ছা পূরণ করব ঠিক করাই ছিল। প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছিল পৌঁছোতে। বেশ সময় লাগল ভেতরটা ভালোভাবে ঘুরে দেখতে। আর একটু সময় পেলে মন্দ হতো না, তবে সময় তো বাঁধা, বাড়ি ফিরতেও রাত হয়ে যাবে আর সকলের বিশ্রামের প্রয়োজন। একগুচ্ছ পূরণ হওয়া ইচ্ছা, ভালোলাগা, আনন্দ যাই বলি না কেন সবকিছু নিয়ে রওনা দিলাম বাড়ির উদ্দেশে। মনের অ্যালবামে রেখে দিলাম ক'টা দিনের অনেক ভালো মুহূর্ত।

কিংবদন্তি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাচনশৈলী আর ম্যানারিজমকে জীবনের ধ্রুবতারা করে পর্দা থেকে মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন শিল্পী অনুপম সরকার। তাঁর কাছে কিংবদন্তি অভিনেতা এক সাগর। শান্তিপুরের অনুপম কীভাবে অনুরাগীদের কাছে ভক্ত ভানু হয়ে উঠলেন সেই গল্পই এই সাক্ষাৎকারে।

কমেডি আর মিমিক্রি কি এক?

●● পুরোপুরি এক নয়। মিমিক্রি মানে কারোর গলা নকল করা। তার সঙ্গে যখন হাস্যরস যোগ হয়, তখন হয় কমেডি।

● অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কীভাবে আকৃষ্ট হলেন?

●● মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমাদের শিক্ষক নয়নকুমার সেনগুপ্ত 'ভানু পেল লটারি'র আদলে ছোটোদের উপযোগী একটা নাটক করার কথা ভাবেন। সেখানে ভানু ব্যানার্জির চরিত্রে অভিনেতা খোঁজা হচ্ছিল। বাঙাল পাড়ার ছেলে হওয়ায় বাঙাল ভাষায় দক্ষ ছিলাম। ওই নাটকে ভানু ব্যানার্জির চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাই। আর এই চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে ভানু ব্যানার্জির কৌতুক নকশা শুনি, বারবার তাঁর সিনেমা দেখি। ওর বাচনশৈলী ও ম্যানারিজম অনুসরণ করার চেষ্টা করি। সেই থেকে অভিনেতা ভানু ব্যানার্জির প্রতি আকৃষ্ট হই। ক্লাস এইট থেকে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত টানা ৫ বছর তাঁকে নিয়ে চর্চা করি।

● জি বাংলার মীরাক্কেল-এ কবে সুযোগ পেলেন?

●● ২০০৭ সালে অডিশন দিয়ে মীরাক্কেল সিজন টু তে সুযোগ পাই। ভানু ব্যানার্জির কণ্ঠস্বরের একটা প্যাটার্ন রয়েছে। সেটা অনুসরণ করে মীরাক্কেলে কমেডি পরিবেশন করে জনপ্রিয়তা পাই। মীরাক্কেল সিজন নাইন পর্যন্ত যুক্ত ছিলাম। প্রথমদিকে পারফর্মার আর শেষের দিকে গেস্ট পারফর্মার ছিলাম।

● এরপর কোথায় সুযোগ পান?

●● এরপর স্টার আনন্দে (এখন এবিপি আনন্দ) প্রতি শনিবার করে 'দু খান' কথা নামে এক অনুষ্ঠানে ভানু ব্যানার্জির কার্টুনের সঙ্গে ভয়েস ওভারে আমি গলা দিতাম।

নতুন প্রজন্মকে চেনাতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন ভাবে ফেরাতে চাই : অনুপম সরকার

● কবে থেকে ভক্ত ভানু হয়ে উঠলেন?

●● ২০১২ সালে ৯২.৭ বিগ এফএম -এ আমার একটা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। তারপর ওই চ্যানেলে ভক্ত ভানু নামে এক অনুষ্ঠানের সুবাদে আমি অনুরাগীদের কাছে ভক্ত ভানু নামে পরিচিত হয়ে উঠি।

● ভানু ব্যানার্জির পরিবার আপনার গলা শুনেছেন?

●● ২০১৭ সাল থেকে ভানু ব্যানার্জির পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরি হয়। ভানু ব্যানার্জির মেয়ে বাসবী ঘটক ব্যানার্জি আমার কণ্ঠস্বর তাঁর মা নীলিমা ব্যানার্জিকে শোনান। তিনি শুনে বলেন, 'এ তো দেখছি হুবহু তোর বাবার মতো গলা'। হ্যাঁ, মাসিমার মুখের সার্টিফিকেট আমার জীবনের বড় পাওয়া। তারপর মাসিমা সহ ওঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা আজও অটুট।

ভানু ব্যানার্জিকে নিয়ে আনঅফিসিয়ালি ১৫ বছর ধরে রিসার্চ করতে গিয়ে ঢাকা ও বাংলাদেশের নানা জায়গায় গিয়ে দেখেছি বিক্রমপুরের কুট্টি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা ঘোড়ার গাড়ি চালায়। তাদের ভাষার সঙ্গে কলকাতার বিশুদ্ধ ভাষা মিশিয়ে ভানু ব্যানার্জি রেকর্ডে কৌতুক নকশা পরিবেশন করতেন। এতে ওই নকশা সহজে বোঝা যেত আর নির্মল হাসি থাকত।

● মঞ্চে প্রথম কবে কমার্শিয়াল অনুষ্ঠান করেন?

●● ২০১২ সালে দিদিভাইয়ের (বাসবী ঘটক ব্যানার্জি) ব্যবস্থাপনায় কলকাতার এক মঞ্চে অনুষ্ঠান করে ৫,০০০ টাকা পারিশ্রমিক পাই। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি।

● নিজের কোনো রেকর্ড বেরিয়েছে?

●● হ্যাঁ, ২০১৬ সালে হিন্দুস্থান রেকর্ড থেকে নতুন সংলাপে নতুন কৌতুক নকশা 'আবার ভানু' বেরোয়। চিত্রনাট্য লেখেন তৃণাঞ্জয় ভট্টাচার্য। এরপর স্বাধীনভাবে আমার ইউটিউব 'সমর্পণ' থেকে বিভিন্ন সময় বেরোয়। তারমধ্যে কর্তা বনাম গিন্নির আদলে 'কর্তা বনাম গিন্নির ঝগড়া' নামে এক রেকর্ড বেরোয় যেখানে আমার সঙ্গে গলা দেন বাসবী ঘটক ব্যানার্জি। দারুণ হিট করে।

● শুনেছি আপনি বাংলা সিরিয়ালেও সিনেমায় অভিনয় করেছেন?

●● ঠিক শুনেছেন। কমেডিয়ান ভক্ত ভানু ছাড়াও আমার অন্য পরিচয় অভিনেতা অনুপম। ছোটপর্দায় অভিনয় করেছি এই সব সিরিয়ালে গাঁটছড়া, তুমি যে আমার, নিম ফুলের মধু, শুভ বিবাহ। আর সিনেমার মধ্যে রয়েছে: যমালয়ে জীবন্ত ভানু। এখানে বলরাম চরিত্রে অভিনয় ছাড়াও অপুদার (শাশ্বত চ্যাটার্জি) মুখে ভানু ব্যানার্জির প্যাটার্নে সংলাপটা আমি লিখি। যদিও সিনেমার চিত্রনাট্য পরিচালক ডা. কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি। ভানু ব্যানার্জির সংলাপ নিয়ে একটা কথা বলতে চাই। ভানু ব্যানার্জি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা বা বিক্রমপুরের ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু অন্য জায়গায় অন্য ভাষায় বলতেন। ভানু ব্যানার্জিকে নিয়ে আনঅফিসিয়ালি ১৫ বছর ধরে রিসার্চ করতে গিয়ে ঢাকা ও বাংলাদেশের নানা জায়গায় গিয়ে দেখেছি বিক্রমপুরের কুট্টি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা ঘোড়ার গাড়ি চালায়। তাদের ভাষার সঙ্গে কলকাতার বিশুদ্ধ ভাষা মিশিয়ে ভানু ব্যানার্জি রেকর্ডে কৌতুক নকশা পরিবেশন করতেন। এতে ওই নকশা সহজে বোঝা যেত আর নির্মল হাসি থাকত।

● এখন কমেডি শিল্পী কি কম হচ্ছে?

●● একটা পাড়ায় যদি ১০০ জন গান বা নাচ শেখেন, সেখানে হয়তো ১০জন অভিনয় শেখেন। তারমধ্যে একজন বা দু'জন কমেডি শিল্পী হন। কমেডির ক্ষেত্রে টাইমিং সেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত চর্চার মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়।

● সোশাল মিডিয়া কি স্টেজের বিকল্প হয়ে উঠছে?

●● কমেডি অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। যেমন, ভেজ, নন ভেজ, বা ইন্টেলেকচুয়াল জোকস। এখন সোশাল মিডিয়ার ইউটিউবে নন ভেজের নামে এমন সব জোকস পরিবেশিত হয় যা অনেকক্ষেত্রে শালীনতার সীমা পার করে যায়। সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তিগত হলেও সমাজে তার নেগেটিভ প্রভাব পড়ে। অনেকে এই পথে ভিউয়ার বাড়িয়ে ভালো আয় করছেন। কিন্তু আমি ভিউয়ারদের চেয়ে পারফরমারদের দায়ী করতে চাই। তাঁদের কি কোনো সামাজিক দায় নেই? কমেডি পারফরম্যান্স মানে বিনোদনের পাশাপাশি একটা সোশাল ম্যাসেজ থাকে, সেটা এড়িয়ে গেলে চলবে না।

● আপনি ভানু ব্যানার্জিকে নিয়ে কত বছর কাজ করছেন, আগামীদিনের পরিকল্পনা কী?

●● আমি টানা ২৫ বছর ভানু ব্যানার্জিকে নিয়ে কাজ করে চলেছি। কিংবদন্তি ভানু ব্যানার্জি বাঙালির এক আবেগ। চলে যাওয়ার এত বছর পরেও তাঁর কৌতুক শুনে সবাই হেসে কুটোপুটি হয়। বাঙালির নস্টালজিয়াকে উস্কে দিতে ভানু ব্যানার্জিকে নতুন নতুনভাবে ফিরিয়ে আনতে চাই। নতুন প্রজন্মকে চেনাতে চাই।

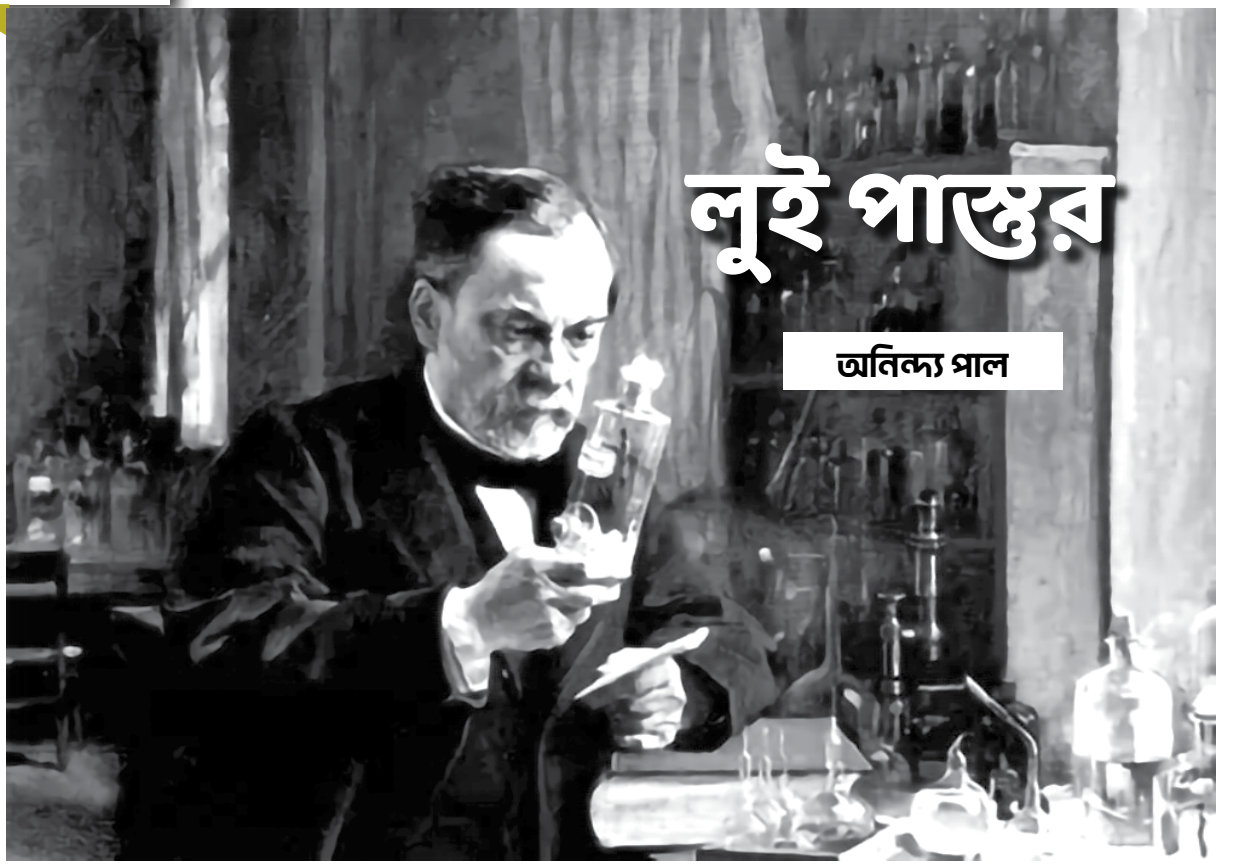

লুই পাস্তুর

অনিন্দ্য পাল

পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুগুলোর মধ্যে অন্যতম হল সংক্রমণ। আর বলাই বাহুল্য যে এই সংক্রমণের জন্য দায়ী খালি চোখে দেখাই যায় না এমন সব জীবাণু। এই জীবাণু পৃথিবীতে বারবার মহামারী বয়ে এনেছে। মারা গেছে অসংখ্য মানুষ এবং গবাদি পশু। মহামারীর সবচেয়ে পুরোনো যে ঘটনা আমরা জানতে পারি, সেটা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ঘটেছিল। ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বে চিনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটা গ্রামে এই মহামারীর প্রমাণ মিলেছে। পাওয়া গেছে শিশু থেকে বয়স্ক সব বয়সের মানুষের কঙ্কাল। এই মহামারী এত কম সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, যে শবদেহের সৎকার পর্যন্ত করা যায় নি।

এই মহামারীর সময় সারণি লক্ষ করলে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই জীবাণু ঘটিত সংক্রমণ জনিত রোগই প্রধান কারন। আবার এই মহামারীর কারণ যে সমস্ত রোগ, তাদের সব কটাকে সারিয়ে তোলার মত ওষুধ ও যেমন আজো পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায় নি, তেমনি সব রোগের টিকা বা ভ্যাকসিন আজো মেলেনি। ২০১৯-২০২১ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাণ্ডব চালানো করোনা ভাইরাসের টিকাও এখনও গবেষণার স্তরে। ইবোলা, এডস এদের টিকার খোঁজে বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে গবেষণা করছেন যেমন, তেমনি বিভিন্ন ধরনের থেরাপির সাহায্যে খানিকটা সারিয়ে তোলার ব্যবস্থাও করছেন বৈকি।

এই জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের অন্যতম মুখ বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। লুই পাস্তুর একজন ফরাসি অণুজীববিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন অণুজীব অ্যালকোহলজাতীয় পানীয়ের পচনের জন্য দায়ী। জীবাণুতত্ত্ব ও বিভিন্ন রোগ নির্মূলে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ফ্রান্সের জুরা প্রদেশের দোল শহরে। আর বেড়ে ওঠেন আরবোয়া শহরে। দরিদ্র পিতা সেখানকার একটি ট্যানারিতে চাকরি করতেন। ১৮৪৭ সালে পাস্তুর ফ্রান্সের একোল থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সেখানে তিনি কেলাসের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় যে আলো সমবর্তিত হয়ে যায় তা পরীক্ষা করে দেখান। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি "মিস্টসচারলিখের রিডল" সমাধান করেন। ফলে রসায়ন বিদ্যায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এই সাফল্য তাঁকে পৌঁছে দেয় লিল্লের বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে তিনি রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। আবার এই লিল্লের শহর বীট-চিনি থেকে মদ তৈরির জন্য ছিল বিখ্যাত। তবে এই মদ তৈরি করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই একটা বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হত প্রস্তুতকারকদের। বীট-চিনি থেকে মদ

তৈরির সময়েই অনেক ক্ষেত্রে কোন অজানা কারণে মদ যেত নষ্ট হয়ে। পাস্তুর সেখানে যাবার পর সেখানকার ব্যবসায়ীরা তাঁর শরণাপন্ন হলেন। পাস্তুর এই বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে গবেষণা করলেন এবং আবিষ্কার করলেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি বললেন, এই মদ নষ্ট হবার জন্য দায়ী এক ধরণের আণুবীক্ষণিক জীব যাদেরকে আমরা ব্যাকটেরিয়া বলেই জানি। এই গবেষণার সঙ্গে তিনি আরও জানালেন যে, ইস্ট নামের এই ব্যাকটেরিয়া গুলো ১২০° ফারেনহাইট বা তার চেয়ে বেশি উষ্ণতায় বেঁচে থাকতে পারে না। এভাবে গরম করে জীবাণু নষ্ট করে দুধ, মাছ, মাংস এবং নানা ধরনের খাবার জিনিস ঠিক রাখা যায়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'পাস্তুরাইজেশন' বা 'পাস্তুর-ক্রিয়া'। ১৮৭০ সালে এই ভাবেই মদ শিল্পের থেকে ফ্রান্স প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং প্রুসিয়ার কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও সম্রাজ্ঞী ইলজেনিক তাঁদের প্রাসাদে পাস্তুরকে আমন্ত্রণ জানান এবং তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রায় তিরিশ হাজার ফ্রাঁ খরচ করে পাস্তুরের জন্য তৈরি করে দেন গবেষণাগার।

ফ্রান্স সরকার পাস্তুরকে ফ্রান্সে রেশম শিল্পের সমস্যা সমাধানে আহ্বান জানায়। হচ্ছিল কি রেশম পোকার মধ্যে গোল মরিচের মত একধরনের কালো ক্যাপ দেখা যাচ্ছিল। এই রোগ সেখানে 'পেব্রাইন' নামে পরিচিত ছিল। এই রোগে রেশম শিল্প খুব মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। পাস্তুর গবেষণা করলেন এবং দেখালেন রেশম পোকার এই সমস্যা বংশগত এবং মায়ের থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সংক্রামিত হতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন কেবল রোগমুক্ত গুটি বাছাই করার মাধ্যমেই রেশম শিল্পকে বাঁচানো সম্ভব। তিনি গবেষণার মাধ্যমে এটাও দেখালেন যে পেব্রাইনের সঙ্গেই আরও এক ধরনের জীবাণু সংক্রমিত হয়ে 'ফ্ল্যাচারিয়ে' নামে এক ধরনের রোগও এই সঙ্গে রেশম শিল্পের ক্ষতির জন্য দায়ী। এই জীবাণু নষ্ট করার উপায়ও তিনি দেখালেন।

পাস্তুর "রোগের জীবাণু মতবাদ"ও প্রচার করেন। তাঁর মতে জীবাণু কখনোই আপনা থেকে সৃষ্টি হয় না, জীবণু কেবল জীবাণু থেকেই সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে অবহিত হবার পর থেকেই অপারেশন এবং অন্যত্রও হাত ধোয়া, ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ডোবানো, সাবান, স্যানিটাইজার এবং বিভিন্ন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় যাতে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমান যায়।

সেই সময় ঘেয়ো জ্বরের উৎপাতে গবাদি পশুরা মারা যেত। এই ঘটনা পাস্তুরকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। তিনি এই ঘেয়ো জ্বরের হাত থেকে পশুদের বাঁচানোর জন্য গবেষণা শুরু করলেন। তিনি দেখলেন যে ১০৭° থেকে ১০৯° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় এই জীবাণুগুলো মরে যায়। চিরতরে এই ধরনের রোগকে দূর করার জন্য রোগাক্রান্তের শরীর থেকে রোগ জীবাণু নিয়ে সুস্থ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়ে টিকা তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে তিনি মারণ রোগ জলাতঙ্কের জীবাণুর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিষেধক বা "অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিন" তৈরির পথ দেখান। তিনি তাঁর তৈরি টিকা এলস্যাসের নয় বছরের ছেলে, জোসেফ মেইস্টারের উপর প্রয়োগ করলেন। জোসেফকে তার কিছুদিন আগে পাগলা কুকুরে কামড়ে দিয়েছিল। তাঁর আবিষ্কার করা টিকা দেওয়ায় ফলে মেইস্টার সাঙ্ঘাতিক রোগ জলাতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং পাস্তুরের এই চিকিৎসা প্রণালী চিকিৎসক মহলে দারুণ সমাদৃত হয় এবং এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গবেষণায় আকাশচুম্বি সাফল্য তাঁকে বিজ্ঞানীমহলে অনেক সম্মান এনে দিলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব একটা সুখী হতে পারেননি। তাঁর বাবা এবং দুই ছেলে অকালে মারা যায়। তিনি নিজেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। শেষ জীবনে একগ্লাস দুধও খেতে পারতেন না। ১৮৯৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এই মহান মানুষটির জীবনাবসান হয়।

পাস্তুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি সারা জীবন ধরে কি দেখলেন এবং কি শিখলেন, উত্তরে তিনি বলেন, " দেখলাম, এ জগতে সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক।"

পাস্তুরকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি সারা জীবন ধরে কি দেখলেন এবং কি শিখলেন, উত্তরে তিনি বলেন, " দেখলাম, এ জগতে সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক।"

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সত্যিই চাকরির বাজারে থাবা বসাচ্ছে?

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের পর কাজের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। সরকারি ও বেসরকারি কাজে ম্যানুয়ালের জায়গায় শুরু হয় কম্পিউটার প্রযুক্তি। কলকারখানায় চালু হয় অটোমোশন। তার প্রভাবে

উৎপাদনক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন হলেও পরিষেবা ক্ষেত্র বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বাড়ে। ধীরেধীরে দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হয়ে ওঠে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প। হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু , চেন্নাই এর মত কলকাতার সল্টলেক হয়ে ওঠে " আইটি হার্ব"।

আরো দ্রুত ও উন্নয়নমুখী কাজের জন্য সময়ের চাহিদা মেনে কাজের ক্ষেত্রে চালু হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি। এই মুহূর্তে কাজের নতুন প্রযুক্তি আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। বাংলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উৎপাদন থেকে বিনোদন প্রতিটি ক্ষেত্রে এ আই প্রযুক্তির প্রয়োগ হচ্ছে। এই প্রযুক্তির প্রয়োগে যুগান্তকারী উন্নতি হয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে। রোবটিক প্রযুক্তির প্রয়োগে অনেক জটিল ও কঠিন অপরেশন খুব সহজ হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তি আসায় উৎপাদনমূলক শিল্পক্ষেত্রের গতি ও উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে।

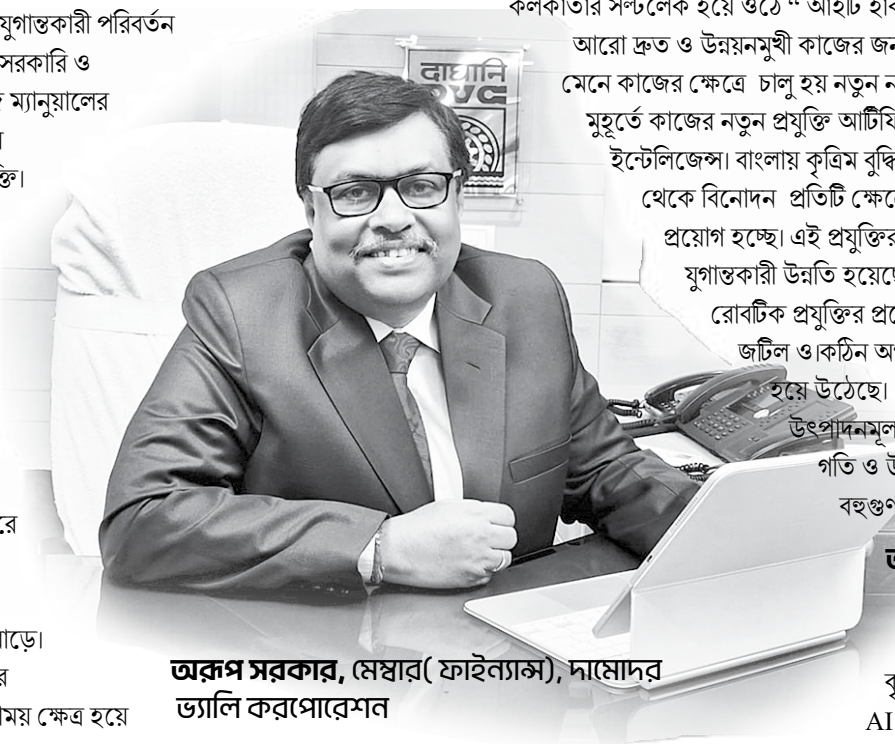

অরূপ সরকার, মেম্বার(ফাইন্যান্স), দামোদর ভ্যালি করপোরেশন

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কী?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI হলো কম্পিউটার

বিজ্ঞানের এমন একটি ক্ষেত্র যার মুল লক্ষ্য বুদ্ধিমান মেশিন তৈরি করা। এই সকল মেশিন এমন সব কাজ করতে সক্ষম যা সাধারণত মানুষের বুদ্ধিমত্তা ছাড়া এতদিন করা সম্ভব ছিলো না। কম্পিউটার বিজ্ঞানের এই শাখাটি Machine learning (ML), Natural Language Processing, computer vision আর Robotics এর মতো বিভিন্ন উপশাখাকে একত্রিত করে এমন একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছে যা নিজস্বভাবে শিখতে, যুক্তি দিতে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারে।

আমাদের দেশে কম্পিউটার যখন প্রথম চালু হয় তখন যে প্রশ্ন উঠেছিল, এখন কৃত্রিম প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে সেই একই প্রশ্ন উঠেছে।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সত্যিই চাকরির বাজারে থাবা বসাচ্ছে? এই ভয়টাই চেপে বসেছে বিশ্ব জুড়ে। চারদিকে চাকরি গেল গেল রব। অনেকেই মনে করছেন, চাকরির বাজারে ভবিষ্যতে ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আগ্রাসী প্রসারের কারণে বিভিন্ন সংস্থা মানবসম্পদের বোঝা কমিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর হতে চাইছে। আগামী ৫ বছরে এ আই এর প্রয়োগ নানা ক্ষেত্রে আরো বাড়বে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব রূপান্তর, অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী শ্রমবাজার পুনর্গঠিত হচ্ছে। সমীক্ষা বলছে আগামী দিনে কাজের বাজারে একটা বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে।

আগামী পাঁচ বছরে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অন্যান্য দক্ষতার তুলনায় লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বিগ ডেটা। তার পরে রয়েছে নেটওয়ার্ক এবং সাইবার নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা। সমীক্ষা অনুযায়ী, শিল্পসংস্থার কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দক্ষতা। সমীক্ষা বলছে, নতুন প্রযুক্তিতে কাজ কমবে না। কাজ করাটা আরও সহজ হয়ে উঠবে। চাকরির ভূমিকা পরিবর্তনের ইতিবাচক দিকও আছে। এআই আসার কারণে অনেক নতুন নতুন চাকরির ক্ষেত্রও তৈরি হবে। আবার কিছু নিরাপদ চাকরি আছে, যেখানে এআই তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তিগত বুদ্ধির দ্বারা চালিত ভূমিকার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাকরিগুলির মধ্যে রয়েছে বিগ ডেটা বিশেষজ্ঞ, ফিনটেক ইঞ্জিনিয়ার এবং এআই ও মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞ।

যে সমস্ত ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজের দক্ষতার কোনও দরকার পড়ে না, অর্থাৎ নিয়মমাফিক একই ধাঁচে কাজ করে যেতে হয় সেই সমস্ত কাজের বাজারে মানবসম্পদ ছাঁটাই করে এআই তার দখল নিয়ে নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন ধরা যাক বিষয় লেখক বা কনটেন্ট রাইটার। এই ধরনের কাজ বা কনটেন্ট যাঁরা তৈরি করেন সেই কাজ এক–চতুর্থাংশ এআই করে দিতে সক্ষম।

বর্তমানে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম এবং স্টার্ট-আপ সংস্থা এআই নির্ভর হতে শুরু করেছে।গ্রাফিক ডিজাইন ও ভিজ্যুয়াল আর্ট-সম্পর্কিত কাজও এআইয়ের কাছে চলে যেতে পারে। অ্যালগরিদমের মাধ্যমে যে সব কাজ করা হয় সেই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রগুলি ক্রমে এআইয়ের দখলে চলে যেতে শুরু করেছে।

আরও কয়েকটি পেশা রয়েছে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বড় প্রভাব ফেলতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে বিমাক্ষেত্রে দায়ভার নির্ধারণ করার কাজ, গুদাম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কিংবা কায়িক শ্রম নির্ভর উৎপাদনের কাজ, গ্রাহক পরিষেবার কাজ, ডেটা এন্ট্রির কাজ ইত্যাদি। এ ছাড়া হিসাবরক্ষক, প্যারালিগাল চাকরি, রেডিয়োলজিস্টের মতো কয়েকটি পেশায় চাকরি আর সৃষ্টি না-ও হতে পারে আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে।

আগাম তথ্য এবং বিবেচনা ব্যবহার করে যাঁরা শিক্ষা ও কাজের প্রকৃতি বদলে ফেলতে পারবেন, তাঁদের চাকরির অভাব হবে না। যাঁরা পুরনো চাকরিতে দক্ষতার মাঝের সারিতে রয়েছেন, তাঁরা যদি কৃত্রিম বুদ্ধির দাপটে চাকরি বদলাতে বাধ্য হন, তাঁদের ক্ষেত্রে কিন্তু নতুন পেশায় নীচের দিকে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ফলে আয়ও কমতে পারে।

ফরেন্সিক বিজ্ঞানী, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, ভূতাত্ত্বিক প্রযুক্তিবিদ থেকে শুরু করে শিল্পক্ষেত্রে Analytics expert–er চাকরি— সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনুষঙ্গে ক্রমশ বাড়বে। কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম মেধার ব্যবহার হবে সীমিত। যেমন, কৃষিবিশারদ, মনোরোগবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, অপরাধের বিচার, শিক্ষকতা, মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা,গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখার মতো ক্ষেত্রে। বাড়বে দক্ষ কর্মীদের চাহিদা।

ডেলিভারি পৌঁছে দেওয়ার কর্মী, সফ্‌টঅয়্যার ডেভেলপার, নির্মাণ কর্মী, খুচরো দোকানকার, কলের মিস্ত্রি, নার্সিং পেশার সঙ্গে যুক্ত কর্মী, সমাজকর্মীদের চাকরিগুলির পরিসর আগামী পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উঠে এসেছে নানা সমীক্ষায়।

প্রযুক্তির চাহিদা যত বাড়ে তত আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সেই চাহিদার জোগান দিতে জড়িয়ে পড়েন। কাজের বাজারের পরিসর বাড়তে থাকে। কিন্তু যে কাজে পৌনঃপুনিকতা আছে সেখানেই কৃত্রিম মেধার বাড়বাড়ন্ত। তবে মানুষের মতো সৃজনশীল এখনই হতে পারবে না এআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করবে তো মানুষ। যেমন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু অপরেশন তো করছে চিকিৎসকরাই। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে যাবে? না, প্রযুক্তি অপারেট করার জন্য দরকার হবে দক্ষ কর্মী। ফলে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি কে আমাদের মেনে নিতে হবে। কাজের বাজারে টিকে থাকতে নিজেদের স্কিল বাড়াতে হবে।

নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের যার যে বিষয়ে আগ্রহ সে সেই বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে পারেন। তবে নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠতে হবে।

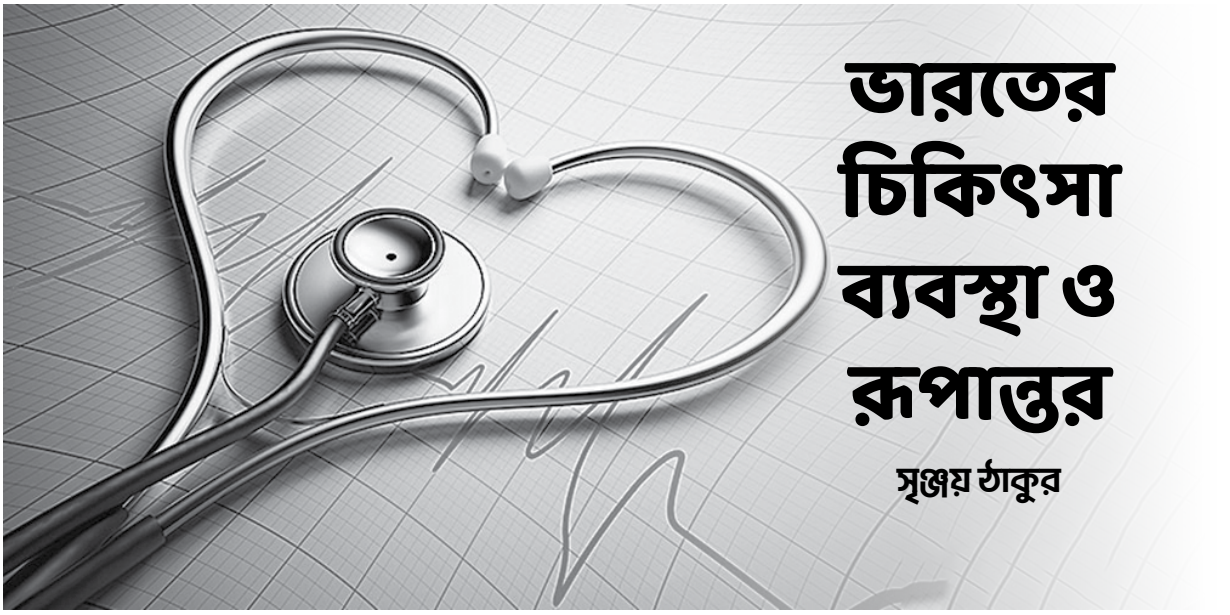

ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রূপান্তর

সৃঞ্জয় ঠাকুর

১৮৩৫ সালের আগে ভারতে চিকিৎসা ও চিকিৎসা পদ্ধতি কেমন ছিল জানা দরকার।

১৮৩৫ সালের আগে অর্থাৎ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা ভারতে আসার আগে পর্যন্ত, দেশের চিকিৎসা পদ্ধতি মূলত দেশজ ঐতিহ্য ও প্রাচীন জ্ঞানভিত্তিক ছিল। এই চিকিৎসা পদ্ধতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছিল এবং তাতে ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক ছিল।

প্রধান চিকিৎসা পদ্ধতি:

১. আয়ুর্বেদ :

• বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্রগুলোর একটি।
• মূল ভিত্তি ছিল: ত্রীদোষ তত্ত্ব (বাত, পিত্ত, কফ)।
• রোগের কারণ ধরা হত দেহের এই তিন দোষের ভারসাম্যহীনতা।
• ওষুধ তৈরি হত: গাছ-গাছড়া, খনিজ, প্রাণিজ পদার্থের সংমিশ্রণে।
• চিকিৎসা পদ্ধতি: পঞ্চকর্ম, অয়েল থেরাপি, হজম ঠিক করা, শরীর ও মনের ভারসাম্য।

২. ইউনানি :

• পারস্য ও আরব দেশ থেকে আসা চিকিৎসা পদ্ধতি, যা মুসলিম শাসনকালে ভারতে জনপ্রিয় হয়।
• **ভিত্তি ছিল:** চারটি রস (blood, phlegm, yellow bile, black bile)।
• রোগ নির্ণয় হত নাড়ি পরীক্ষার মাধ্যমে।
• **ওষুধ:** হারবাল ও মিনারেল ভিত্তিক।
• **চিকিৎসা পদ্ধতি:** হিজামা (রক্তমোক্ষণ), হাম্মাম (গরম জল চিকিৎসা), ব্যায়াম, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ।

৩. সিদ্ধ চিকিৎসা :

• দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল, বিশেষত তামিল অঞ্চলে।
• দেহের পাঁচ মৌলিক উপাদান ও তিন দোষের ভিত্তিতে চিকিৎসা।
• বহু জটিল রোগের চিকিৎসা হত মিনারেল ও হারবাল মিশ্রণ দিয়ে।

৪. লোকজ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা:

• গ্রাম ও আদিবাসী সমাজে গাছগাছড়া, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে চিকিৎসা চলত।
• স্থানীয় বৈদ্যরা (Ojha, Kaviraj) ছিলেন জনসমাজে প্রধান ভরসা।

চিকিৎসার পদ্ধতি:

• **রোগ নির্ণয়:** নাড়ি স্পর্শ, চোখ-মুখ দেখে, মূত্র ও মল পর্যবেক্ষণ করে।
• **ওষুধ প্রস্তুতি:** নিজের হাতে গাছ - গাছড়া , শিকড় গুঁড়ো করে তৈরি করতেন বৈদ্যরা, অনেক সময় রান্নাঘর ছিল ওষুধ তৈরির জায়গা।
• **চিকিৎসা স্থান:** রোগী বাড়িতেই থাকতেন; হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের ব্যবস্থা ছিল না।
• **চিকিৎসার ধরন:**
o শরীর ও আত্মার শুদ্ধি
o খাদ্য নিয়ন্ত্রণ
o ধ্যান, যোগ, উপবাস
o তেল মালিশ, স্নান, বাসন-পানীয় নিয়ন্ত্রণ

কিছু উল্লেখযোগ্য চিকিৎসা গ্রন্থ (প্রাচীন ভারতীয়):

• চরক সংহিতা
• সুশ্রুত সংহিতা (অস্ত্রোপচারের জন্য বিখ্যাত)
• ভাবপ্রকাশ, অষ্টাঙ্গ হৃদয়ম

চিকিৎসা শিক্ষার পদ্ধতি:

• গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে শিক্ষা হত।
• শাস্ত্র মুখস্থ করে ও ব্যবহারিকভাবে শেখা হত।
• বৈদ্যরা সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন।
আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সূচনা ইউরোপ ও বিশ্বে কবে হয়েছিল এবং কীভাবে তা ১৮০০ সালের পর ভারতে এসেছিল –

ইউরোপ ও বিশ্বে আধুনিক চিকিৎসার সূচনা:

আধুনিক চিকিৎসা বলতে বিজ্ঞানসম্মত, পরীক্ষিত ও ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা চিকিৎসা বোঝায়। এর সূচনা মূলত সতেরোশো ও আঠেরোশো শতকে ইউরোপে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা:

• **১৬০০-১৭০০:** মানবদেহের গঠন ও রক্ত সঞ্চালন (হার্ভে) নিয়ে গবেষণা শুরু হয়।
• **১৭৯৬:** ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার প্রথম সফলভাবে গুটিবসন্তের টিকা তৈরি করেন।
• **১৮৪৭:** হাঙ্গেরির ইগনাজ সেমেলওয়েইস হাত ধোয়ার মাধ্যমে ইনফেকশন কমানোর কথা বলেন—এটাই পরে অ্যাসেপটিক টেকনিক এর ভিত্তি।
• **১৮৫০-১৮৭০:** ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ জীবাণুবিদ্যা (Microbiology) ও রোগের কারণ আবিষ্কারে বিপ্লব আনেন।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার স্তম্ভ:

• রোগের উৎস ও সংক্রমণ বোঝা (Germ theory)
• অস্ত্রোপচারে চেতনানাশক ও জীবাণুনাশক ব্যবহার
• আধুনিক হাসপাতাল ব্যবস্থা ও নার্সিং (ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল)
• ওষুধ প্রস্তুতির বৈজ্ঞানিক নিয়ম (Pharmacology)

ভারতে আধুনিক চিকিৎসার আগমন (১৮০০ সালের পরে):

ভারতে আধুনিক চিকিৎসা মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ইউরোপীয় চিকিৎসকদের মাধ্যমে আসে।

প্রধান ঘটনা:

• **১৮৩৫:** কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ — এটি এশিয়ার প্রথম আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ।
• **১৮৫০-এর দশক:** ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারি হাসপাতাল ও সেনা হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা বিস্তার করে।
• **১৮৬০-এর পর:** ইংরেজ ডাক্তার ও স্থানীয় ভারতীয়দের যৌথ প্রচেষ্টায় চিকিৎসা শিক্ষা ছড়াতে থাকে।
• **১৮৮১:** ভারতে প্রথম আধুনিক নার্সিং ট্রেনিং স্কুল চালু হয়।

ভারতীয় চিকিৎসকদের ভূমিকা:

• প্রথম দিককার শিক্ষিত ভারতীয় চিকিৎসকরা ব্রিটিশ শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হয়ে আধুনিক চিকিৎসা ছড়াতে থাকেন।
• পশ্চিমী ওষুধ ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক সময় দেশীয় চিকিৎসাও (আয়ুর্বেদ, ইউনানি) সমান্তরালভাবে চলতে থাকে।

ভারতে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সূচনা ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা মূলত তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার্থেই করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ব্রিটিশরা বারবার ভারতীয় আবহাওয়া, গ্রীষ্মমণ্ডলীও রোগ (যেমন—ম্যালেরিয়া, কলেরা, গুটিবসন্ত) এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁদের সৈন্য, প্রশাসনিক কর্মী ও পরিবারবর্গের সুস্থতা নিশ্চিত করাই ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—যা অনেকেই ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি বিপ্লব হিসেবে দেখেন। তবে বাস্তবিক অর্থে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত, ইংরেজ সেনাবাহিনীর জন্য স্থানীয় সহকারী চিকিৎসক তৈরি করতে, যারা কম বেতনে কাজ করবে এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সাহায্য করবে।

যে সকল হাসপাতাল বা স্যানিটেশন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, সেগুলোর অবস্থান ও সুবিধা সাধারণত ইউরোপীয় বসতি কেন্দ্রিক ছিল। গ্রামীণ ভারত, দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নয়নে তেমন কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

এছাড়া, ব্রিটিশদের চিকিৎসানীতি ছিল স্পষ্টভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসন চালানো, দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় হ্রাস করা এবং ইংরেজ কর্মীদের উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা—এই ধরনের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাবিত। ভারতীয়দের স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসার মৌলিক অধিকার তখন ব্রিটিশদের শাসননীতির অগ্রাধিকারের বাইরে ছিল।

তাই বলা যায়, ভারতে আধুনিক চিকিৎসার সূচনা ব্রিটিশরা করেছিল তাঁদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য, এটি ভারতীয়দের সার্বিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কোনো নীতিগত পরিকল্পনা ছিল না ।

ভারতে প্রথম নার্সিং ধারণা ও নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস :

● নার্সিং ধারণার সূচনা:
ভারতে আধুনিক নার্সিং-এর ধারণা আসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে, বিশেষত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর প্রভাব ও উদ্যোগে। ক্রিমিয়ান যুদ্ধ (১৮৫৩–১৮৫৬)-এ তাঁর অবদান গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নার্সিং পেশাকে মর্যাদা দেয়। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের সেনা হাসপাতালে নার্সিং সেবা উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

● প্রথম নার্সিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:
ভারতে নার্সিং প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়—
১৮৭১ সালে কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে (বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতাল)
• এখানে প্রথম নার্স ট্রেনিং স্কুল শুরু হয়।

• এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালিত হত মূলত, ইউরোপীয় মিশনারি ও ব্রিটিশ প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে।
• শুরুর দিকে নার্স হিসেবে শুধুমাত্র ইউরোপীয় বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।

● প্রশিক্ষণের ধরন:

• মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, হাসপাতাল পরিচর্যা, ইনজেকশন, ড্রেসিং, শিশু ও মাতৃসেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত।
• পাঠ্যক্রম ছিল ব্রিটিশ নার্সিং শিক্ষা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে।

● ভারতীয় মহিলাদের নার্সিংয়ে অংশগ্রহণ:

• প্রথম দিকে সমাজে নার্সিং পেশাকে ঘৃণার চোখে দেখা হত, কারণ এটি ছিল রোগী পরিষেবা ও ছুঁচে ঘেরা কাজ।
• কিন্তু ধীরে ধীরে কিছু সাহসী ভারতীয় মহিলা যেমন সারোজিনী নাইডু, ধন্বন্তরি রাও এই পেশাকে সম্মানজনক করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা করেন।

ভারতে নার্সিং পেশা এবং নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয় ১৮৭১ সালে কলকাতায়, মূলত ব্রিটিশ প্রশাসন ও মিশনারি উদ্যোগে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সেনা হাসপাতাল ও ব্রিটিশ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। পরবর্তীতে, এটি ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু তার অনেক আগেই হয়েছিল - হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা -

১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি কমিটি গঠন করে, যারা স্থানীয় চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী, ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম ডিসেকশন ও শিক্ষার অগ্রগতি

১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি, পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ও তাঁর ছাত্ররা প্রথমবারের মতো মানবদেহের ডিসেকশন করেন, যা তৎকালীন সমাজে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ ছিল।

পারিবারিক পটভূমি

মতিলাল শীল ১৭৯২ সালে কলকাতায় এক বাঙালি হিন্দু সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা চৈতন্যচরণ শীল ছিলেন চিনাবাজারের একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী, মতিলালের পাঁচ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রথমে তিনি নগরী দাসীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের এক কন্যা সন্তান জন্মায়। পরে স্ত্রীর অনুরোধে তিনি আনন্দময়ী দাসীকে বিবাহ করেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়ে হয়।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জমি দানের কারণ:

মতিলাল শীলের দানশীলতা ও সমাজসেবার মানসিকতা তাঁকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে জমি ও অর্থ দানে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ১৮৩১ সালে তাঁর কুলুটোলা এলাকার বাসভবনের বাগানের একটি অংশ, যার মূল্য ছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে প্রায় ১২,০০০ টাকা তা ব্রিটিশ প্রশাসনকে দান করেন। এই জমির ওপরেই মেডিক্যাল কলেজের প্রধান ভবন নির্মিত হয়।
পরে, ১৮৩৮ সালে, তিনি ১ লাখ টাকা দান করেন একটি মহিলা হাসপাতাল স্থাপনের জন্য, যা বিশেষ করে অবিবাহিতা মা ও বিধবাদের সেবা প্রদান করত।

দানের পেছনের উদ্দেশ্য

১. সমাজসেবা ও দানশীলতা: মতিলাল শীল বিশ্বাস করতেন, সম্পদ কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

২. নারী স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন: তিনি নারীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মহিলা হাসপাতাল স্থাপন করেন।

৩. আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার : তিনি ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন এবং আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার প্রসারে অবদান রাখতে চেয়েছিলেন।

এটি এশিয়ার প্রথম আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (১৯১৬) – কলকাতা

আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, যার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পেছনে রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১৮৮৬ সালে ডা: রাধাগোবিন্দ কর (Dr. Radha Gobinda Kar) এবং তাঁর সহকর্মীরা ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবমুক্ত একটি স্বতন্ত্র মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা

কলকাতা স্কুল অফ মেডিসিন (Calcutta School of Medicine) প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ নামে পরিচিতি পায়।

জমি ক্রয় ও হাসপাতালের নির্মাণ

প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজটি ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হত। তবে, ১৮৯৮ সালে বেলগাছিয়ায় প্রায় ১২ বিঘা (প্রায় ৪ একর) জমি ১২,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয় কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য। এই জমি ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহে ডা: কর নিজে উদ্যোগী হন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়ে অনুদান সংগ্রহ করেন।

১৯০২ সালে, তৎকালীন গভর্নর লর্ড উডবার্ন এই স্থানে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালের উদ্বোধন করেন, যা অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল নামে পরিচিতি পায়।

নামকরণ ও সরকারি অধিগ্রহণ

ডা: রাধাগোবিন্দ করের মৃত্যু হয় ১৯১৮ সালে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৪৮ সালের ১২ মে কলেজটির নাম পরিবর্তন করে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল রাখা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এসএসকেএম হাসপাতাল :

যার পূর্ণ নাম সেঠ সুখলাল কার্নানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল, কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। এর ইতিহাস ১৭০৭ সালে শুরু হয়, যখন ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল কলকাতার জারস্টিন প্লেসে প্রথম হাসপাতাল নির্মাণ করে। এই হাসপাতালটি মূলত, ইউরোপীয়দের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং 'প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল' নামে পরিচিত ছিল। ১৭৬৮ সালে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রেভারেন্ড জন জাকারিয়াস কিয়ারনান্ডার থেকে প্রায় ৯৮,৯০০ টাকা মূল্যে একটি বাগানবাড়ি

এবং তার সংলগ্ন জমি ক্রয় করে হাসপাতালটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করে।

১৯৫৪ সালে, স্বাধীন ভারতের বিশিষ্ট দানবীর সেঠ সুখলাল কার্নানির নামানুসারে হাসপাতালটির নাম পরিবর্তন করে সেঠ সুখলাল কার্নানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল রাখা হয়। এরপর, ১৯৫৭ সালে, এটি পূর্ব ভারতের প্রথম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট হিসেবে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (IPGMER) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত।

নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (NRS):

কলকাতার অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, যার ইতিহাস উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বিকাশ

• ১৮৬৪ সালে, কলকাতা পুরসভা শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটে একটি বাজার ও শস্যগুদাম নির্মাণ করে, যা পরবর্তীতে শিয়ালদহ মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল হিসেবে রূপান্তরিত হয়।

• ১৮৭৩ সালের ১ ডিসেম্বর, এই হাসপাতালের ভিত্তিতে শিয়ালদহ মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

• ১৮৮৪ সালে, এটি ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ১৮৯৪ সালে এটি ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে উন্নীত হয়।

• ১৯৫০ সালের ১০ আগস্ট, স্বাধীনতার পর, এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল হিসেবে, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী স্যার নীলরতন সরকার-এর সম্মানে।

জমি ও অবকাঠামো

এই হাসপাতালের মূল ভবনটি শিয়ালদহ মার্কেট বিল্ডিংয়ে অবস্থিত ছিল, যা ১৮৬৪ সালে নির্মিত হয়। এই ভবনটি পরবর্তীতে হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে, এই জমি বা ভবনটি কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দান করেছেন, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এটি ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছিল।

স্যার নীলরতন সরকার

স্যার নীলরতন সরকার (১৮৬১–১৯৪৩) ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীতে ভারতের চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান

• ১৯২১ সালে, ডা: উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এই হাসপাতালেই ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করেন, যা কালা-জ্বর রোগের চিকিৎসায় বিপ্লব ঘটায়।

বর্তমানে, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় এবং এটি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত। এটি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের ইতিহাস:

চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল কলকাতার একটি ঐতিহাসিক ও প্রখ্যাত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য ছিল মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পরে ক্যান্সার চিকিৎসায়ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই হাসপাতাল দু'টি প্রধান ইউনিটে বিভক্ত ছিল:

১) চিত্তরঞ্জন সেবা সদন

স্থাপনা:

• প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সালে

• **প্রতিষ্ঠাতা:** দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিধবা স্ত্রী বাসন্তী দেবী

• মূলত নারীদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল।

প্রাথমিক উদ্দেশ্য:

• ভারতীয় নারীদের চিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যা (Obstetrics), স্ত্রীরোগবিদ্যা (Gynecology), এবং শিশুদের চিকিৎসার জন্য এটি গড়ে তোলা হয়।

• ভারতীয় নারীদের চিকিৎসা পরিষেবায় ব্রিটিশ শাসনের সময় সীমিত সুযোগ থাকায়, স্বদেশি উদ্যোগে এই হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়।

দাতা ও সাহায্য:

• দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করা হয়।

• দেশি এবং বিদেশি দাতাদের অনুদানেও হাসপাতালটি গড়ে ওঠে।

২) চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট:

প্রতিষ্ঠা:

• ১৯৫০ সালে 'চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল' নামে এটি চালু হয়, পরে এটি চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত হয়।

উদ্দেশ্য:

• ভারতের অন্যতম প্রথম ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে এটি কাজ শুরু করে।

• এটি ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড অ্যাসোসিয়েশন (বর্তমানে ICMR) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

• এটি কেবল একটি হাসপাতাল নয়, বরং একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও।

• চিকিৎসার পাশাপাশি ক্যান্সার প্রতিরোধ, গবেষণা ও সচেতনতার জন্যও কাজ করে।

সংযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান:

• এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে মেডিক্যাল শিক্ষা ও নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানও যুক্ত রয়েছে।

• কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে একাডেমিক সম্পর্ক রয়েছে।

কলকাতার অজানা ইতিহাস

দেবজ্যোতি ঘোষ

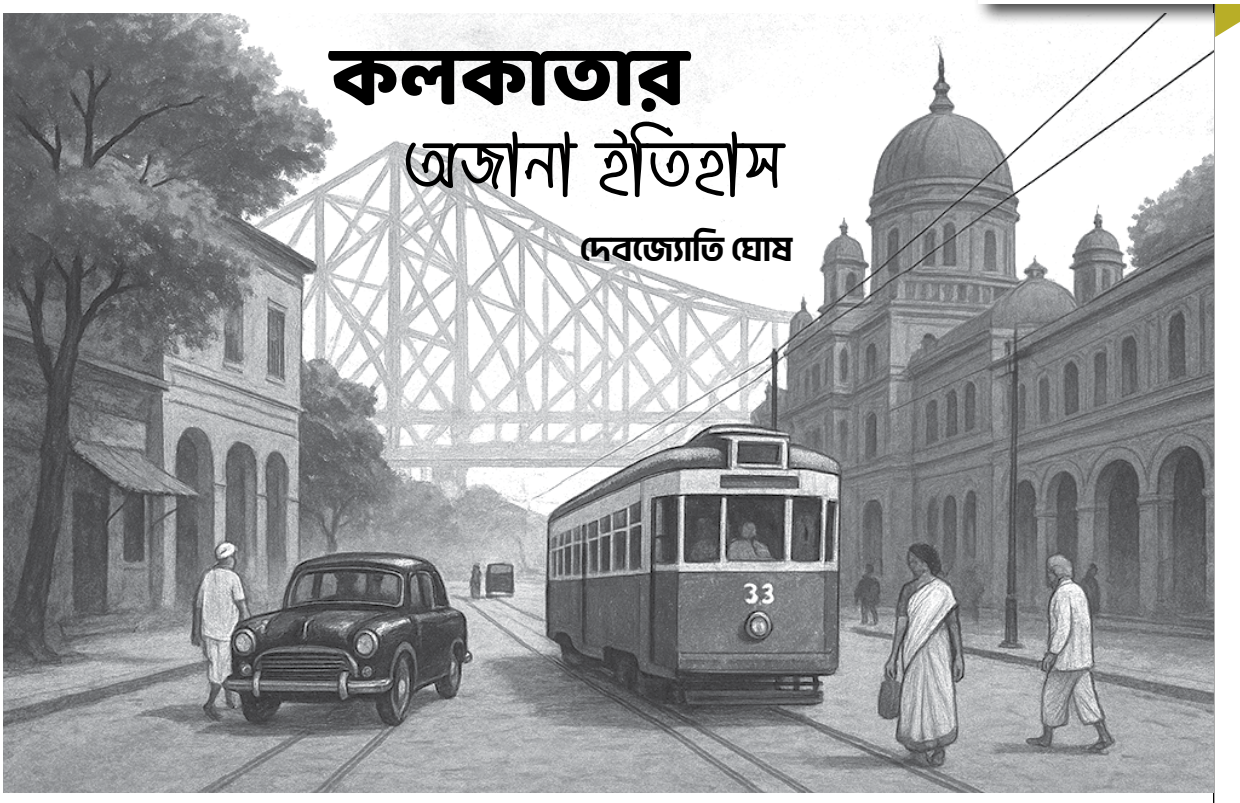

১. কলকাতা একসময় তিনটি গ্রাম ছিল

• কলকাতা গঠিত হয়েছিল তিনটি গ্রাম নিয়ে কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর।

• এই গ্রামগুলো ছিল হুগলি নদীর তীরে।

• ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই তিনটি গ্রামকে এক করে কলকাতা শহর গঠন করে।

২. মৌলিক 'হাসপাতাল' ছিল কলকাতায় — ১৭০৭ সালে!

• কলকাতার প্রাচীনতম হাসপাতাল ছিল কলকাতা জেনারেল হাসপাতাল (পরে নাম হয়েছিল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল)।

• এটি ১৭০৭ সালে স্থাপিত হয় মূলত ব্রিটিশ সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য।

৩. কলকাতা ছিল একসময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী

• ১৭৭২ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী।

• ১৯১১ সালে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়।

৪. রাইটার্স বিল্ডিং-এর গোপন ইতিহাস

• রাইটার্স বিল্ডিং প্রথমে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানিদের থাকার জায়গা (Writers of the Company)।

• এখানে ১৯৩০ সালে বিনয়-বাদল-দীনেশ এক ইংরেজ অফিসার সিম্পসনকে হত্যা করেন। এটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

৫. কলকাতায় প্রথম সিনেমা হল – 'এলফিনস্টোন'

• ১৯০৭ সালে কলকাতায় প্রথম সিনেমা হল তৈরি হয় – নাম ছিল এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস (বর্তমানে নব্য রূপে অপেরা হাউস)।

• এখানেই প্রথম মূকাভিনয় (silent) দেখানো হয়।

৬. এশিয়ার প্রথম মেট্রো রেল কলকাতায়

প্রথম পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯২০ - ৩০ সালে

• কলকাতা মেট্রো শুরু হয় ২৪ অক্টোবর ১৯৮৪ সালে।

• এটি ছিল এশিয়ার প্রথম পাতাল রেল পরিষেবা।

৭. শহীদ মিনার – এক সময়ের ব্রিটিশ স্মৃতিস্তম্ভ

• আগে এর নাম ছিল Ochterlony Monument, তৈরি হয় ১৮২৮ সালে।

• ১৯৬৯ সালে এর নাম হয় শহিদ মিনার, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মানে।

৮. প্রথম ছাপাখানা ও সংবাদপত্র কলকাতায়

• বাংলার প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর (Serampore) ১৮০০ সালে।

• প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ পায় ১৮১৮ সালে।

৯. গ্রেট বেঙ্গল সাইক্লোন ১৭৩৭ – ধ্বংসাত্মক ঝড়

• ১৭৩৭ সালের কলকাতার ভূমিকম্প ও সাইক্লোনে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

১০. টালা ট্যাঙ্ক – এক বিশাল জলাধার

• উত্তর কলকাতার টালা ট্যাঙ্ক ১৯০৯ সালে তৈরি হয়।

• এটি এশিয়ার বৃহত্তম ও প্রাচীনতম ওয়াটার রিজার্ভার, যা এখনো ব্যবহার হচ্ছে।

১১. ফোর্ট উইলিয়াম: যেখানে বন্দিরা নিখোঁজ হতেন!

১৭৫৬ সালে সিরাজ উদ দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করেন। তখন অনেক ইংরেজ অফিসারকে 'Black Hole of Calcutta' নামে এক ছোট কক্ষে আটকে রাখা হয় — যেখানে প্রায় ১২৩ জনের মধ্যে ১১৬ জন মারা যান।

এটি কলকাতার ইতিহাসের এক ভয়ানক অধ্যায়।

১২. এশিয়ার প্রথম চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেন!

• আলিপুর চিড়িয়াখানা (1876) – ভারতের প্রথম সংগঠিত চিড়িয়াখানা।

• আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বোটানিক্যাল গার্ডেন (1787) – এশিয়ার প্রথম বৃহৎ উদ্ভিদ উদ্যান।

এখানেই রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বটগাছ!

১৩. কলকাতায় প্রথম হাই হিল পরে হেঁটেছিলেন এক পুরুষ!

১৯ শতকের এক ব্রিটিশ সাহেব কলকাতায় প্রথম হাই হিল পরে পার্ক স্ট্রিটে হাঁটেন — কারণ সে সময় এটা ছিল 'রাজকীয় ফ্যাশন'! হাই হিলের ইতিহাসে দেখা যায় এটি পুরুষরাই আগে পরতেন

১৪. রাস্তার বাতি – প্রথম গ্যাস ল্যাম্প কলকাতাতেই!

• ১৮২০ সালে কলকাতায় প্রথম রাস্তায় গ্যাস ল্যাম্প বসানো হয়। রাতের কলকাতা তখন থেকে 'আলোয় ভাসা শহর' নামে পরিচিত হয়।

১৫. হাওড়া ব্রিজ তৈরি হয়েছিল একটিও নাট-বল্টু ছাড়া!

• হাওড়া ব্রিজ (১৯৪৩) — তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ রিভেটিং টেকনিকে, অর্থাৎ একটিও নাট বা স্ক্রু ব্যবহার হয়নি!

এটি তখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার ব্রিজ ছিল।

১৬ . 'কলকাতা – কফিনের শহর' বলত ব্রিটিশরা!

১৮ শতকে কলকাতায় জলবাহিত রোগ (কলেরা) ও মশাবাহিত রোগ (ম্যালেরিয়া) এত বেশি ছিল যে ব্রিটিশরা একে ডাকত – "The City of Palanquins and Coffins" (পালকি আর কফিনের শহর)!

১৭. কলকাতা ছিল প্রথম 'রোলিং লিফ টেলিফোন' শহর

• ১৮৮২ সালে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন চালু হয়।

তখন কলকাতার মধ্যে টেলিফোনে কথা বলা যেত শুধু ৩৬টি সাবস্ক্রাইবারের জন্য!

১৮. নতুন বছরের আগে 'আনুষ্ঠানিক টানা ঘণ্টা' বাজানো হত

• রাজকীয় ঘড়ি টাওয়ারে (Esplanade) ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টার সময় ঘণ্টা বাজিয়ে নতুন বছর ঘোষণা করা হতো।

অনেক সময় ব্রিটিশ শাসকরা আতসবাজিও পোড়াতেন

১৯ . সিঙ্গারা প্রথম এসেছিল কলকাতায় — মাংস দিয়ে

• কলকাতার প্রাচীন সিঙ্গারা ছিল মাংস ও মশলা ভরা।

মিষ্টি আলুর পুর ঢুকেছে অনেক পরে — ব্রিটিশ আমলের শেষদিকে।

২০. কলকাতা মিউজিয়াম ভারতীয় জাদুঘর (Indian Museum):

• ভারতের তথা এশিয়ার প্রাচীনতম ও বৃহত্তম জাদুঘর হল ভারতীয় জাদুঘর, যা কলকাতার চৌরঙ্গি রোডে অবস্থিত। একে 'জাদুঘরের জননী' (The Mother of Indian Museums) বলা হয়। প্রতিষ্ঠা সাল: ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ

কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের বিশেষত্ব মিশরের মমি

• প্রায় ৪,০০০ বছরের পুরোনো মিশরীয় মমি এখানে সংরক্ষিত।

• ভারতীয় দর্শনার্থীদের কাছে এটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সংগ্রহ।

• মমিটি মিশরের ফেরাউন যুগের, যা ১৮৮০ সালে মিশর থেকে আনা হয়েছিল।

অশোকস্তম্ভের সিংহচূড়া (Lion Capital of Ashoka)

• সম্রাট অশোকের স্তম্ভের প্রতিলিপি, যা আজকের ভারতের জাতীয় প্রতীক।

• এটি বৌদ্ধ শিল্প ও মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বৌদ্ধ স্তূপের অংশ (Stupa Relics)

• বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন স্তূপ ও ভাস্কর্যের অংশবিশেষ এখানে রাখা আছে।

• বিশেষ করে সাঁচি থেকে সংগৃহীত নিদর্শনগুলো।

গ্রীক ও রোমান শিল্পকর্ম

• ভারতীয় জাদুঘরে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মুদ্রা, ভাস্কর্য ও প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত রয়েছে।

• এগুলো ভারত ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নিদর্শন।

পুজোর অন্যতম চমক ডিজিটাল প্রিন্ট

এবার পুজোর অন্যতম চমক ডিজিটাল প্রিন্ট। এই শাড়ি এবার মেয়েদের পুজোর সঙ্গী। হাতে বোনা শাড়িতে ডিজিটাল প্রিন্ট করা হয়েছে। কোথাও রঙের বাহার, কোথাও আবার সাদা কালো ধূসর এর খেলা। এই কালেকশনে রয়েছে ফ্লোরাল প্রিন্ট থেকে বিমূর্ত মোটিভ। পুজোর সকাল বা রাত ঠিকমতো এই শাড়ির রং আর মোটিভ বেছে নিতে পারলে সবার নজর থাকবে আপনার ওপর। একটু স্টাইলিস্ট লুক দিতে চাইলে শাড়ির সঙ্গে বেছে নিতে পারেন নুডল স্ট্রাপড ব্লাউজ বা শার্ট। না হলে চিরন্তন ব্লাউজ তো আছেই। এ ধরনের শাড়ি পরে হেয়ারস্টাইল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন। কলকাতার এক ফ্যাশন ডিজাইনার সমিত জানান, "ডিজিটাল প্রিন্ট এখন গ্লোবালি ট্রেন্ড করছে। তাই কোনো ডিজাইনার যদি শাড়িতে এই ট্রেন্ড নিয়ে আসেন, তা হলে খুব ভালো বিষয়। ডিজিটাল প্রিন্ট শাড়ি নিয়েও এখন এক্সপেরিমেন্ট চলছে। তাই আমার মনে হয় এ ওবছর পুজোর বাজার কাঁপাবে ডিজিটাল প্রিন্ট। গত বছর থেকে এই ট্রেন্ড শুরু হয়েছে, এবার ব্যাপকভাবে বাজারে এসেছে।" ফ্যাশন ডিজাইনারদের মতে, এধরনের বেশিরভাগ শাড়িই হাতে বোনা। ফলে টিকে থাকার দিক থেকেও এই শাড়ি ভালো। এবার পুজোর ৪ দিন বেছে নিতে পারেন এই বিশেষ ধরনের শাড়ি। স্টাইলিস্ট ব্লাউজ আর এক্সপেরিমেন্টাল মেকআপ করলে এবার পুজোয় আপনি হয়ে উঠবেন অনন্যা।

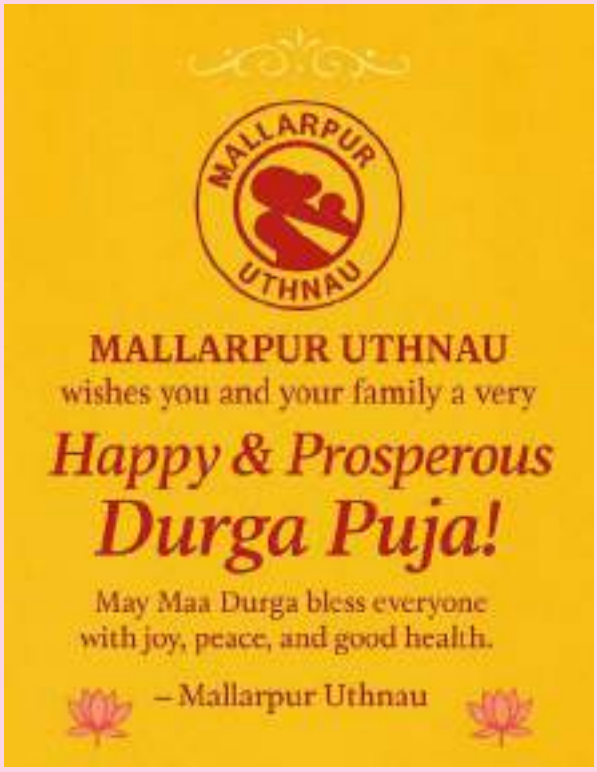

নিবন্ধ

মূল্যায়নে হিন্দু কলেজ

নীলাঞ্জন রায়

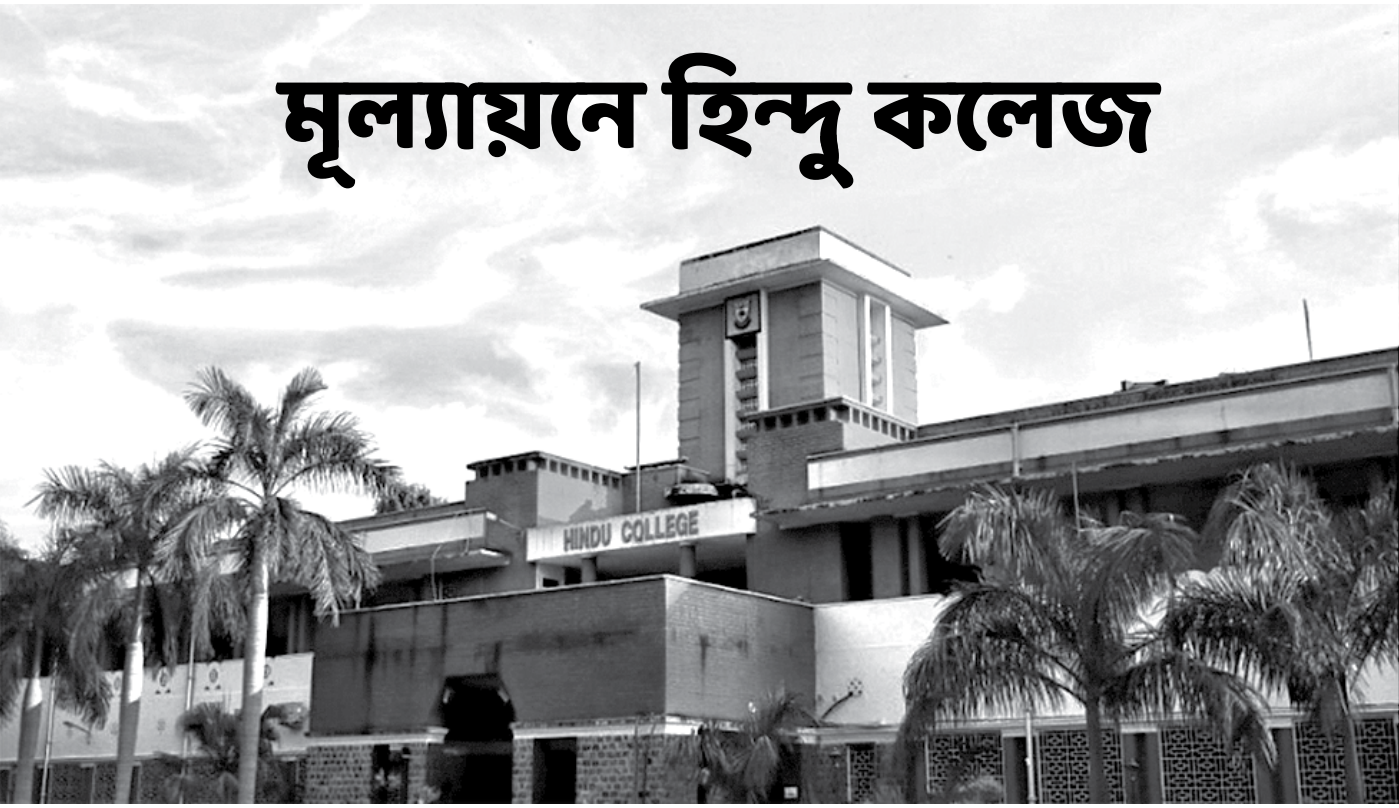

১৮০০ সাল থেকে হিন্দুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগী হন একদল উচ্চ ভাবাপন্ন লোক।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল প্রয়োজন ছিল – আধুনিক শিক্ষার প্রচার, সমাজ সংস্কার, ইংরেজি ভাষার শিক্ষা ও নবজাগরণের সূচনা। এই প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে বাংলার তথা ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারকদের জন্ম দিয়েছিল।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা (১৮১৭ সালে)

১. পশ্চিমা শিক্ষার প্রচলন:

তৎকালীন সময়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, গণিত, যুক্তিবিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা ভারতে ছিল অপ্রতুল। ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় তরুণ সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করানো ছিল জরুরি।

২. প্রাচীন শিক্ষার সীমাবদ্ধতা:

তৎকালীন সময়ে টোল ও পাঠশালায় প্রধানত সংস্কৃত ভাষা, ধর্মীয় পাঠ ও পুরাতন শাস্ত্র পড়ানো হত। এই শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী ছিল না।

৩. সামাজিক সংস্কার ও নবজাগরণ:

সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতপাতের বৈষম্য ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবোধের বিকাশের মাধ্যমে সমাজে একটি নবজাগরণ সৃষ্টি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

৪. ইংরেজ শাসকদের প্রশাসনিক উদ্দেশ্য:

ব্রিটিশরা ভারতে প্রশাসনিক কাজের জন্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারী চাইত। তাই, স্থানীয় জনগণকে আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যও হিন্দু কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

৫. ধনী হিন্দু সমাজের চাহিদা:

তৎকালীন কিছু উদারপন্থী হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী পরিবার আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং তাদের সন্তানদের ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ইচ্ছা থেকে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছিলেন।

৬. রামমোহন রায়ের প্রভাব:

সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় পশ্চিমা যুক্তিবাদী চিন্তার প্রতি উৎসাহী ছিলেন এবং শিক্ষা সংস্কারের পক্ষে ছিলেন। তাঁর মতাদর্শ অনেক শিক্ষিত হিন্দুকে প্রভাবিত করেছিল।

২০০ বছর আগে কলকাতার হিন্দু কলেজ

প্রেসিডেন্সি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় – কলকাতা

আগের নাম: হিন্দু কলেজ (প্রতিষ্ঠার তারিখ: ২০ জানুয়ারি, ১৮১৭)

● প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮৫৫) ● প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় (২০১০)

প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর (১৮৫৫)

● ১৮৫৫ সালে, হিন্দু কলেজ সরকারি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং নাম পরিবর্তন হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়।

● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭)-এর অধিভুক্ত হয়।

● এটি হয়ে ওঠে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশেষত বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, অর্থনীতি ও ইংরেজি সাহিত্যে।

● দীর্ঘদিন ধরে এটি ছিল শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত (২০১০)

● **৭ জুলাই, ২০১০:** পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে।

● প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুসারে এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

● কলেজের ঐতিহ্য ও গৌরব বজায় রেখে নতুনভাবে গবেষণা ও শিক্ষায় উন্নয়নের পথে এগোয়।

বিখ্যাত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী

● স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু, অমর্ত্য সেন, সত্যজিৎ রায়, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মেঘনাদ সাহা।

● বিশ্বের দরবারে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে এই সমস্ত মনীষীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। একে একসময় বলা হত 'পূর্বের অক্সফোর্ড'।

অ্যাকাডেমিক সুনাম

● প্রেসিডেন্সি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

● বর্তমানে এটি গবেষণাভিত্তিক শিক্ষায় এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রেখেছে।

রাজা রামমোহন রায়

২০২৬ সালে ১৫০ বছর পূর্ণ হবে
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স

সিএমএ, মিঠু বসাক (কুণ্ডু)

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স ২০২৬ সালের ২৯ জুলাই ১৫০ বছরে পা দেবে। এই মাইলফলক ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অর্জন। ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স বৈজ্ঞানিক প্রতিভা লালন এবং বিভিন্ন শাখায় যুগান্তকারী গবেষণায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর নম্র সূচনা থেকেই, এটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে অসংখ্য সাফল্য, ব্যর্থতা, পরিবর্তন এবং অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রবন্ধে এর দীর্ঘ ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরার পাশাপাশি তার অবদানকে উল্লেখ করবো এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স কলকাতার এক প্রখ্যাত বিজ্ঞান গবেষণা এবং উচ্চ শিক্ষার জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৮৭৬ সালে ড. মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় সহায়তা করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পদার্থবিজ্ঞানে ভারতের প্রথম নোবেল বিজয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর নোবেল বিজয়ী গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন, যা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স -এর বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

তিনি ১৯০৭ সালে কলকাতায় ভারতীয় অর্থ পরিষেবা (বর্তমানে ভারতীয় অডিট ও হিসাব পরিষেবা) চাকরিতে যোগদানের পরও সীমিত গবেষণার সুযোগের কারণে, সি ভি রমন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে গবেষণা চালিয়ে যান। তিনি আলোক বিচ্ছুরণ ও বাদ্যযন্ত্রের পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি ও কে এস কৃষ্ণান রমন প্রভাব আবিষ্কার করেন, যা বর্ণালী বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান। বিজ্ঞানে প্রথম ভারতীয় নোবেল বিজয়ী হিসেবে রমন কলকাতায় ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স সার্ভিসের (বর্তমানে ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস) অংশ হিসেবে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কারণ ব্রিটিশ ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ সীমিত ছিল। সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) তে গবেষণা চালিয়ে যান,

যেখানে তিনি আলোক বিবর্তন এবং বাদ্যযন্ত্রের পদার্থবিদ্যার ওপর মনোনিবেশ করেন। তাঁর গবেষণা মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ১৯১৭ সালে তিনি ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স সার্ভিসের পদ ত্যাগ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হন। এভাবেই তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। ১৯২৬ সালে তিনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা করেন , যা ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার উন্নয়নে অবদান রাখে।

১৯২২ সালে রমন 'আণবিক বিবর্তন' প্রকাশ করেন, যা বিক্ষিপ্ত আলোর আচরণ অন্বেষণকারী অনেক গবেষণার মধ্যে প্রথম। আইএসিএস-এ তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে পরিচালিত এই কাজটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন করে। ১৯২৮ সালে রমন এবং তাঁর ছাত্র কেএস কৃষ্ণান পর্যবেক্ষণ করেন যে যখন একরঙা আলো (একক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো) একটি স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে যায়, তখন বিক্ষিপ্ত আলোর একটি ছোট অংশ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন ঘটে কারণ আলো পদার্থের অণুগুলির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে, যার ফলে তারা শক্তি শোষণ বা স্থানান্তর করে। এই ঘটনাটি, যা পরে 'রমন প্রভাব' নামে পরিচিত, বর্ণালী এবং আণবিক বিশ্লেষণের একটি মৌলিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তার আবিষ্কারগুলি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্সে 'এ নিউ রেডিয়েশন' (১৯২৮) শীর্ষক একটি গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। বিজ্ঞানে প্রথম ভারতীয় নোবেল বিজয়ী হন।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS)-এর মূল উদ্দেশ্য হল, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং মৌলিক গবেষণার উন্নয়নে সহায়তা করা। গবেষকদের জন্য একটি উদ্ভাবনী এবং সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স(IACS)-এ বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে যা বিভিন্ন শাখায় গবেষণার জন্য নিবেদিত। এই কেন্দ্রে গবেষকরা আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

বর্তমানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) এর সভাপতি এবং পরিচালক তাঁদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রারম্ভিক বছরগুলোতে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (IACS) তার অধ্যবসায় এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে।

তার ১৫০ বছরের গৌরবময় যাত্রায় বিজ্ঞানের জগতে এক অসাধারণ অবদান রেখেছে। এটি শুধুমাত্র একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয় বরং সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, বাজারে অগ্রগতি আর সমাজের ওপর ইতিবাচক প্রভাব – ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স(IACS)এর সাফল্যের কাঠামো এই তিনটি মূলস্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত। এর সফলতার পেছনে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোজনের ক্ষমতা কাজ করেছে। বিশ্বের পরিবর্তনশীল পরিবেশে এটি নতুন প্রযুক্তি নিয়ে নিজেকে আপডেট রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই লম্বা সময় ধরে অভিযোজন ক্ষমতাই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সকে (IACS) দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য অর্জনে সাহায্য করেছে।

আগামী দিনগুলিতে এই প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর লক্ষ্য হল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিরক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।নতুন উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা বজায় রাখবে। তাদের গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে এগিয়ে যাবে। ১৫০ বছরের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স আজ আমাদের গর্বের প্রতীক। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে অসংখ্য মানুষের অবদান অমূল্য। আগামী দিনেও এই প্রতিষ্ঠান তাদের সফলতা বজায় রাখবে সেই আশাই করি।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও অবদান

স্যার সি. ভি. রমন ১৯২৮ সালে এখানেই তাঁর বিখ্যাত 'রমন প্রভাব' (Raman Effect) আবিষ্কার করেন। এই গবেষণার জন্য তিনি ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান — এটি ভারতের মাটিতে করা একমাত্র গবেষণা যার জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া গেছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী

কেএস কৃষ্ণন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু , মেঘনাদ সাহা।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় – যদিও সরাসরি IACS-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবে সেই সময়ের পরিবেশে তাঁর প্রভাব ছিল অসাধারণ।

বর্তমান অবস্থান ও গুরুত্ব

বর্তমানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের (DST) অধীনস্থ।

সারসংক্ষেপ

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স (১৮৭৬) হল ভারতের প্রথম ও প্রাচীনতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের জাতীয় চেতনার প্রতীক। এটি ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।

হারিয়ে যাওয়ার পথে টানা রিকশা

মধুমিতা দাস

দেশের শহুরে যাতায়াত ব্যবস্থায় টানা রিকশা একসময় এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বিশেষত কলকাতার মতো শহরে এই বাহন যেন একটি সমাজচিত্র, একটি অর্থনৈতিক শ্রেণির প্রতিচ্ছবি। মানুষের হাতে টানা এই বাহন যেমন একদিক থেকে দরিদ্র মানুষের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল, তেমনি এটি প্রশ্ন তোলে মানব মর্যাদা, শোষণ এবং আধুনিকতা বনাম ঐতিহ্য নিয়ে।

টানা রিকশার উৎপত্তি

টানা রিকশার ধারণাটি মূলত আসে জাপান ও চিন থেকে। ১৮৬৯ সালে জাপানে প্রথম রিকশা তৈরি হয়, যার নাম ছিল 'রিকিশা' অর্থাৎ 'মানুষ চালিত গাড়ি'। পরে এই বাহন চিন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতে এটি প্রথম চালু হয় কলকাতা শহরে ১৮৮০-৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ নাগরিক এবং ধনী ভারতীয়রা এটি ব্যবহার করতেন শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াতের জন্য। টানা রিকশার আগমন ছিল একদিকে নগর পরিবহণের আধুনিকতা, আবার অন্যদিকে এটি দরিদ্র মেহনতিদের ওপর নির্ভরশীল এক শ্রেণি সমাজের প্রতিফলন।

ঔপনিবেশিক সমাজে রিকশার ভূমিকা

ব্রিটিশ শাসনকালে টানা রিকশা ছিল সামাজিকভাবে শ্রেণি বৈষম্যের প্রতীক।

- ধনী বা ইংরেজ সাহেবরা এই রিকশায় চড়তেন আর দরিদ্র শ্রমিকরা তা টানতেন।
- এই সময় রিকশাকে 'coolie carriage' বা 'কুলি গাড়ি' বলেও অভিহিত করা হত।
- এটি ছিল উপনিবেশিক শহরের একটি চিত্র – শোষণ এবং সুবিধার

এক অনন্য রূপ।

কোন পরিস্থিতিতে চালু হয়েছিল

১. সমাজে দ্রুত পরিবহণ প্রয়োজন: মেইজি পুনর্গঠনের সময় জাপানের শহরগুলোয় দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল।

২. অল্প খরচে সহজ যাত্রীবাহী বাহন: ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল খরচসাপেক্ষ। টানা রিকশা ছিল সস্তা, সহজ ও শহরের সরু গলিতে চলার উপযোগী।

৩. কর্মসংস্থানের সুযোগ: গরিব মানুষ বা গ্রাম থেকে আসা শ্রমজীবীদের জন্য এটি কর্মসংস্থানের এক নতুন উপায় হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে রিকশা

ভারতের স্বাধীনতার পর অনেক শহরে রিকশা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। তবুও কলকাতা শহর এই রিকশার ঐতিহ্যকে ধরে রাখে। এটি তখন শহরের সংকীর্ণ রাস্তা, জল জমা এলাকা, এবং অল্প দূরত্বের যাতায়াতে কার্যকর বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রিকশা চালানো হয়ে ওঠে অনেক দরিদ্র মানুষের একমাত্র জীবিকা। গ্রাম থেকে আসা মানুষরা কলকাতার রাস্তায় রিকশা চালিয়ে রোজগার করতে শুরু করে।

নৈতিক বিতর্ক ও নিষেধাজ্ঞা

• যদিও টানা রিকশা বহু মানুষকে জীবিকা দিয়েছে, তবুও এর অস্তিত্ব নিয়ে বহু বিতর্ক ছিল।

• মানবাধিকার সংগঠন ও আধুনিক সমাজ এটিকে 'অমানবিক', 'মানব মর্যাদার পরিপন্থী' বলে সমালোচনা করে।

• ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা থেকে টানা রিকশা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেয়।

• তবে অনেক সংগঠন, রিকশাচালকরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

• হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সেই নিষেধাজ্ঞা ঠেকানো হয়। আদালত রায় দেয় যে, বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা না করে কোনো শ্রমজীবী শ্রেণির পেশা বন্ধ করা উচিত নয়।

বর্তমানে টানা রিকশার অবস্থা

• বর্তমানে টানা রিকশার ব্যবহার অনেক কমে গেছে।

• এর পরিবর্তে অটোরিকশা, ব্যাটারি চালিত রিকশা এবং অন্যান্য আধুনিক বাহন এসেছে।

• তবে কলকাতার উত্তরাঞ্চল, শোভাবাজার, চেতলা, কলেজ স্ট্রিট, বালিগঞ্জ ও পুরনো শহরাঞ্চলে এখনও কিছু টানা রিকশা দেখা যায়।

• এগুলো আজকাল মূলত পর্যটকদের আকর্ষণ আর ঐতিহ্য।

রিকশা ও সংস্কৃতি

• সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা হোক বা বাঙালি সাহিত্য, টানা রিকশা বারবার প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

• এটি একদিকে শ্রমিকের সংগ্রাম অন্যদিকে, এক শহরের আত্মপরিচয়ের প্রতীক। কবি-সাহিত্যিকরা এই রিকশায় দেখেছেন জীবনযুদ্ধের এক প্রতিচ্ছবি। ভারতে টানা রিকশার ইতিহাস শুধুই একটি পরিবহণের ইতিহাস নয়, এটি এক সামাজিক বাস্তবতা, অর্থনৈতিক শ্রেণিচিত্র এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন।

• এটি যেমন দরিদ্র মানুষের জীবন চালানোর উপায় ছিল, তেমনি শহুরে নাগরিক জীবনের এক অদ্ভুত বৈষম্যপূর্ণ চিত্র।

• আজকের দিনে যখন আমরা আরও মানবিক সমাজের দিকে এগোতে চাই, তখন দরকার ঐতিহ্য রক্ষার পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদার নিশ্চয়তা।

• এই হাতে টানা রিকশা হয়তো একদিন থাকবে না, কিন্তু তার গল্প থাকবে চিরকাল – এক নগরজীবনের নীরব নায়ক হয়ে।

টানা রিকশা - সাহিত্যে ও সিনেমায়

• মনোজ মিত্রের নাটক 'কল্পনিকা'

• শঙ্খ ঘোষের কবিতা ' রিকশাওয়ালার প্রতি'

• বিনয় মজুমদারের কবিতা

সিনেমায়:

• দো বিঘা জমিন (বিমল রায়)

• রিকশাওয়ালা(ছোট ফিচার ফিল্ম)

• পরেশনাথ (টেলিফিল্ম)।

দো বিঘা জমিন

ভারতে ট্রামের ইতিহাস ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

ট্রামের ইতিহাস

ভারতে ট্রামের সূচনা হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে। ট্রামের যাত্রা শুরু হয়েছিল কলকাতা শহরে।

প্রারম্ভিক ধাপ

• **১৮৭৩ সালে,** কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়েছিল। এই ট্রাম চালু হয়েছিল শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। তবে এটি ছিল পরীক্ষামূলক। দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

• **১৮৭৪-১৯০০:** এই সময়ের মধ্যে ঘোড়ায় টানা ট্রাম নিয়মিত চলাচল শুরু করে।

• **১৯০২ সালে,** কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু হয়। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, কারণ এটি ছিল ভারতের প্রথম বিদ্যুৎচালিত গণপরিবহণ ব্যবস্থা।

অন্যান্য শহরেও ট্রাম

• মুম্বাই ও চেন্নাই-এও এক সময় ট্রাম চলেছে, তবে সেগুলি অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।

ট্রামের দার্শনিক মূল্যায়ণ

ট্রাম শুধু একটি যাতায়াত ব্যবস্থা নয়, বরং একটি সময়ের প্রতিচ্ছবি, একটি দার্শনিক ভাবনা যা নগর সভ্যতা, পরিবেশ এবং সামাজিক সাম্যতার প্রতীক।

পরিবেশবান্ধব চিন্তা

• ট্রাম পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক, কারণ এটি বিদ্যুৎচালিত, শব্দ ও বায়ু দূষণ কম করে।

• এটি একটি স্থায়ী ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা, যা আধুনিক নগরায়ণের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

সামাজিক সাম্য ও গণতন্ত্র

• এটি সমানাধিকারের বার্তা বহন করে, যা শহুরে জীবনে বিরল।

স্মৃতির আধার

• ট্রাম হল এক নস্টালজিয়া ও ঐতিহ্যের এক জীবন্ত নিদর্শন।

• এটি শহরের ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল বজায় রাখতে সাহায্য করে—একটি জীবন্ত 'ওপেন মিউজিয়াম' হিসেবে কাজ করে। কলকাতার ট্রাম ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৮৭৩ সালে, কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়েছিল।

কর্পোরেট চোখে পুজো

দুর্গাপুজো নিছক ধর্মীয় উৎসব নয়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

রানু কর, ফিনান্স ম্যানেজার, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড

দুর্গাপুজো শুধু এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি এক বিশাল সামাজিক, আর্থিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব হওয়ার পাশাপাশি এটি অর্থনীতির ওপর এক শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।

অর্থনৈতিক প্রভাব

• **আর্থিক কর্মকাণ্ড:** ২০২৩ সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রায় ৭৫,০০০ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন হয়। কলকাতায় এককভাবে এই পরিমাণ ৩৫,০০০ কোটির বেশি।

• **চাকরির সুযোগ:** দুর্গাপুজোর মরসুমে প্রায় ৩ লাখ অস্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় – প্যান্ডেল নির্মাণ, লাইটিং, ফুল বিক্রি, সাউন্ড, ক্যাটারিং, নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে এই কর্মসংস্থান হয়।

• **ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ :** শাড়ি, পোশাক, গয়না, সাজসজ্জা সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য সব মিলিয়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে লেনদেন হয় দুর্গাপুজোয়। হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্পে প্রবল চাহিদা থাকে।

• **পর্যটন ও হোটেল শিল্প :** পুজোর সময় পশ্চিমবঙ্গে পর্যটকের সংখ্যা লক্ষাধিক ছাড়িয়ে যায়। হোটেল বুকিং, গাড়ি ভাড়া, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ৩০-৪০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কলকাতায় অকুপেন্সি রেট ৯৫% ছুঁয়েছে।

• **আর্থিক সম্পর্ক :**

১. ব্যাঙ্কিং ও ডিজিটাল লেনদেন: Paytm, PhonePe, Google Pay-এর মাধ্যমে ছোট বড় সব ব্যবসায় ডিজিটাল লেনদেন বেড়ে যায়। একমাত্র কলকাতায় পুজোর সময় UPI ট্রানজ্যাকশন ১৫-২০% বাড়ে।

• **ঋণ ও মাইক্রো-ফিন্যান্স:** পুজোকে ঘিরে অনেকেই স্মল বিজনেস লোন বা মাইক্রো-ফিন্যান্স লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে বা স্টক বাড়ায়। এনবিএফসি ও মাইক্রো-ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর

পুজো-পূর্ব ঋণ প্রদানে বিশাল বৃদ্ধির হার দেখা যায়।

• **বিনিয়োগ প্রবণতা:** পুজোর সময় ব্যবসায়ীরা নতুন শোরুম, ফ্র্যাঞ্চাইজি অথবা পপআপ স্টল খোলে। এটি বিনিয়োগ চক্রকে পুনরুজ্জীবিত করে।

২.সামাজিক প্রভাব :

• **সম্প্রীতির বার্তা:** দুর্গাপুজো হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও সব ধর্মের মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে – এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বার্তা দেয়।

• **মহিলাদের অংশগ্রহণ:** নারী উদ্যোক্তা ও সেল্ফ হেল্প গ্রুপগুলির (বিশেষ ভূমিকা থাকে—পেঁড়া, সন্দেশ, কাসার বাসন, শাড়ি বিক্রি ইত্যাদিতে।

৩. সামাজিক সংগঠন ও সিএসআর: বহু কর্পোরেট ও স্থানীয় ক্লাব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, পোশাক বিতরণ ইত্যাদি করে থাকে। সিএসআর খাতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়।

দুর্গাপুজো শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভারতীয় তথা বাংলা সংস্কৃতির এক অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি। আর্থিক লেনদেন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উন্নয়নের এক বিশাল প্ল্যাটফর্ম।

দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের এক বড় অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি

অরিন্দম দাস, কমার্শিয়াল ফিনান্স হেড,
ইউনাইটেড ব্রিউয়ারিজ লিমিটেড

এই উৎসব অনেক খাতকে ছুঁয়ে যায়। খুচরো বাজার ও খাবারদাবারের খরচ সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়। প্যান্ডেল তৈরি, সাজসজ্জা আর আলোকসজ্জা অনেক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করে, আবার বিজ্ঞাপন আর স্পনসরশিপও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মূর্তি তৈরি, যা কুমারটুলির ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেটাও অনেক মানুষের জীবিকার সংস্থান করে।

এই উৎসব ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করে—হিসেব মতে

দুর্গাপুজো শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে এটি এক উজ্জ্বল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। ভক্তি আর সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হলেও, এই উৎসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার আনে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করে।

দুর্গাপুজো থেকে প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২–৩ লাখ অস্থায়ী চাকরি তৈরি হয়। গত কয়েক বছরে এই আর্থিক প্রভাব অনেক বেড়েছে। পর্যটন আর পরিবহণ খাতও এর থেকে প্রচুর লাভবান হয়—বাস, ট্রেন, মেট্রো আর বিমান ভ্রমণে ভিড় বেড়ে যায় এবং আয়ও অনেক গুণ বাড়ে।

স্থানীয় ব্যবসাগুলো—শপিং মল থেকে শুরু করে রাস্তার দোকানদাররা পর্যন্ত—অতিরিক্ত সময় খোলা রাখে এবং উৎসবের সময়ে বাড়তি বিক্রি করে। খুচরা বিক্রেতা আর হোটেল মালিকরা এই সময়ে অনেক বেশি আয় করে।

এর পাশাপাশি, দুর্গাপুজোর আন্তর্জাতিক উপস্থিতিও ক্রমে বাড়ছে। বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙালিদের পুজোয় গিয়ে কাজ করে অনেকে অর্থ উপার্জন করছেন। উদাহরণস্বরূপ, শুধু আমস্টারডাম শহরেই ১২টি দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়।

দুর্গাপুজো শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে এটি এক উজ্জ্বল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে। ভক্তি আর সংস্কৃতির শিকড়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হলেও, এই উৎসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার আনে এবং কর্মসংস্থান তৈরি করে। অনেক মানুষের জীবিকা এই উৎসবের ওপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ বাংলার শিল্পীরা—যেমন মূর্তিশিল্পী আর প্যান্ডেল সাজানো শিল্পীরা—এই সময়ের আয় দিয়েই সারা বছর চলে, যা পুরো সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখে।

এই উৎসবের অর্থনৈতিক প্রভাব খুচরা বাজার, খাবার-দাবার, মূর্তি তৈরি, আলো সাজানো, প্যান্ডেল সজ্জা, পর্যটন, বিজ্ঞাপন আর হোটেল-রেস্তরাঁর মতো বহু শিল্পে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি সহযোগিতাও এই শক্তিকে আরও বাড়ায়—পুজো কমিটিগুলোকে অনুদান দেওয়া হয়, আর UNESCO-র ঐতিহ্য তকমা এর মর্যাদা ও পর্যটন দুটোই বাড়িয়ে দিয়েছে।

সংক্ষেপে বললে, দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়—এটি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখা আর সংস্কৃতিভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির এক বিশাল শক্তি, যা সমাজ ও অর্থনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চাকরির পরিস্থিতি বেশ গতিশীল। স্বাস্থ্যসেবা, আইটি এবং প্রযুক্তি খাতে বড় ধরনের অগ্রগতি হচ্ছে।

আগামী দিনে অবকাঠামো ও শিল্পের উন্নয়ন প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আদানি গ্রুপের চলমান পরিকল্পনা—যার মধ্যে তাজপুর বন্দর নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ও লজিস্টিক হাব অন্তর্ভুক্ত—প্রায় ২৫,০০০ নতুন চাকরি তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়া, পুরুলিয়ায় গড়ে উঠতে চলা উচ্চাকাঙ্ক্ষী 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী' শিল্প শহর থেকে প্রায় ১,৫০,০০০ কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ইস্পাত শিল্প, উৎপাদনশীল খাত এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ (MSME) ক্ষেত্রে এই চাকরিগুলো তৈরি হবে।

যদিও পশ্চিমবঙ্গ বড় বড় বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে এবং উচ্চাভিলাষী অবকাঠামো প্রকল্প চালু করেছে, তবুও সামগ্রিক ব্যবসার পরিবেশে চাপের ইঙ্গিত মিলছে। উদ্বেগজনক বিষয় হলো—অন্য রাজ্যগুলো অনানুষ্ঠানিক খাতে অনেক চাকরি বাড়াতে পারলেও পশ্চিমবঙ্গে উল্টোভাবে এই খাতে চাকরি কমছে।

স্পষ্টতই পশ্চিমবঙ্গ কিছু কাঠামোগত সমস্যার মুখোমুখি—বিশেষ করে ব্যবসা ধরে রাখা এবং আনুষ্ঠানিক খাতে নতুন চাকরি তৈরির ক্ষেত্রে।

আমি বলব, আপনাকে সক্রিয় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ হতে হবে।

কাজের প্রতি দৃঢ় মনোভাব গড়ে তুলতে হবে—নিয়মিত উপস্থিত থাকা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা আর এমন একজন হওয়া যার ওপর অন্যরা নির্ভর করতে পারে। এতে বিশ্বাস তৈরি হয়, সুনাম বাড়ে, আর নতুন সুযোগের দরজা খোলে।

শিখতে থাকুন আর নতুন দক্ষতা অর্জন করুন, যা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে।

নিজের ক্যারিয়ারের দায়িত্ব নিন—নিজের ভূমিকার বাইরে গিয়ে কাজ করার চেষ্টা করুন, এমন মেন্টর খুঁজতে হবে যারা আপনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শেষে মনে রাখতে হবে, আত্মবিশ্বাস সুযোগকে আরও বড় করে তোলে।

আমি বলব, আপনাকে সক্রিয় এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ হতে হবে—আপনি নিজের পথের স্থপতি। নিজের শক্তি, নিজের 'কেন ' আর নিজের স্বপ্ন নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে, তারপর ছোট ও বড় দুই ধরনের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে, যা আপনার যাত্রার দিকনির্দেশ দেবে।

শেষে মনে রাখা দরকার, আত্মবিশ্বাস সুযোগকে আরও বড় করে তোলে। এমন দায়িত্ব নিতে হবে যা আপনাকে চ্যালেঞ্জ দেবে।

কলকাতার দুর্গাপুজোর হেরিটেজ তকমার সেলিব্রেশন দিল্লিতে, শংসাপত্র দিল UNESCO

পিছিয়ে পড়াদের পাশে দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন

শঙ্কর মণ্ডল

উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ তথা সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন।

এই সংস্থার সম্পাদক তথা প্রাণপুরুষ শঙ্কর মণ্ডল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভূমিপুত্র। একেবারে ছোটবেলা থেকে তিনি সমাজসেবায় ব্রতী। একসময় শিক্ষকতা করেন, পরে নানা সংস্থায় সমাজকর্মী হিসাবে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ২০০৮ সালে নিজের মতো করে কাজ করার জন্য গড়ে তোলেন দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন। একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে সংস্থার পথচলা শুরু হয়। তারমধ্যে ছিল, এলাকার মেয়েদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন, রেন ওয়াটার হারভেস্টিং, বৃক্ষরোপণ, অর্গানিক ফার্মিং প্রভৃতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, পুরুলিয়া, আলিপুরদুয়ার ও ঝাড়খণ্ড - এই ৫ জায়গার আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়াদের নানা ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ছিল টেলারিং, মোবাইল রিপেয়ারিং, কম্পিউটার, জাঙ্ক জুয়েলারি ও প্রাণীসম্পদ। ৩ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল প্রায় ১৫,০০০ লোক। তারমধ্যে ৫০ শতাংশ মানুষ স্বনির্ভর হয়েছেন। সংস্থার উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রায় ৪০০ স্কুলে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়। এছাড়াও ৫০০ স্কুলে স্যানিটারি ন্যাপকিনও দেওয়া হয়। ওই জেলার বিভিন্ন গ্রামের ১,০০০ পুকুর খনন করা হয়। এছাড়াও সংস্থার উদ্যোগে বছরভর নানা ধরনের সামাজিক কাজ ও সচেতনতামূলক শিবির হয়।

দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশনের সম্পাদক শঙ্কর মণ্ডল জানান, 'আগামী দিনের আমাদের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হেলথ অ্যান্ড সায়েন্স রিসার্চ প্রোগ্রাম। ২০২৬ সালের মধ্যে গড়ে তোলা হচ্ছে প্যারামেডিক্যাল কলেজ। পড়ানো হবে প্যারামেডিক্যাল কোর্স, ফার্মাসি, নার্সিং কোর্স ও মেডিক্যাল কোর্স। আগামী দিনে আমাদের লক্ষ্য হাসপাতাল তৈরি, স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়া। সমাজসেবার পাশাপাশি সুন্দরবনের লোকেদের কথা জানাতে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে হয়েছে রেডিও সুন্দরবন ৯১.২ এফএম।

চেনা মানুষের অচেনা কথা

জীবনের নানা সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি অনেক বিশিষ্ট মানুষ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসেছি বা একই মঞ্চে ছিলাম। সে সবই এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। সেই রকম কিছু ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আজ কথা বলব।

মানস কুমার ঠাকুর

নবীন পট্টনায়ক

প্রথমেই আজ মনে পড়ছে এমন এক ব্যক্তিত্বের কথা যিনি খুব ধীর, স্থির এবং রাজ্যের উন্নতি ছাড়া কখনো অন্য কথা বলেননি। আমি

যার কথা বলছি উনি নবীন পট্টনায়ক। তখন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। আমি তিনবার ওঁর মুখোমুখি হই এবং মঞ্চেও ছিলাম। একবারের কথা বেশ মনে আছে। আমি তখন ইনস্টিটিউট অফ কস্ট ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' র সর্বভারতীয় সভাপতি। ভুবনেশ্বরে যে অনুষ্ঠান ছিল সেটা ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি এবং ইকোনমিক ডিসিপ্লিন নিয়ে। উনি মঞ্চে আমার সঙ্গে কথা বলেন। যার সারমর্ম ছিল – 'আমাদের রাজ্য নিয়ে কিছু ভাবুন, যাতে একটু ভালো হয়। প্রচুর আদিবাসী আছে তাদের ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি কীভাবে সম্ভব দেখুন'। উনি খুব সাবলীলভাবে বলেছিলেন- 'ওড়িশায় খনিজ সম্পদ, কৃষি, এমএসএমই -এর খাতে যদি ইকোনমিক ডিসিপ্লিন আনা যায় তবে ওড়িশা একটি মডেল রাজ্য হয়ে যাবে। এতে আমাদের রাজ্যেরও উন্নতি হবে একইভাবে সারা ভারতের উপকার হবে'। পরবর্তীকালে ওঁর সঙ্গে আবারো দু'বার দেখা ও আলোচনা হয়েছে এবং উনি প্রায় একই কথা বলেছেন, 'অনুগ্রহ করে আমাদের রাজ্যের জন্য একটু ভাবুন'। আর একটি স্লোগান বলেছিলেন - স্বচ্ছ শাসন ও টেকসই উন্নয়ন। অদ্ভুত একটি মানুষ যিনি রাজ্যের উন্নতির জন্য বা আদিবাসীদের উন্নতির জন্য যেকোনো কাজ করতে রাজি ছিলেন। আপনার মতো নেতৃত্ব দেশের মানুষের খুব দরকার।

সুরেশ প্রভু

আজ আমরা দেশের রেল ব্যবস্থা নিয়ে খুব গর্ববোধ করি। কিন্তু যাঁর সময় বা যাঁর প্রচেষ্টাতে রেল মন্ত্রকের উন্নতি হয়েছে তাঁর কথা আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি সুরেশ প্রভু। সময়টা নভেম্বর ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭। তিনি নিজে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমার সর্বভারতীয় সভাপতির সময়কালটা ২০১৬ -১৭ ছিল বলে বেশ কয়েকবার ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসেছি। উনি একবার বলেছিলেন রেলের কস্ট মেজারমেন্ট খুব দরকার। সোলার এনার্জি ব্যবহার করতেই হবে রেলকে, আর রেলকে একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু এনে দিতে হবে। সত্যিই আজ বুঝি কথাগুলো কতটা

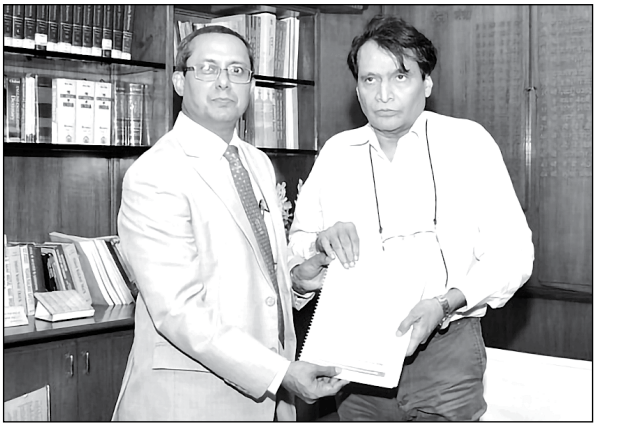

তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আমার বেশ মনে আছে। আমি তখন প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় সহসভাপতি। অনেক আলোচনার পর আমাদের ইনস্টিটিউটকে বেছে নেওয়া হয় রেলের কস্ট এফিসিয়েন্সি মেজারমেন্ট এবং পারফর্মেন্স ইভলিউশন রিপোর্ট বানানোর জন্য। সুরেশ প্রভু নিজে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়া সত্ত্বেও কস্টিং ইনস্টিটিউটকে কাজের দায়িত্বটা দেন। এই সততা বা মানসিকতা, দৃঢ়তা ওঁর মধ্যে দেখেছি। এরপরে অনেকবার কাজ নিয়ে আলোচনা

করেছেন কিন্তু কখনো নিজের ঢাক পেটাতে দেখিনি। যদিও ওঁর সময় কী কী হয়েছে জানলেও মনে হবে উনি আবার আসুক রেলের চালিকাশক্তি হয়ে। কয়েকটি জিনিস এখানে উল্লেখ করছি যা উনি করে গিয়েছিলেন - রেল বাজেটকে ইউনিয়ন বাজেটের অংশ করে গুরুত্ব বাড়ানো।

IRCTC- revamp, মোবাইল অ্যাপ চালু করা, Station Restructure, Insurance Safety Fund, Bio- Toilet, Solar Energy, Electrification ইত্যাদি।

আপনার মত রাজনৈতিক নেতার সত্যিই দরকার আমাদের ভারতবর্ষে।

বিজনেস লিডার চন্দ্রশেখর ঘোষ

এখন যাঁর কথা বলব তিনি বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে এক অনুপ্রেরণা বলে আমি মনে করি। আমার সবসময় মনে হয় এই সমাজে ওঁর আরো কিছু দেওয়ার আছে। যে কোনো কারণেই হোক ওঁর সঙ্গে আমার এখন কথোপকথন হচ্ছে না। সালটা ২০১১ থেকে ২০২০। আমি সবেমাত্র দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া'তে সর্বভারতীয় বোর্ড মেম্বার হিসেবে ইলেক্টেড হয়েছি। আমার নিজস্বতায় বা স্বাভাবিকতায় নতুন কিছু করতে হবে এই

ভাবনায় মশগুল। সেই সময় মাথায় এল NBFC এর কার্যপ্রণালীতে আমাদের গুরুত্ব আছে। কিন্তু এখনো সেটা সামনে আসেনি। ঠিক তারপরেই আরম্ভ করি অ্যাপ্লিকেশন অফ কস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক ইন স্মল ফিনান্স সার্ভিস সেক্টর এবং বছরে দু'বার করে উনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তখন তিনি SHG ও এন বি এফ সি নিয়ে কাজ করছেন। আমি তখনো ওঁকে দেখেছি আলোচনার মধ্যে কিছু একটা গভীর চিন্তায় আছেন। আমি মাঝে মাঝে উল্লেখ করলে উনি বলতেন- 'মানসবাবু এই ছোট্ট জীবনে কী কী এখনো বাকি আছে চিন্তা করতে করতে একটু আনমনা হয়ে যাই। আমি তো একদম গ্রাউন্ড লেভেলের লোকেদের নিয়ে কাজ করি। আমি দেখি ওদের কত সমস্যা এবং কতটুকুই বা সমাধান করতে পারি'। ২০১৪ সালে দেখেছি ওঁর কী ব্যস্ততা এবং দুশ্চিন্তা ব্যাঙ্ক তৈরি নিয়ে। অবশেষে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি সাফল্য পান। তারপর এক ব্যাঙ্কিং কনক্লেভে আমরা একই মঞ্চে ছিলাম তখন বলেছিলাম, এখন কি আপনি নিশ্চিন্ত? ঘোষবাবুর উক্তি ছিল - ব্যাঙ্ক তো হল কিন্তু সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য কীভাবে কাজ করব সেটাই আমার চিন্তা। সন্তান জন্ম থেকে বাবার চিন্তা। বাবার মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা থেকেই যায়। শুধু চিন্তার আপেক্ষিকতা পরিবর্তন হয়। চন্দ্রশেখর ঘোষবাবুর এই যে কথা, সংস্থাকে নিজের সন্তান বলে মেনে নেওয়া, শুধু শুধু অসাধারণ বললে কম হবে। চন্দ্রশেখর জোবাবু আমরা আপনার মতো বিজনেস লিডার এবং পথপ্রদর্শক চাই।

জিতেন্দ্র সিং

এখন যার সম্বন্ধে বলতে চাইছি তিনি একজন এমবিবিএস ডাক্তার এবং কাশ্মীরের লোক। ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন DONER (Development of North East Region) মন্ত্রী। তিনি হলেন জিতেন্দ্র সিং।

আমি বার তিনেক ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বসেছি। ওঁকে দেখেছি বেশ কিছু জিনিসের মধ্যে নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু বলতে চাইছেন। ২০১৬ সালে ডিসেম্বর মাসে এক আলোচনার কথা আমার বেশ মনে আছে। উনি আমাকে বলেন, 'আপনাদের কলকাতায় হেড অফিস কিন্তু আপনারা কেন নর্থ ইস্ট নিয়ে ভাবেন না। বাকি ভারতের জন্য সবাই ভাবছে '! আমি বলেছিলাম, আমাদের ওখানে ব্রাঞ্চ আছে। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, ব্রাঞ্চ থাকা আর নর্থ ইস্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করা এক নয়। উনি বললেন – 'নর্থ ইস্টে দরকার এমন চারটি জিনিস নিয়ে কাজ করুন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। Financial sustainability, skill development, IT advancement আর Economic discipline। নর্থ ইস্ট এর ফিন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি যত বাড়বে, ভারতে মানসিক দৃঢ়তা তত বাড়বে। আপনারাই ঠিক করতে পারবেন কীভাবে ওই রাজ্যগুলোয় ফিনান্সিয়াল স্টেবিলিটি এবং ইকোনমিক ডিসিপ্লিন আনা যায়'। যেকোনো অদৃশ্য কারণে আর বেশি দূর এগোনো যায়নি কিন্তু আমরা চেষ্টাতেই আছি কিছু করব। ওঁর কথা আমার সবসময় কানে বাজে - 'economic discipline is a vital system'।

রঙ্গরসিকতায় মনীষীরা

রূপম কোটাল

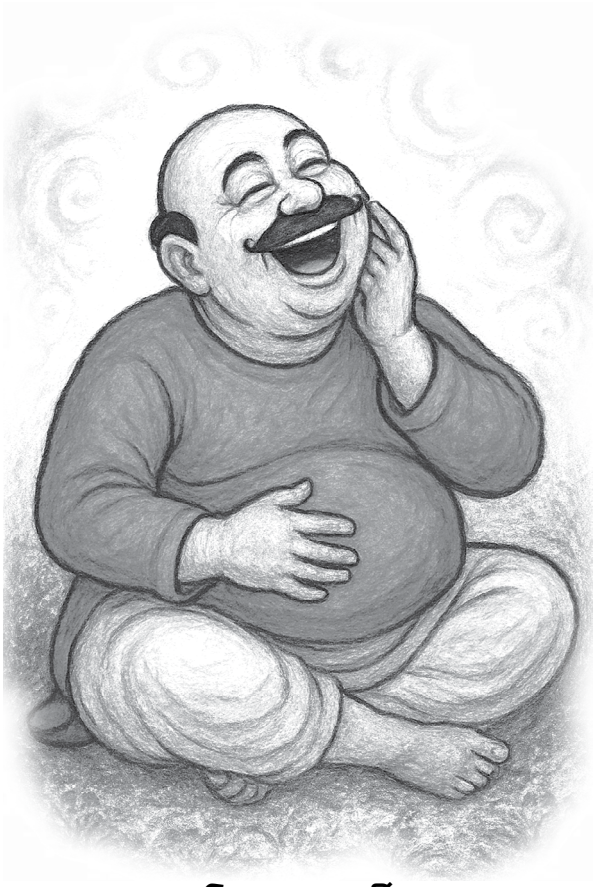

শিবরাম চক্রবর্তী

শিশু সাহিত্যিক অখিল নিয়োগী, যাকে সবাই স্বপনবুড়ো নামে চেনে।জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্র মঞ্চে শিবরাম বাবুর সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছে। পাশে বসে রয়েছেন সেই স্বপনবুড়ো। তিনিও বক্তা। মঞ্চে মানপত্র পাঠ হল। তারপর একে একে সকলে মঞ্চে উঠে শিবরাম বাবুর সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর এদিকে শিবরামের মন উসখুশ! পাশে বসে থাকা স্বপনবুড়ো শিবরাম বাবুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আর ভাবছেন কী ব্যাপার !তখন শিবরামবাবু পাশে বসে থাকা স্বপনবুড়োকে বললেন,

এসব মানপত্র-টত্র দিয়ে কী হবে! ঘরের দেওয়ালে টাঙানোর জায়গা নেই। আর পেরেকই বা কে এনে দেবে?

--সে পেরেকের ব্যবস্থা না হয় করে দেব। স্বপনবুড়ো বললেন। তখন শিবরামবাবু বলে উঠলেন, দূর মশাই ! পেরেক আনানোর বদলে একট রাবড়ি - টাবড়ি আনলে হয় বেজায় খিদে পেয়েছে ! শেষপর্যন্ত সন্দেশ রাবড়ি এল, সেই মঞ্চে বসেই খাওয়া শুরু করে দিলেন শিবরামবাবু।

দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পন্ডিত)

শীতকালে একদিন দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় এক সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।তিনি যথারীতি খালি গায়ে চাদর জড়িয়ে উপস্থিত হলেন। সভায় উপস্থিত সকল ব্যক্তি শীতের পোশাক পড়ে এসেছেন। কেবল দাদাঠাকুরের গায়ে ব্যতিক্রমী পোশাক। দাদাঠাকুরকে এরকম অবস্থায় দেখে একজন কোট স্যুট পরা ভদ্রলোক বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, আপনার ঠান্ডা লাগছে না? শীতের পোশাক না পরে কেমন করে আছেন ! দাদাঠাকুর তখন একটু হেসে বলে উঠলেন, ঠান্ডা লাগবে কেন! আমি ট্যাকে পয়সা রেখেছি যে। পয়সার গরমে গা গরম। তখন তিনি টেঁক থেকে কয়টি পয়সা বার করে দেখালেন। দাদাঠাকুরের এরকম উত্তরের লোকটি হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।

মাদার টেরেজা

একবার এক ব্যক্তি মাদারটেরেজাকে তাঁর দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা দিতে এসেছিলেন। তিনি মাদারকে একটু গম্ভীরভাবে বললেন, আমার দেওয়া এই টাকা দিয়ে কিছু ভালো কাজ করবেন। মাদারটেরেজা তখন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন আমরা তো খারাপ কাজ করি না, তাই আপনার দেওয়া এই অর্থ দিয়ে ভালো কাজই করব।

একবার এক সাংবাদিক তাঁর কাছে এসে জানতে চান—মাদার, আপনি এত বছর ধরে এত মানুষের সেবা করছেন, কখনো কি বিরক্তি হন না? মাদার টেরেজা মুচকি এসে উত্তর দিয়েছিলেন—বাবা, আমি যদি বিরক্ত হতাম, তাহলে তো কবেই এই সন্ন্যাস ছেড়ে দিতাম। এই উত্তরে সাংবাদিক তো হতভম্ব মাদারটেরেজা সহজ স্বীকারোক্তি উপস্থিত সবাইকে হাসিয়েছিল।

মহেশ্বেতা দেবী

একবার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি মহাশ্বেতা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মূর্খ কাদেরকে বলা হয় ? তখন মহেশ্বেতা দেবী বলেছিলেন, যারা লেখাপড়া জানে না তারাই শুধু মূর্খ নয়, যারা জানতে বুঝতে চায় না, যারা প্রশ্ন করতে পারে না, যাদের জ্ঞান তৃষ্ণা নেই তারাও মূর্খ।

ডঃ বিধান চন্দ্র রায়

বিধানচন্দ্র রায় খুব রসিক মানুষ ছিলেন। একবার সরোজিনী নাইডুর পাশে বসে আছেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। সরোজিনী নাইডু তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তিনি বিধানবাবুকে হাসতে হাসতে বললেন— আপনার তো প্রায় ৫০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু হাসলে আপনার মুখে টোলটা খুব সুন্দর পড়ে। বিধান চন্দ্র রায় চরম উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন, আপনারও তো প্রায় পঞ্চাশ হল অথচ এখনো এইসব নজর রাখেন।

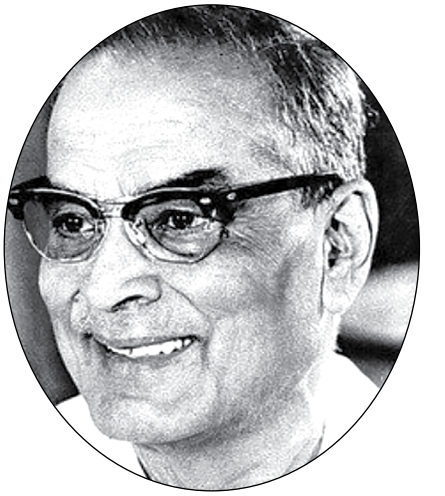

শোনা যায়, কাজ করতে করতেই ডাক্তার বিধান রায় মজার ছলে তাঁর পেশেন্টদের বলতেন, অসুখ হলে অবশ্যই দেরি না করে ডাক্তার দেখাবেন কারণ ডাক্তারদের তো বাঁচতে হবে, ডাক্তাররা যা ওষুধ লিখে দেবে তা অবশ্যই কিনবেন। কারণ দোকানদারদেরও তো বাঁচতে হবে আর ওষুধ কিনে বাড়ি ঢুকেই ওগুলো অবশ্যই ফেলে দেবেন কারণ আপনাকেও তো বাঁচতে হবে। এই কথা শুনে চেম্বারে থাকা সকল রোগীরাই হেসে ওঠেন। বিধান চন্দ্র রায় এইরকম রসিক মানুষ ছিলেন।

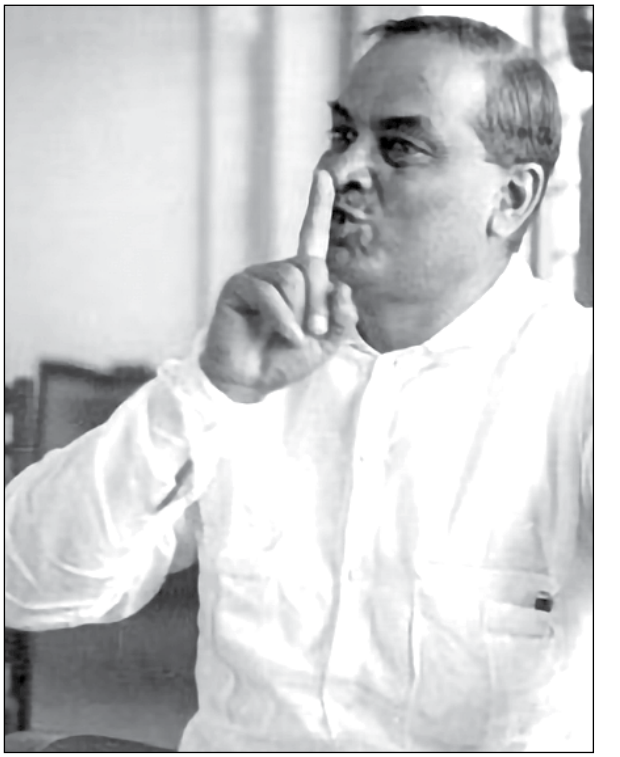

খেলার দুনিয়া

রেসলিংকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাই

বাংলার কুস্তির উন্নয়ন ও প্রসারে কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতি। এই সংস্থার সাধারণ সম্পাদক **শোভন চক্রবর্তীর** সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বাংলার কুস্তির নানা অজানা দিক উঠে এল।

● পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতি কীভাবে তৈরি হয়?

● ● বাংলার কুস্তির প্রচার, প্রসার ও উন্নতিতে অনেকদিন ধরে কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন। ১৯৪৮ সালে এই সমিতি ওয়েস্ট বেঙ্গল কুস্তি ফেডারেশন হিসাবে গঠিত হয়। প্রথম সভাপতি ছিলেন শচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সুধীর সাহা। ১৯৪৮ সালের আগে এই সংস্থা বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে ছিল। নির্মল বসু, সুধীর চন্দ্র সাহা ও আরো অনেকের উদ্যোগে নয়ের দর্শকের গোড়ায় তৈরি হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন।

● এই সমিতি কীভাবে পরিচালিত হয়?

● ● সমিতি পরিচালনার জন্য একটা নির্বাচিত কমিটি আছে। সাধারণ সভা ও নির্বাচনের মাধ্যমে এই পরিচালন কমিটি তৈরি হয়। এখন কুস্তি সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমি আর সভাপতি গৌতম ঘোষ। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেসলিং অ্যাসোসিয়েশন-এর অধীনে বিভিন্ন জেলায় আছে জেলা রেসলিং সমিতি, তার অধীনে আছে বিভিন্ন ক্লাব।

● কুস্তি নিয়ে কোন কোন জেলায় কাজ হচ্ছে?

● ● হাওড়া, হুগলি, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ নানা জেলায় ভালো কাজ হচ্ছে।

● কোথায় ও কীভাবে কুস্তির ট্রেনিং দেওয়া হয়?

● ● বিভিন্ন জেলা ও ক্লাবে যেমন কুস্তির ট্রেনিং দেওয়া হয় তেমনি পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতির উদ্যোগে উত্তর কলকাতার পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতিতে রেসলিং ট্রেনিং দেওয়া হয় রবিবার বাদে রোজ বিকেল চারটে থেকে।

● কী কী শেখানো হয়?

● ● রেসলিং-এ শেখানো হয়, ফ্রি স্টাইল আর গ্রিকো রোমান্স স্টাইল। এছাড়াও শেখানো হয় ওরিয়েন্টাল স্টাইল ও রেসলিং স্টাইল।

● কারা ট্রেনিং নিতে পারেন?

● ● ৪ বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং নিতে পারে। এই সমিতিতে প্রশিক্ষন দেন ৫জন ট্রেনার—নন্দন দেবনাথ, ভাস্কর দাস, শুভ বিশ্বাস, শ্বেতা দুবে আর শম্পা পোদ্দার। সবাই আবার সাই-এর ট্রেনার। একটা কথা, ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো গ্ল্যামার না থাকলেও বিভিন্ন জেলা থেকে ছেলেমেয়েরা কুস্তি শিখতে আসে। তবে মূলত গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা এখানে ট্রেনিং নিতে আসে।

● কুস্তি শিখে কি চাকরি হয়?

● ● কুস্তিতে জাতীয় স্তরে অংশ নিয়ে সফল হলে বা পদক পেলে ভারতীয় রেল, ফুড কর্পোরেশন সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরে চাকরি পাওয়া যায়, তেমনি রাজ্য সরকারের নানা দফতরে চাকরি পাওয়া যায়।

● পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কী কী?

● ● সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে, থিম সং তৈরি, রাজ্য স্তরে কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, নতুনদের জন্য ট্রেনিং আর কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে কুস্তির আয়োজন করা, কুস্তির প্রচারে সরকারি পর্যায়ে তদ্বির করা, কুস্তিকে 'খেলা হবে দিবসে' অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন জেলা কুস্তি সংস্থাকে ম্যাট দেওয়া।

● বাংলার কুস্তির ক্ষেত্রে সমস্যাটা কোথায়?

● ● বাংলার কুস্তি অনুশীলনের সবচেয়ে বড় সমস্যা পরিকাঠামোর অভাব। এখন আর কুস্তি মাঠে হয় না। প্রতিযোগিতামূলক কুস্তির প্রশিক্ষণের জন্য দরকার হয় আধুনিক ম্যাট-এর। তার দাম কয়েক লাখ টাকা। কুস্তির জন্য বড় স্পনসর এগিয়ে আসে না।

● রাজ্য সরকারের কাছে আপনাদের কী দাবি?

● ● পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের চার দফা দাবি -স্কুল পর্যায়ে মেজর গেমসের পাশাপাশি কুস্তির অন্তর্ভুক্তি, কুস্তির ইউনিট গড়ে তুলতে সরকারি সাহায্য, সরকারি স্টেডিয়ামে কুস্তি প্রতিযোগিতার পাশাপাশি যেসব সরকারি স্টেডিয়াম বিনা ব্যবহারে পড়ে রয়েছে সেখানে কুস্তির ইউনিট করা। আর পশ্চিমবঙ্গের সাই এ কুস্তির কোচিং চালু করা।

● পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য পান?

● ● হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতির দুই কুস্তিবিদ ও ট্রেনারকে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি চাকরি দিয়েছেন। জেলার কুস্তি ক্লাবকে বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করেছেন। সরকারের এই উদ্যোগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ কুস্তি সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছি।

● আপনাদের লক্ষ্য কী?

● ● নতুন প্রজন্মের কাছে রেসলিংকে পৌঁছে দিতে চাই। আমরা কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে কুস্তির অনুশীলন কেন্দ্র তৈরি করছি যার মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন ছেলেমেয়ে উঠে আসবে। তাছাড়া সরকারি উদ্যোগে যদি আদিবাসী এলাকায় কুস্তির প্রচার করানো যায় তাহলে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা উঠে আসতে পারে।

কুস্তি চর্চায় বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ

নারী শিক্ষার দিশারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দ সবাই নিয়মিত কুস্তি চর্চা করতেন। বাদ যাননি রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ।জীবনস্মৃতি গ্রন্থে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের কুস্তি চর্চার কথা।

কুস্তি চর্চা করেন মহানায়ক উত্তমকুমার, পদ্মশ্রী মান্না দে ও অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

বাংলার স্মরণীয় কুস্তিগীর

বাংলার স্মরণীয় কুস্তিগীরের তালিকায় চিরদিন থাকবেন গোবর গোহ, নন্দলাল সাহা, সুধীর চন্দ্র সাহা, যদুনাথ সিংহ, সুশীল সাহা, অসিত কুমার সাহা।

DAKSHIN CHANDPUR CHILD DEVELOPMENT MISSION

DDRESS - VILL - DAKSHIN CHANDPUR, P.O - MAKHALGACHHA, P.S - HASNABAD, DIST. - NORTH 24 PARGANAS,
WEST BENGAL 743422

+91 9734367847

@ www.dccdm.in

dccdm08@yahoo.com /
dakshinchandpur.cdm@gmail.com,

দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশনের সামাজিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চল বিশেষত সুন্দরবন, ঝাড়গ্রাম, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেও, দারিদ্র্য, সীমিত জীবিকা, দক্ষতার অভাব ও স্বাস্থ্য সমস্যা এই এলাকাগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে পিছিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে অনগ্রসর তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলো বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকারত্ব ও সুযোগের অভাবে সংকটে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ চাঁদপুর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন নানা সরকারি ও সহযোগী সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বে একটি সার্বিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ চালাচ্ছে, যেখানে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানীয়জল এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

১. জীবিকা শক্তিশালীকরণ

- সুন্দরবনে ছাগল, হাঁস-মুরগি, দুধ ও মাছ চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে এই কাজে যুক্ত করা হচ্ছে যাতে তারা সমবায়ভাবে উৎপাদন ও বিপণন করতে পারে।

২. দক্ষতার সেতুবন্ধন

গ্রামীণ যুবকদের জন্য কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও মোবাইল রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ চালু হয়েছে। এর ফলে তারা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান বা ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে পারছে।

৩. নারী-কেন্দ্রিক কর্মসূচি

সেলাই ও পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ বহু নারী ও কিশোরীকে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করেছে। অনেকে স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরি কিংবা ঘরে বসেই ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করছে।

৪. ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প ও সবুজ জীবিকা

কোয়ার বোর্ডের সহায়তায় নারীদের কোয়ার পণ্য তৈরি শেখানো হচ্ছে। ঝাড়গ্রামে শালপাতার প্লেট ও বাটি বানানো এবং মাশরুম চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যা উপজাতি মহিলাদের বিকল্প জীবিকা তৈরি করছে।

৫. সংশোধনাগারে দক্ষতা উন্নয়ন

কোচবিহার জেলা সংশোধনাগারে বন্দিদের মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে তাদের মুক্তির পর জীবিকা অর্জনের পথ তৈরি হচ্ছে।

৬. আলিপুরদুয়ারে বহুমুখী প্রশিক্ষণ

চা-বাগান ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কম্পিউটার, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সেলাই ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৭. স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নারীর সুরক্ষা

সুন্দরবনের সন্দেশখালিতে ক্যানসার সচেতনতা শিবির, নাটক, কর্মশালা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ক্যানসার শনাক্তকরণের প্রবণতা বাড়ানো হয়েছে।

৮. নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহ

সুন্দরবনের বহু সরকার-পোষিত স্কুলে গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে, যা হাজারো শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জল নিশ্চিত করছে।

৯. কমিউনিটি রেডিও – রেডিও সুন্দরবন ৯১.২ এফএম

এই রেডিও গ্রামীণ উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। কৃষক, কারিগর ও মহিলাদের সাফল্যের গল্প প্রচার, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, স্বাস্থ্য ও নারী সুরক্ষা প্রচারণা এবং দুর্যোগকালে জরুরি তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এটি স্থানীয় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০. স্থায়িত্ব ও গোষ্ঠীবদ্ধ মালিকানা

সব কার্যক্রমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সমবায় ও স্থানীয় পঞ্চায়েতকে যুক্ত করে স্থায়িত্বশীল কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ, আর্থিক জ্ঞান ও বাজার সংযোগের মাধ্যমে উপকারভোগীরা আত্মনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে।

উপসংহার

এই বহুমুখী কার্যক্রম দক্ষতা উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন, ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের পুনর্জাগরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিশুদ্ধ পানীয়জল ও কমিউনিটি রেডিওকে কেন্দ্র করে একটি সমন্বিত উন্নয়ন মডেল গড়ে তুলেছে। সুন্দরবনসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চলে এ কার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে এবং ভবিষ্যতে আরও স্বনির্ভর ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে দিশা দেখাচ্ছে।

एनएमडीसी

NMDC

Responsible Mining

New Look

Soaring Aspirations

Incredible Possibilities

Since our incorporation in 1958, we have raised the bar in mining and become India's largest iron ore producer. Our philosophy as a Responsible Mining Company has resulted in socio-economic development of people around our projects.

NMDC Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Regd. Office: Khanij Bhavan, 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028

CIN: L13100TG1958GOI001674

nmdc.co.in

/nmdclimited